ভারতের কারাগারে

মেরী টাইলার

ভাষান্তর
অর্ণব রায়



কস্‌মো স্ক্রিপ্‌ট
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

MY YEARS IN AN INDIAN PRISO

By Mary Tyler

Bengali translation by Arnab Roy

প্রচ্ছদ : সন্তোষ গুপ্ত

প্রকাশকাল : ম দিবস—১৯৪৯

প্রকাশিকা : তাপসী সেনগুপ্ত ১১ নং নিতাইবাবু লেন, কলিকাতা-১২

মুদ্রক : এস, জি, প্রিণ্টার্স, ১৪৪/১ রামমোহন সরণী ও কল্পনা প্রেস,
২ নং রামকান্ত মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা-১২

তোমাকে
তোমাকে
তোমাকে

সত্তরের জুন। বিহারের হাজারিবাগ সেন্ট্রাল জেল। আমার কয়েদ-ঘর। একটা টেবিল। টেবিলের এক পাশে আমি। ওপাশে চেয়ারে ছ সাতজন সাদা-পোশাক পুলিস অফিসার। কয়েকজন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সামনের দিকে, আমার মুখের চেয়ে বড়জোর ফুটখানেক দূরে তাদের মুখ। অভিযোগ অনুযোগ আর পীড়াপীড়ি। বাকীরা চেয়ারে পিঠ এলিয়ে। দৃশ্যতঃ যেন বিশ্রামরত, যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানেন না। চোখ কিন্তু আমার চোখে স্থির······হুঁ হুঁ বাছাধন, কেমন পাকড়েছি তোমাকে! জেরা করছে সবচেয়ে কম বয়েসী এক ছোকরা অফিসার। গোলালো ফোলা ফোলা মুখ, কুতকুতে লাল চোখ। মুখের রেখা কঠিন। দৃষ্টিতে ঘেন্না আর বিতৃষ্ণা। সব মিলিয়ে এমন একটা দরকচামারা ভাব, যা শুধু রোজ নিয়ম করে এই ধরনের জেরা করতে করতে আপনা আপনিই মুখে চোখে ফুটে ওঠে।

'আপনি চীনা।'

'না আমি ব্রিটিশ।'

'আলবাৎ চীনা। পাশপোর্ট দেখি।'

'পাশপোর্ট কলকাতায়।'

'মিথ্যে কথা। পাশপোর্ট আমার কাছে। দেখতে চান?'

পাশপোর্ট ওরা বাজেয়াপ্ত করেছে। বাজেয়াপ্ত করেছে আমার টাকা পয়সা আমার সব। সব কলকাতায় আমার শ্বশুর বাড়িতে ছিলো। পাশপোর্টে নানান দেশের সীলমোহর। ভারতে আসার পথে এই দেশগুলো আমি ঘুরে এসেছি। দেখে ওদের কি আর মাথার ঠিক আছে!

'আপনি চীনে গিয়েছিলেন?'

'না।'

'আফ্রিকা?'

'না।'

দিন দুয়েক পর। ব্রিটেন আর ভারতের কাগজে খবর ছেপে বেরোলো আমি নাকি চীনে গেছি, জাপানে গেছি, আফ্রিকার কয়েকটা দেশও ঘুরে এসেছি। নেপাল আর পাকিস্তানের ছাপ্পা দুটো ওদের যেন রাতের ঘুমটুকুও কেড়ে নিলো।

'আপনি চীন থেকে চোরাপথে অস্ত্রশস্ত্র আনতেন।'

'এখানে আপনাকে পাঠানো হয়েছে মতলব নিয়ে। বিপ্লব সংগঠন করার কাজে।'

এক ভুঁইফোঁড় জাতীয়তাবাদী, মাথাটা খুব সাফ, বলে কিনা—
'ব্রিটিশের হাত থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি। তুই আবার চাস আমাদের মাথায় চড়তে?'

কতবার যে বলেছি আমার নিজের কথা। আমার অতীত জীবন, আমার বাবার নাম, আমার ঠিকানা, আমি যেখানে চাকরি করি, আমার ভ্রমণের বিবরণ, ছ'মাস আগে ইংল্যাণ্ড ছাড়ার পর থেকে যেখানে যে হোটেলে উঠেছি তার নাম ধাম বিবরণ—যেন শেষই হয় না। বারবার শুনেও যেন ওদের তৃপ্তি নেই। শেষ তো সেই মোক্ষম জেরায়—

'চীন সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?'

'চীনকে আমি শ্রদ্ধা করি।'

'চীন আমাদের শত্রু। উত্তর ভিয়েতনামকে আপনি সমর্থন করেন?'

'বিদেশী হস্তক্ষেপের পরোয়া না করে ভিয়েতনামী জনগণের একশোবার অধিকার আছে নিজেদের সমস্যা মিটিয়ে ফেলবার।'

'আর উত্তর কোরিয়া?'

'উত্তর কোরিয়া সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানি না।'

ওরা সাংবাদিকদের বললো, আমি মাওপন্থী, আমি কট্টর কম্যুনিষ্ট, আমি বিপ্লবী।

'অমলেন্দুর সঙ্গে কি-মার্কা বন্দুক ছিল?'

'অস্ত্রশস্ত্র ওর কাছে কিছুই ছিলো না।'

'আপনি ফের মিথ্যে বলছেন। আমাদের হাতে যা প্রমাণ আছে আপনি জানেন আমরা ওকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাতে পারি?'

আরেকজন বললো, 'পেটে একটা গোঁত্তা মারলেই সত্যিকথা সব গাঁক গাঁক বেরিয়ে আসবে।'

বললাম, 'আমার স্বামীকে একবার দেখতে পারি? আমি একজন উকিল ঠিক করতে চাই।'

'কে তোর স্বামী? তোর আবার বিয়ে হলো কবে? তুই তো সবকটা নকশালের বারোভাতারি বৌ।'

'আর আপনি খুব নোংরা।'

'সত্যি নোংরা। ওর কথার জন্য আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। হ্যাঁ, আপনি আপনার স্বামীর দেখা পাবেন। একটা দরখাস্ত করুন।'

পরদিন কাগজে বেরুলো, আমি নাকি জেলে আমার 'দু-নম্বরী' স্বামীর সঙ্গে এক ঘরে থাকতে চেয়েছি। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, এই ঘটনার পাঁচ বছর পরে ভারত ছেড়ে চলে যাবার মুহূর্ত পর্যন্ত অমলেন্দুর সঙ্গে আমার বারেকের জন্যও দেখা হয় নি।

প্রতিটি খুঁটিনাটিই ওরা যাচাই করে দেখলো।

'ভারতে আপনি কেন এসেছেন?'

'দেশ দেখতে, মানুষ দেখতে, শিখতে।'

'কেন রয়ে গেলেন?'

কি বলবো আমি? কি করে ওদের বোঝাবো? বুঝবে ওরা? ওরা তো কোন কিছুই মানতে চায় না। এটাই বা কেন মানবে?

লণ্ডনে তর্জমার কাজে ক্ষান্তি দিয়েছিলাম সেই উনসত্তরের ডিসেম্বরের গোড়ায়। উদ্দেশ্য ছ মাসের ভারত-ভ্রমণ। কবে থেকে যে এই জন্যে পয়সা জমাতে শুরু করেছি! সেই যখন স্কুলে পড়তাম তখন থেকেই আমার দুনিয়া ঘোরার শখ। বাড়ি ছিলো এসেক্সের তিলবারি জাহাজঘাটার কাছে। বাবার কর্মস্থল। দেশ বিদেশের কত জাহাজ এসে ভিড়তো, কত মানুষ নামতো, সব সময় বেশ একটা গমগম-ঝমঝম ভাব। বিদেশ সম্বন্ধে

কি যে মোহ জন্মে গিয়েছিল তখন থেকে! কুড়ির কোঠায় পৌঁছতে না পৌঁছতে বাবার দেওয়া হাতখরচের টাকা জমাতে শুরু করলাম। মতলব দূর বিদেশে কোথাও গিয়ে গরমের ছুটি কাটিয়ে আসা। দেখতে দেখতে বয়েসও বাড়লো। জ্ঞানগম্যি হলো। তাছাড়া লণ্ডন আর জার্মানির তু তুটো য়ুনিভার্সিটিতে অধ্যয়নকালীন বিস্তর ছাত্রবন্ধুর সাথে পরিচয়ও হয়েছিল। পাঁচমহাদেশের পাঁচ মিশেলী ছাত্র। ভাবলাম, আচ্ছা দেখিতো, ওরা আমাদের ইংরেজদের কি চোখে দেখে। হিসেব মেলাতে গিয়ে আমি তো থ! ইস্কুলে যে বছরের পর বছর আমাদের দেশের সাম্রাজ্য জয়ের গৌরবমণ্ডিত ইতিহাস পড়লাম, এখন যে দেখছি তাতে গৌরবের লেশমাত্রও নেই। বরং এই যে ভারতের মতো একটা দেশে বর্তমান দারিদ্র্য, এর মূলে তো আমাদেরই সেই গৌরবান্বিত অনুশাসন।

উত্তর লণ্ডনের উইলেসডেনে আমার তু বছর মাষ্টারীর সময় বর্ণবৈষম্যের প্রশ্নে আমার মধ্যে একটা আগ্রহ দানা বাঁধে। নানান দেশের ছাত্র আসতো পড়তে। আমার অবসর সময়টুকু কেটে যেতো বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে। ঠিক এই সময়ই অমলেন্দু সেনের সঙ্গে আমার পরিচয়। পশ্চিম জার্মানীর এক ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষানবিশ। সেটা গ্রীষ্মকাল। আমি ছুটি কাটিয়ে ফিরছিলাম পশ্চিম জার্মানী থেকে। ট্রেনে আলাপ, কিন্তু ক্রমশঃ সেটা গভীর থেকে গভীরতর হলো, কেননা তুজনেরই আমাদের সমাজ আর রাজনীতি সম্বন্ধে অনুরূপ ধ্যান। ফলে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। সাতষট্টির শেষ দিকে অমলেন্দু দেশে ফিরে যাবে ঠিক করলো। দেশ মানে বাংলা, অর্থাৎ পূর্ব ভারত। ইওরোপের স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে যাবে নিজের দেশে,— দশের স্বার্থে নিজেকে উৎসর্গ করবে ভারী ভালো লাগলো ওর সংকল্প, শ্রদ্ধায় আমার মন ভরে গেলো।

কলকাতা থেকে ও আমাকে নিয়মিত চিঠি লিখতো। বলতো, ক'মাসের ছুটি নিয়ে আমি যেন কলকাতায় যাই, নিজের চোখে সব দেখে বুঝে আসি। থাকবার জায়গার অসুবিধে হবে না। ওর বাড়িতেই থাকতে পাবো। তা এমন সুযোগ কেউ ছাড়ে! ছ'মাসের মধ্যে তল্পি তল্পা গুটিয়ে বেশ কিছু সঞ্চয় নিয়ে আমি রওনা হলাম।

মা বাবা অমলেন্দুকে চিনতেন। একবার মাত্র সাক্ষাৎ হয়েছিলো। তবু অত দূর দেশে পাড়ি জমাবো দেখে ওঁরা চিন্তায় পড়লেন। রওনা হবার আগে বাবা বললেন, শোনো, ওদেশে গিয়ে শিউরে ওঠার মতো অনেক কিছুই তোমার নজরে পড়বে। সাবধান, ভুলেও যেন বিচলিত হয়ো না, সব সময় নিজেকে সবকিছু থেকে দূরে দূরে রেখো।

জানিনা ব্যাপারটাকে কি ভাবে মেলাবো। তবু ঐ যে বলে পিতৃত্ব—পিতার এক ধরনের সহজাত প্রবৃত্তি—তাই দিয়েই তিনি হয়ত অনুমান করতে পেরেছিলেন, যে দারিদ্র্য বঞ্চনা আর অমানুষিকতা আমি ভারতবর্ষে প্রত্যক্ষ করবো, তা হয়তো আমার খোলনলচে চিরদিনের জন্য পুরোপুরি বদলে দিতে পারে।

ছ হপ্তা পর, সেটা সত্তরের ১৮ই জানুয়ারী—তুর্কী ইরান আফগানিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান পেরিয়ে আমি ভারতে, বসে আছি কালকা মেলের তৃতীয় শ্রেণীর একটি কামরায়, ছুটে চলেছে ট্রেন, কলকাতা আর কত দূর!... কবে অমলেন্দুর সঙ্গে আমার দেখা হবে?...ওকে যে আমি দু বছর দেখি নি... ও কি আমার সঙ্গে দার্জিলিং যাবে, তারপর শ্রীলংকায়?...ট্রেনে যেতে যেতেই আভাস পেলাম, আমি যেমন যেমন ভাবছি তেমন তেমন না-ও হতে পারে। এক ছোকরা নৌ-ইঞ্জিনীয়ার আমার সীট খুঁজে দিয়েছিল। সেই পরিচিতির সূত্র ধরে মাঝে মাঝেই আসছিলো আমার কামরায় গল্পগুজব করতে। বললো, বাপরে-বাপ কলকাতা তো একটা আতঙ্কের শহর, গোলমাল লেগেই আছে, পশ্চিমবঙ্গে আইন বলে কিছু নেই। চাষীরা নাকি সব জমিদারের ধানচাল লুঠ করে নিচ্ছে। শহর চলে গেছে যুদ্ধবাজ রাজনৈতিক পার্টির কব্জায়। আইনটাইন সব তারা নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে। সাবধান, আমি যেন খুব সমঝে চলি, আর যত তাড়াতাড়ি পারি ওখান থেকে তল্পি গোটাই।

লণ্ডনের কাগজেই সব পড়েছি। পড়েছি উত্তর বঙ্গে ৬৭-র নকশাল-বাড়ি কৃষক অভ্যুত্থানের কথা। পড়েছি সেখান থেকে যে আন্দোলনের সূত্রপাত তার কথা। ভেতরে ভেতরে বেশ একটা নাড়া লেগেছে। হোক ভারতে একটা সংগ্রাম! এতো বড় একটা দেশ এতো মানুষ—হোক না একটা আমূল পরিবর্তন। সারা দুনিয়ার রাজনীতিতে লাগুক না তার ঢেউ। সেই মন নিয়েই শুনছিলাম সেই ছোকরা অফিসারের কথা। শুধু শোনাই, মুখে রা'টিও কাড়ি নি। আমার তো আর ওর মতো জমিদারের কত কি খেসারত গেলো তা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। আমার চিন্তা কৃষকদের নিয়ে। ভাবছিলাম; কতটা বেপরোয়া হলে তবেই না পারে জমিদারের ফসল লুঠ করতে। কত নিপীড়নের মধ্য দিয়েই না এসেছে এই বেপরোয়া মনোভাব।

তা সত্যি কথা বলতে কি, কলকাতায় পৌঁছে আমি তো অবাক। এমন কলকাতা দেখবো স্বপ্নেও যে ভাবি নি। ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে চলেছি, দু পাশে ছেঁড়া নোংরা পোশাকের মানুষ, কত কুষ্ঠরোগী, তাদেরই মাথার ওপর দু ধারের দেয়ালে মস্ত বড় বড় স্লোগান: "বন্দুকের নল থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে" "নকশালবাড়ি লাল সেলাম" "চীনের পথ আমাদের পথ" ইত্যাদি। ল্যাম্পোষ্টে ঝুলছে বড় বড় ম্যাপ। তাতে বাংলার প্রায় প্রতিটি জেলায় সশস্ত্র সংগ্রাম কতখানি ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে তার বিবরণ।

শহরের উপকণ্ঠে এক উদ্বাস্তু এলাকা, সেখানেই অমলেন্দুর বাড়ি। সবাই পূর্ববঙ্গ থেকে আসা। অমলেন্দুরাও তাই। ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান ভাগাভাগির সময় ভিটেমাটি ছেড়ে সব এখানে এসে উঠেছে। নতুন করে গড়েছে বসত। এখন এটাই ওদের দেশ। ওদের সব।

কটা দিন কেটে গেলো বাঙালী বাড়ির নিয়ম কানুন শিখতে। কত যে বন্ধু ওদের, কত আত্মীয়। আসার যেন আর বিরাম নেই। আর কত রকম যে সুন্দর সুন্দর খাবার খেলাম! এদিকে বাড়ির আশেপাশে, দোকানঘরের সামনে কিংবা পুকুরঘাটে নারকেলগাছের নীচে স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিসের আনাগোনা যে হঠাৎই বেড়ে গেছে, এটাও কিন্তু এরই মধ্যে টের পেয়ে গেছি। অমলেন্দুর দাদা আমার কাছে জেনে নিশ্চিন্ত হলেন যে আমার কাছে চীনা কোন বইপত্র নেই। কেননা চীনের বই এদেশে নিষিদ্ধ। কদিন আগে চীনের বই আছে এই অজুহাতে কাছাকাছি একজনের বাড়ি তল্লাশী করে তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে। এক প্রতিবেশী আমাকে বললেন, তাঁদের পিতৃপিতামহের আমলের একটা ছোরা ছিল। সেটা বাড়ির পেছনে পুকুরের জলে তিনি ফেলে দিয়েছেন। কেননা ভয়, পাছে পুলিস নিষিদ্ধ অস্ত্র রাখার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

জানুয়ারী মাসেই সেবার বেশ গরমের ভাব। ভাবলাম, যদি দক্ষিণে বেড়াতে যেতেই হয় তবে গরম বেশি পড়ার আগে যাওয়াই ভালো। পুরী যাবো ঠিক করলাম। যাবার আগে কদিন কলকাতা ঘুরে দেখা হলো। ২৫শে জানুয়ারী উঠে বসলাম পুরী এক্সপ্রেসে। অমলেন্দু সঙ্গে যাবে আশা করেছিলাম। পেলাম না ওকে। যাবার আগে বলে গেলাম মাসখানেক মাস দুয়েকের মধ্যেই ফিরবো।

খুব বেড়ালাম দু'মাস। পুরী থেকে মাদ্রাজ থেকে শ্রীলংকা থেকে বোম্বে থেকে

কাঠমাণ্ডু—কত যে দেখার জিনিস! মন্দির শিলালিপি। মাঝে মাঝে সমুদ্রের বালুবেলায় অলস সময় কাটানো। ভ্রমণার্থীদলের সঙ্গে ভিড়ে বাসে করে মাঝে মাঝে প্রমোদ ভ্রমণ। তবু সব সময় যেন একটা একলা ভাব। কিছুতেই যেন কারুর সঙ্গে মেলাতে পারি না। এই কি ভারত? এই ভারত কি আমি দেখতে এসেছি? এই সব ঐতিহাসিক স্তম্ভ, নয়ন ভোলানো মনোহর সব শোভা—মন যে কাড়বে এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু এর ফাঁকে ফাঁকে আরো যে কত কিছু রয়ে গেছে। যা সবার চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমার নজর এড়াচ্ছে না। বেনারসে রাজপ্রাসাদ আর স্বর্ণমন্দির দেখে সবাই কত না মুগ্ধ, কিন্তু আমার মনে যে তোলপাড় করছে সকাল বেলা গঙ্গার ঘাটে দেখা একটা বিজ্ঞপ্তি: ভিক্ষুক, কুষ্ঠরোগী, স্নানার্থী এবং মৃতদেহের ছবি তোলা একান্ত নিষিদ্ধ।

আগ্রায় তাজমহলের ছবি তোলা একটা নিয়মের মতো, আমিও তুললাম। কিন্তু স্মৃতির পাতা জুড়ে রইলো সেই রিক্সাচালকের মুখ যে কিনা ঘন্টার পর ঘন্টা ঘুর ঘুর করছিল আমার পায়ে পায়ে, ভারী আশা আমি তাকে ভাড়া নেবো, সে কটা বেশি পয়সা পাবে, তাই দিয়ে আটা কিনবে নুন কিনবে, তার পরিবার খাবে। পুরীর জগন্নাথ প্রভুর মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম এক অত্যাশ্চর্য ছবি—গোটা পথটা জুড়ে মন্দিরের মুখ অব্দি দুধারে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ভিক্ষুকের সারি। আর এক শহরে দেখলাম, এক আসন্নপ্রসবা নারী পথের পাশে পড়ে আছে, কেউ তার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। সেই শহরের যাবতীয় দ্রষ্টব্য আমার কাছে ম্লান হয়ে গেল। এক জায়গায় দেখলাম নর্দমার জলে এক নারী তার বাটি ধুচ্ছে। অবাক লাগলো। আর কলকাতা—এখানে তো মানুষকে অপবাদ দেওয়া হয় নিম্নতম মানের জীবন যাপনের জন্য—পৃথিবীর কোথাও নাকি এরকমটি নেই—এখানে সারি সারি রিক্সাচালক, প্রায় নগ্ন কঙ্কালসার তাদের দেহ, পায়ে জুতো নেই, রাস্তার কোথাও কাদা কোথাও গর্ত—সব অগ্রাহ্য করে তারা উদ্দাম উন্মাদ শুধু ছুটছে আর ছুটছে।

বুঝতে অসুবিধে হয় না কেন ভারত আর ধৈর্য ধরতে অক্ষম। যেন চারপাশে একটা চাপা থম ধরা ভাব, যেন একটা আগ্নেয়গিরি, খানিক পরেই বিস্ফোরণে ফেটে পড়বে। আর আমিও কেমন যেন বদলে গেছি। এই তো ক'টা মাস। এর মধ্যে সব কেমন যেন ওলট পালট হয়ে গেল। আমার সেই দর্শনার্থী ভাবটা আর নেই। সারা মন তোলপাড় করে শুধু কুষ্ঠরোগী, শুধু দরিদ্র আর অবহেলিত লাঞ্ছিত মানুষ। এরাই কেবল আমার

চোখ টানে। সনাতন ভারতের সংস্কৃতি আর আমার মন স্পর্শ করে না। যেমন করে না ওদেরও মন।

কলকাতায় ফিরে দেখলাম, সারা শহর তোলপাড়। যুক্তফ্রন্ট সরকার পদত্যাগ করেছে, বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন। ব্যাঙ্কে গেলাম টাকা বদল করতে। গিয়ে শুনি কর্মচারীদের মধ্যে জোর আলোচনা চলছে। বিষয়, গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রামের সঠিক পদ্ধতি কি। কফি হাউসেও আসর জমজমাট। ছাত্র আর বুদ্ধিজীবীর ভিড়। উত্তেজিত আলোচনা চলছে শ্রীকাকুলাম আর অন্ধ্রের তিনশো মুক্ত অঞ্চল নিয়ে। এরকমও শুনলাম, মেদিনীপুরেও নাকি শিগগীরই আর একটা মুক্তাঞ্চল হবে। এদিকে ব্যাপক হারে শহরে নকশাল সন্দেহে ধরপাকড়ও চলছে।

নকশাল মনোভাবাপন্ন কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, সংগ্রামের প্রথম লক্ষ্য হিসেবে স্থির হয়েছে গ্রামের ভূমিব্যবস্থা এবং সামাজিক ব্যবস্থা-গুলির সংস্কার। কেননা গ্রামেই বাস করে মোট জনসংখ্যার শতকরা সত্তর ভাগ। ফলতঃ প্রচুর শিক্ষিত যুবক শহর ছেড়ে গ্রামে গেছে কৃষি বিপ্লবের রাজনীতি প্রচার করতে এবং কৃষক সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশ নিতে। অমলেন্দুর খুড়তুতো ভায়েদের সঙ্গে গেলাম শহরের এক বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে। দেখে তো অবাক। ভূতুড়ে বাড়ির মতো মস্ত একটা বাড়ি, আগাপাস্তলা দেয়াল জুড়ে শুধু স্লোগান আর স্লোগান। কী যে এক জোয়ার জেগেছে দেশের যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে। এতোদিনকার শহুরে জীবন যাপনে অভ্যস্ত—সবাই বাড়ি ছেড়ে ঘর ছেড়ে পড়াশুনো ছেড়ে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে বেছে নিচ্ছে কৃষকদের কঠোর জীবনযাপন পদ্ধতি, নতুন এক ভারত গড়ার স্বপ্নে চরম আত্মত্যাগে দীক্ষা নিচ্ছে। দেখলাম সাধারণ মানুষদের। কী দারুণ সহানুভূতি নকশালদের প্রতি! সবাই চাইছে একটা আশু পরিবর্তন। সংসদীয় দলগুলির ওপর তাদের আর বিন্দুমাত্র মোহ নেই।

দেশে ফিরে যাবার সময় ঘনিয়ে এলো। একদিন অমলেন্দু আর তার কয়েকজন বন্ধুকে কথাপ্রসঙ্গে বললাম, বিদেশী হলেও আমরা ভারতবর্ষ নিয়ে ভাবনাচিন্তা করি। পারি কি আমরা ভারতীয়দের স্বার্থে কিছু করতে? জবাবে একজন বললো, তুমি যদি সত্যিসত্যি ভারতীয়দের সাহায্য করতে চাও, তবে থাকো না কেন এখানে আমাদের সঙ্গে। কী সাংঘাতিক প্রস্তাব! আর সম্ভবই বা কতটুকু। প্রথমতঃ ইংল্যাণ্ডে আমি একটা চাকরী করি, সেখানে আমার বাড়ি আমার পরিবার পরিজন-সব সেখানে। সবাই পথ চেয়ে বসে

আছে কবে আমি দেশে ফিরবো। এ অবস্থায় এখানে থাকা! পাশাপাশি, সত্যিই তো, এতো দুঃখ দুর্দশা কষ্ট লাঞ্ছনা সব দু'চোখে গিলে ফিরে যাবো আমার স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনে, গিয়ে আবার সব দু'দিনে ভুলে যাবো। এটা কি এক ধরনের প্রবঞ্চনা নয়? ঠিক হবে কি সেটা?

ভাবতে ক'দিন সময় লাগলো। ঠিক করলাম, থাকবো। আরো কটা দিন কাটিয়ে যাবো। আরো দেখতে হবে, জানতে হবে। জানার এখনো তো কত কিছুই বাকী।

চাকরীর বাজারে অমলেন্দুর খুব দাম। দু দুটো বছর ট্রেনিং নিয়ে এসেছে ইওরোপে। যথারীতি ভালো মাইনের একটা চাকরীও এলো। সুখে স্বচ্ছন্দে থাকার মতোই মাইনে। নিলো না। সরল সহজ জীবন ওর পছন্দ। বেশির ভাগ সময় কাটাতে শুরু করলো গরীব মানুষদের মধ্যে। বলতো, ভারতের সব মানুষ যেদিন পেটপোরা খাবার পাবে, পরবার কাপড় পাবে, ঘর পাবে, শিক্ষা পাবে, উপযুক্ত চিকিৎসার সুযোগ পাবে, সেদিনই ভারত হবে সত্যিকারের স্বাধীন, তার আগে নয়।

কেটে গেলো আরো ক'টা দিন।

একদিন হঠাৎ অমলেন্দু বললো, আমি কি পারি ওর জীবনসঙ্গিনী হতে?

ছলকে উঠলো বুক। বুকে আমার অন্তহীন ভালোবাসা। দু'জনে দু'জনকে ভালোবাসি। ভারত নিয়ে দু'জনেরই চিন্তা সমান। বুঝিও দু'জন দু'জনকে চমৎকার। আদর্শ আমাদের এক। অমলেন্দুর বাড়ির সবাই আমাকে ভালোবাসে। অদ্ভুতভাবে মিশে গেছি ওদের পরিবারের সঙ্গে প্রথম দিনটি থেকে। তবু এমন একটা মস্তবড় সিদ্ধান্ত নেবো—নেওয়াটা কি সোজা! কী যে যাতনায় কাটালাম ক'টা দিন! ফিরে যাবো দেশে, অমলেন্দুকে আর কোনদিন দেখবো না—একথা ভাবতেও বুকটা টন টন করে ওঠে। বরং এই তো ভালো—এই ও আমার চোখের সামনে, ওর পেছনে গোটা ভারতবর্ষ, ওর ত্যাগ ওর সংকল্প ওর নির্লোভতা সব মিলিয়ে ও আমার চোখে মহান। ওকেই চাই আমি, সর্বান্তঃকরণে চাই।

সম্মতি জানালাম। ১৯৭০ এর ১০ই এপ্রিল নিরাড়ম্বরে হিন্দু মতে আমাদের বিয়ে হলো। একে ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে আমরা গ্রহণ করিনি। আমাদের কাছে গোটা ব্যাপারটাই পরস্পরের আগ্রহকে সার্থক রূপ দেবার সবচেয়ে সহজতম উপায় মাত্র। এর বাইরে কিছু নয়।

হঠাৎ কি ওদের খেয়াল গেলো। উঠিয়ে দাঁড় করালো আমায়। তল্লাশী করবে। করলো তল্লাশী। আমার টাকা গেলো, ঘড়ি গেলো, রুমাল গেলো, এমন কি চুল বাঁধার ক্লিপকটা পর্যন্ত। রাগে থরথর করে কাঁপছি। দু হাত আমার বুকের ওপর জড়ো করা। সেই অবস্থাতেই হাত নেড়ে আর তল্লাশী করতে মানা করলাম। বুঝি হুঁশ হলো ওদের। এই প্রথম বুঝতে পারলো, বাট চুল বা স্ল্যাক্‌স্‌ পরা সত্ত্বেও আমি ছেলে নয়, মেয়ে। বসে পড়লাম। একজন, কি জানি বোধ হয় একটু দয়ালুই হবে—তার জলের বোতল থেকে আমাকে এক চুমুক জল খেতে দিল। মাথার ওপর দিল একটা কাপড়ের আবরণ। ততক্ষণে অফিসার হাজির। বেশ একটা দাম্ভিক ভাব, ইংরাজী বলেছেত পারে। কথা বার্তা বিশেষ কিছু হলো না। অফিসারের নির্দেশে চলতে শুরু করলাম। প্রায় এক ঘন্টার পথ। ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে, উঁচু নীচু বন্ধুর পাহাড়ী পথ বেয়ে। আমার পরনে রবারের চটি। পায়ে কি অত হালকা জিনিস এতো ধকল সইতে। পা কেটে দরদর করে রক্ত ঝরতে লাগলো। তার ওপর মাঝে মাঝেই অফিসারের ধাক্কা—আরো তাড়াতাড়ি হাঁটতে হবে। কি করে হাঁটবো? হাত আমার পিঠমোড়া করে বাঁধা, সূর্যের দিকে চোখ, চাইলেই কি তাড়াতাড়ি হাঁটা যায়। গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে তখন আমরা অনেকটা দূরে। একটা ফাঁকা মতো জায়গা, হঠাৎ অফিসার হাঁকলো—থামো। থামলাম। কি ব্যাপার? না তিনি আমাকে তল্লাশী করবেন। বললাম, সে তো আগেই একপ্রস্থ হয়েছে। বললো, ওতে হবে না। এবার পরিপূর্ণ অনুসন্ধান। আমার পোশাক আশাক পুরো খুলিয়ে তবে সেই অনুসন্ধান সম্পূর্ণ হবে। বললাম, খুলতে রাজী আছি। কিন্তু এটা যেন তিনি মাথায় রাখেন আমি বিদেশী নাগরিক এবং বিদেশী নাগরিকদের গায়ে হাত দিয়ে অমর্যাদা করার অপরাধে তার চাকরী যেতে পারে। স্বভাবতই তখন আমি মরিয়া। এছাড়া আর কোন কথা আমার মুখে যোগায় নি। কিন্তু কাজ হলো। তিনি তার বাসনা পরিত্যাগ করলেন।

অফিসারের ক্যাম্পে পৌঁছে দেখি, আরো অফিসার, তারা সব বড় বড় কর্তা। কোকা কোলা দিয়ে বিস্কুট খাচ্ছে। আমারই জন্য অধীরভাবে অপেক্ষারত। জিজ্ঞেস করলো আমার সঙ্গী সাথীরা কোথায়। বললাম, জানিনা। তখন একটা জীপে করে আমাকে নিয়ে এলো অনেক দূরে এক থানায়। গ্রামের নাম ঝাড়ুগোড়া। পথে আসার সময় এক সান্ত্রী কনষ্টেবল বললো, তার নাকি দু'দিন দু'রাত এক দানা খাবারও জোটে নি। নকশাল ধরার জন্য

গোটা এলাকাটা তারা দু'দিন ধরে চষে বেড়াচ্ছে। কাজই দিয়েছে কর্তারা, দানাপানির ব্যবস্থা করেনি।

থানার পিছনদিকের একটা ঘরে আধাসামরিক বাহিনীর কয়েকজন বন্দুক-ধারী সেপাই আধশোয়া আয়েশ নিয়ে আমার দিকে জুলজুল করে তাকাচ্ছিল। এদের খেতাবী নাম সি, আর, পি। একজন অনেকক্ষণ ধরে নজর কাড়ার চেষ্টা করছিল আমার। আমি বসেছিলাম একটা তক্তাপোশের ওপর। ইতিমধ্যে অসংখ্য অফিসার আর সাদা পোশাকের অসংখ্য কর্মচারী এসেছে আর গেছে। একই প্রশ্ন। একই তার উত্তর। জবাব দিতে দিতে আমার গলা শুকোবার দাখিল। সবারই হাতে একটা করে নোট বই। সবাই একই জবাব আলাদা আলাদা নোট বইয়ে লিখে নিয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করেছে, আমি স্নান করতে চাই কিনা। আমি জবাব দিই নি। একটু পরে নজর পড়েছে দরজার একটা ফাটলের দিকে। দেখি কয়েকজোড়া চোখ। অর্থাৎ বাইরে থেকে আমাকে নজরে রেখেছে। বাইরেও নিয়ে গেছে একবার, ফোটো তুলতে। আমার তো অবস্থা কাহিল। সকাল থেকে যা ঝড় বইছে আমার ওপর দিয়ে। একটু গড়িয়ে নিলে হতো, কিন্তু ভয় করছে যে শুতে। দরজাটা এখন খোলা। বাইরে বারান্দায় দেখছি একটি ছেলেকে। হাতে হাত কড়া কোমরে দড়ি। একটা চোখ ফুলে উঠেছে, চিবুক বেয়ে গড়াচ্ছে রক্ত। সারা গা উদোম, শুধু পরনে একটা হাফপ্যান্ট। জ্বর হয়েছে নির্ঘাৎ। থর থর করে কাঁপছে।

ধরপাকড়ের তালিকা ওরা যাচাই করে দেখছিল।

একজন হাঁকলো—অমলেন্দু সেন, চারশো টাকা।......

প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলাম। তবে কি অমলেন্দু গ্রেপ্তার! একটু পরে এক অফিসার ঢুকলেন। বললাম, আমাকে অমলেন্দুর সঙ্গে রাখতে এবং আপাততঃ এদের নজরের লোভ থেকে অব্যাহতি দিতে। কোনো পাত্তাই দিলো না। তারপর কি জানি কেন, হঠাৎ সন্ধ্যেবেলা হুকুম হলো আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে যাবার। গিয়ে দেখি সে এক কাণ্ড! অমলেন্দু, অমলেন্দুর ভাই আর জনা পনেরো মতন যুবক বসে আছে মেঝেতে, সবার কোমরে দড়ি। আমারও সে ঘরে স্থান হলো। খাবার দেওয়া হলো আমাদের। ছেলেদের একটা হাত খুলে দেওয়া হলো খাওয়ার জন্য। একটু পরে অমলেন্দুর সঙ্গে আরো কয়েক-জনকে নিয়ে গেল ওরা কয়েদে। বাকী আমরা ঐ ঘরেই রইলাম। শুয়ে পড়লাম মেঝের ওপর। ঘুমে আমার চোখ ভারি হয়ে আসছে। সেই চোখ ফোলা ছেলেটির কাঁপুনির আর কামাই নেই। অফিসারকে ডেকে বললো,

আমাকে অন্ততঃ জামাটা ফেরৎ দিন। জবাবে এলো এক মস্ত ধমক। সেই যে পুলিসের দেওয়া মাথা ঢাকবার কাপড়, সেটা ওকে দিলাম। ওকে ওরা মেরেছে রাইফেলের কুঁদো দিয়ে চোখের ওপর।

পরদিন সকালে আমাদের নিয়ে গেল চাইবাসায়। সিংভূম জেলার সদর দপ্তর। আমার চটিজোড়া খুলে নিল, মায় পুরুষালি সব পোশাকও। ইলো শুধু ছোট একটা প্যান্ট আর গেঞ্জি। সারাদিন বসিয়ে রাখলো পুলিস-ভ্যানে। ঠাসাঠাসি ভিড়। খাবারতো দূরের কথা, এক ফোঁটা জলও পেলাম না। কয়েকটি যুবক গান গাইছিল, নিজেদের মধ্যে হাসি ঠাট্টাও করছিল। আমি অমলেন্দুর পাশে। কথা বলছিলাম। ও বললো, ওর দৃঢ় বিশ্বাস আমাকে ওরা আটকে রাখবে না, ছেড়ে দেবে। ওর তো ভাগ্যে নিশ্চিত জেল। আমি যেন সময় সুযোগ মতো জেলে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করি।

তারপরই চাইবাসার জেলে তিন তিনটে দিন।

জেলের অধিকর্তা জিজ্ঞেস করলো আমি ছেলে না মেয়ে। জবাব পেয়ে হয়তো বিশ্বাস হলো না। জনৈকা মহিলা ওয়ার্ডারকে বললো আমাকে পরখ করে দেখতে। সে দেখলো। নিয়ে গেল মেয়েদের ওয়ার্ডে। রাত্তিরে সে যা দুর্বিসহ অবস্থা। পায়খানা বোঝাই, ঘরে দুর্গন্ধে টেকা দায়। তারই মধ্যে সেই জমাদারনীর হৈ চৈ। হাতে তার একখানা লাঠি। পটাপট কয়েক ঘা বসিয়ে দিল ক'জন বন্দিনীর পিঠে। দেখতে দেখতে ভোর হলো। তারও ডিউটি খতম। বদলি ডিউটিতে এলো একজন জেল সিপাই। সিধে গিয়ে শুয়ে পড়লো জমাদারনীর বিছানায়। অমনি ছুটে এলো কজন বন্দিনী। শুরু হলো রঙ্গ ব্যঙ্গের বহর। একজন তার বেল্ট খুলে দিলো। একজন মজা করে চাবিটা রাখলো লুকিয়ে। আমার কিছু ভালো লাগছে না। বড় ক্লান্তি। এরই মধ্যে ক'জন নিয়ে এলো একটু তেল আর সাবান। আমাকে স্নান করালো গায়ে তেল মালিস করে দিল। তখনও টনটন ব্যথা আমার পায়ে। সেই যে জঙ্গল আর পাহাড়ের মধ্য দিয়ে অতখানি পথ হাঁটা, তার ধকল কি সহজে যায়।

তিন দিনের দিন। তখন রাত। কল্পনা এলো। আমারই মতো দশা। আমাকে ধরবার পরের দিন ওকে ধরেছে। পুলিসের অভিযোগ ও নকশাল। বাঙালী, কিন্তু ইংরাজী জানে, বলতেও পারে। বড় কাতর হয়ে পড়েছে মেয়েটা। দু'দিন দু'রাত ছিলো থানা কয়েদে, বিস্তর মারধোর দেখেছে। ঘাবড়ে গেছে খুবজ বললো, পাঁচজনকে সেয়ালের আংটার সঙ্গে হাত বেঁধে রাইফেলের কুঁদো দিয়ে

নাকি খুব মারছিল। যারা এতো মারের পরও মুখ খোলে নি, তাদের গুহ্যদ্বারে নাকি একটা লোহার রড ঢুকিয়ে দিয়েছে। সে কী করুণ চিৎকার। এই দু'দিন ছোট্ট ঘরে আঠারো জনের সঙ্গে ও বন্দী অবস্থায় ছিল।

চাইবাসা জেলেও পুলিসী জেরার হাত থেকে নিস্তার নেই। ঘন ঘন আমাকে অফিসে তলব, আর জেরা। অফিসাররা তো ক্ষেপে লাল আমার সহবন্দিনী মেয়েদের ওপর। কেন ওরা আমাকে স্নান করালো, কেনই বা পোশাক পালটে দিল। ভেবেছিল এমন একটা দঙ্গলের সাথে আমাকে রাখবে যেখানে আমি কারুর সঙ্গে মিশতে পারবো না, কথা বলতে পারবো না। কথা না বললেও মনের যে একটা আলাদা ভাষা আছে ওরা বুঝবে কি করে। ওরা কি মন খুলে কারুর সঙ্গে মেশে। আমাদের ভাষা আলাদা, সংস্কার আলাদা। তবু আমরা যে সমব্যথী, এটাই তো মিশবার সবচেয়ে বড় উপাদান। সে যাহোক ক্ষেপলে একটা না একটা কিছু করতেই হয়। জেলার মহোদয় প্রচণ্ড ক্রোধে আমার হাতের কাঁচের চুড়ি দুটো ভেঙে দিলো, আমার সহবন্দিনীদের দেওয়া চুড়ি। বললো ওরা সব চোর, খুনী। আমি যেন মিশবার ব্যাপারে সাবধান হই।

সাবধান আর হতে হলো না, তার আগেই বদলীর হুকুম। ১লা জুন সোমবার। প্রায় ডজন দুই সশস্ত্র সান্ত্রী আমাদের ঘিরে আছে। আমাদের মনে বিন্দুমাত্র ভয় নেই। আমি আর অমলেন্দু ওদের পাহারায় বসে দিব্যি গল্প করছি। সে যে কত কথা! ও বললো, এবার সোজা হাজারিবাগ, এখান থেকে ১৪২ মাইল দূর। জায়গাটার নাম আগে আমি কখনো শুনিনি। আমাদের চেয়ে দু'মাস আগে নিরাপত্তা আইনের এক বন্দী সব বুঝিয়ে দিলো আমায়। সেখানকার হালচাল কেমন, কি খাবার পাবো, কি পরতে দেবে সব বললো। সবই শুনলাম, তবে গুরুত্ব দিলাম না। তখনও আমার আর অমলেন্দুর দৃঢ় বিশ্বাস, ওরা আমাদের বেশি দিন আটকে রাখবে না। অল্প দিনের মধ্যেই ছেড়ে দেবে। হায় বিশ্বাস! তখন কি ভুলেও বুঝতে পেরেছি এই অল্প দিন কয়েক বছরেও পূর্ণ হবে না।

হাজারিবাগ জেল অফিসে পুরু লেন্সের চশমা পরা এক কেরাণী তো আমার ওপর ক্ষেপে লাল—কেন আমি কল্পনার পেছন পেছন মেয়েদের ওয়ার্ডের দিকে যাচ্ছি। আমাকে বললো, যাও, ওখানে গিয়ে বসো। ওখানে মানে ছেলেদের মধ্যে। বসলাম। উঠলো তুমুল হাসির রোল। একটু ঘাবড়ে গেলো সে। আমাকে আমার জাত জিজ্ঞেস করলো, বাবার নাম, আমার বয়েস—মানে

ঘুরে ফিরে সেই একই প্রশ্ন। শেষে অনুমতি মিললো। অমলেন্দুকে বিদায় জানালাম, কথা বলার অনুমতি নেই তাই হাত রাখলাম ওর চুলে, ওর ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে হাসলাম, তারপর কল্পনা আর আমি এগোলাম ছোট্ট একটা দরজার দিকে। সামনে পথ দেখিয়ে চলেছে এক জেল সিপাই। মস্ত কাঠের ফটকের গায়ে দরজার দুটো পাল্লা। একটা দিক খুললো। ভেতরে ঢুকলাম। কী অন্ধকার! জেল সিপায়ের হাতে টিমটিমে লণ্ঠনে দেখা যাচ্ছে পথের নিশানা। রুক্ষ পাথুরে পথ। খালি পা আমাদের। পাশে উঁচু উঁচু পাঁচিল। আবার আর একটা ফটক। এটা লোহার, শিকগুলো ধারালো বর্শার মতো উঁচু হয়ে আছে। একটু ফাঁক হলো। আমরা ভেতরে ঢুকলাম। লোহার ভারী পাল্লাটা ঝমঝম শব্দ করে আমাদের পেছনে বন্ধ হয়ে গেলো।

ভোর সাড়ে পাঁচটা। হাজারিবাগ জেলে আমার প্রথম ভোর। বেদম ঘুমোচ্ছিলাম। ঠেলে তুলে দিলো মেটিনী। জেল-কর্তাদের চোখে সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্দিনীকে বলে মেটিনী। ইংরিজী মেট কথাটার সঙ্গে হিন্দী স্ত্রীলিঙ্গের লক্ষণ জুড়ে এই অদ্ভুত শব্দটি তৈরী করা হয়েছে। আমাকে আর কল্পনাকে বললো বাইরে গিয়ে সবার সঙ্গে লাইন করে বসতে। দেখি প্রায় বারো চোদ্দ জোড়া মেয়ে ইতিমধ্যেই গুড়িসুড়ি মেরে বসে আছে, 'গিনতি' হবে তাই প্রতীক্ষা। 'গিন্‌তি' করতে আসবে স্বয়ং বড় জমাদার। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! মাথায় ঘোমটা, মাটির দিকে চোখ, কারুর কোলে তার ঘুমন্ত শিশু, সবাই বসে আছে নীরব নিঃশব্দ, যেন মাটির এক একটি মূর্তি, নিস্পন্দ স্থির। জমাদার সবার সামনে দিয়ে ঘুরে যাবার সময় হাতের লাঠিটা সবার মাথার ওপর ঠুকছে, অর্থাৎ গুণছে, শেষে মোট সংখ্যার সঙ্গে হাতের মুঠোয় রাখা একটা দলামোচড়া কাগজের নম্বর মিলিয়ে দেখলো। ব্যাস্, গিন্‌তি শেষ।

আমি আর কল্পনা বসিনি দাঁড়িয়ে ছিলাম। মেটিনীর হুকুমে কর্ণপাতও করিনি। সর্দার চলে যেতে চারপাশে একবার চোখ বোলালাম। জেলে মেয়েদের এই অংশটা বেশ সাজানো গোছানো। একধারে নীচু ছাদ হলুদ রঙা লম্বাটে আমাদের ডরমিটরি, দুধারে সজিক্ষেত, মাঝে লাল মাটির সীমানা, ফটক থেকে টানা লাল মাটির পথ, পথের ধারে ফুলের সমারোহ, কয়েকটা গাছও আছে—পেয়ারা, আম, লেবু, নিম আর পাতাবাহার। আর সব কিছু ঘিরে আছে একটা মেটে রঙের টানা ঘোরানো পাঁচিল। প্রায় বারো ফুটের মতো উঁচু, এবড়ো খেবড়ো শক্ত পাথরে গাঁথা।

ফটক খুলে গেল। মোটা সাদা রঙের হাফপ্যান্ট আর নীল ডোরাকাটা গেঞ্জি গায়ে দুই পুরুষ কয়েদীর প্রবেশ। হাতে দুটো সাতনোংরা বালতি। সঙ্গে একজন সিপাই। মেয়ে মহলে সকালের খাবার দিতে এসেছে। মেয়েরাও প্রস্তুত। ফটকে ঢোকার মুখেই একটা টানা নীচু পাঁচিল মতো। সেখানে সবার থালি সার দিয়ে পাশাপাশি রাখা। বালতি থেকে তুলে ঢেলে দিতে যেটুকু সময়। ঢালা না বলে ছেটানো বলাই সঙ্গত। কোথায় পড়ছে দেখবার তাদের ফুরসৎ নেই। শেষ থালীতে দিয়েই অমনি ছুটতে ছুটতে

বেরিয়ে গেল। মৈমুন ডাকলো আমাদের। মেটিনীর নাম মৈমুন। আমাকে আর কল্পনাকে এক মুঠো করে আধভেজা ছোলা আর খানিকটা কালচে রঙের ঝোলা গুড় দিল। সঙ্গে একটা ছোট অ্যালুমিনিয়াম পাত্র আর একটা ছ-ইঞ্চি লম্বা দাঁতন কাঠি। খিদেয় তখন পেট জ্বলছে। কালবিলম্ব না করে খানিকটা ছোলা ফেলে দিলাম মুখের মধ্যে, চিবুতে শুরু করলাম। ছোলাগুলো যে নোংরা গায়ে মাটি লেগে আছে—অত দেখার সময় তখন নেই। এদিকে আমার সহবন্দিনীরা তো চোখ বড় বড় করে দেখছে আমার কাণ্ড। দাঁত মাজিনি, মুখ ধুই নি, খেতে শুরু করলাম—এ কেমন মেয়ে রে বাবা! পরে গল্পের আসরে আমার প্রথম দিনের এই অদ্ভুত ব্যবহারের কথা মনে করিয়ে দিয়ে কত হাসাহাসি যে ওরা করেছে! কল্পনা তো আরো এককাঠি ওপরে। এমনিতেই পেটরোগা মেয়ে। তায় আধ ভেজা ছোলা। খানিকটা খাবার পরে বলে, ধুৎ, এ ঘোড়ার খাবার কে খায়! এক কাপ চা পেলে হতো। বলে হাতের খাবারসুদ্ধ মগটা নামিয়ে রাখলো জলের বালতির ঢাকনাটার ওপর। অমনি হৈ হৈ করে ছুটে এলো মৈমুন, বালতির জল ফেলে দিলো, আর সে কী চেল্লামেল্লি! জল নাকি সব অপবিত্র হয়ে গেছে। আমার তো ছাই এর মধ্যে কি অন্যায় আছে কিছুই মাথায় ঢুকছে না। শেষে কল্পনাই বুঝিয়ে দিলো রহস্যটা। হিন্দু মতে অর্দ্ধভুক্ত খাদ্য অপবিত্র। সেই অপবিত্রের ছোঁয়া লেগেছে বালতিতে। ফলে জলও অপবিত্র। তাই হৈ চৈ, তাই এতো রাগ। আরো অনেক পরে জানতে পেরেছিলাম মৈমুন হিন্দু নয়, মুসলমান।

ধাক্কাটা তখনও সামলে উঠতে পারিনি, এরই মধ্যে লেগে গেলো হুড়োহুড়ি। দুদ্দাড় করে সবাই ঢুকলো ডরমিটরিতে, একধার দিয়ে লাইন করে দাঁড়ালো। সবারই মুখ শাড়ীর আঁচলে ঢাকা, চোখ নীচের দিকে। মৈমুনকেই দেখলাম সবচেয়ে করিৎকর্মা। মেঝের একপাশে রাখা ছিল কিছু সরকারী খাকি রঙের জামা কাপড়, চটপট তার নীচে ঢুকিয়ে দিলো কটা প্লাষ্টিকের চটি। দিয়ে খালিপায়ে শান্তশিষ্ট সুবোধ বালিকাটি সেজে দাঁড়িয়ে রইলো। তাৎপর্যটা বুঝেছি আরো কয়েক মাস পরে। হাজতে পাদুকা নিষিদ্ধ। ঐ চটিগুলো গোপন পথে কেনা। তাই এই গোপনীয়তা।

বাইরে ঘণ্টি বাজছে। বেজেই চলেছে। থামবার নাম নেই। হঠাৎ ফটকটা খুলে গেল। ঢুকলো দুই জেল-অফিসার। সঙ্গে মেট-সর্দার আর কয়েকজন খাকি পোশাকের বন্দুকধারী সান্ত্রী। এটাই রেওয়াজ। জেলের বড়

কর্তাদের কেউ সশস্ত্র সান্ত্রী ছাড়া ভুলেও কয়েদী ওয়ার্ডে ঢোকে না। এদিকে কর্তাদের আসতে দেখে শ্রীমতী মৈমুনের যা অবস্থা সেটাও দেখবার মতো। স্থির খাড়া হয়ে কপালে স্যালুট লাগিয়ে সে যা বিতিকিচ্ছিরি দাঁড়ানোর ভঙ্গি! খাঁকি শাড়িতে মাড় বোঝাই, তাই হাতটা পুরো তুলতে পারেনি, হয়ে রয়েছে অষ্টাবক্রের মতো। আমি আর কল্পনা একেবারে লাইনের শেষে। কারুর মুখে রা'টি নেই। এলেন তারা। গটমট করে বীরদর্পে হেঁটে এলেন লাইনের সামনে দিয়ে। আর যে কেউ লাইনে আছে যেন তাদের ভ্রূক্ষেপও নেই। থামলেন আমাদের সামনে। হিন্দীতে কি সব নির্দেশ দিলেন মেটিনীকে। জেল সুপারের গোল গাল তাগড়া চেহারা। চোখে কালো রঙের রোদ চশমা। আমাদের বললো, আমাদের কিছু বলবার আছে কিনা। কথা পড়তে না পড়তে কল্পনা বললো, আমাদের পড়বার বইপত্র চাই, সাবান চাই, আর এক প্রস্থ পোশাক চাই। সুপার নীরব। খানিকক্ষণ থম খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর হঠাৎই একটিও কথা না বলে যেমন এসেছিলো তেমনি জুতো গটমটিয়ে চলে গেলো। মৈমুন অমনি কয়েকজন বন্দিনীকে পাঠিয়ে দিলো শেষ প্রান্তের দুটো ঘরের বাসন কোসন কম্বল ইত্যাদি ঝাড়পোঁছ করাতে। একলাটে দুটো ঘর। ডরমিটরির একেবারে শেষ মাথায়। কল্পনা হিন্দী একটু একটু বোঝে। বললো, সুপার নাকি বলে গেছে আমাদের একাকী নির্বাসনের কথা।

বেলা দশটা বাজতে না বাজতেই নির্বাসন। পনেরো বর্গফুট মাপের ছোট্ট একটা ঘর। আসবাব বলতে কেবল একটা জলের কুঁজো আর তিনখানা শতছিন্ন নোংরা ময়লা তেলচিটে কম্বল। বছরের পর বছর ব্যবহারের ফলে তাতে ঘামের দুর্গন্ধ। ব্যস্‌, এ ছাড়া ঘরে আর কিসসু নেই।

কম্বল তিনখানা ভাঁজ করে আমি মেঝেতে বিছালাম। এবার একটু পর্যবেক্ষণের পালা। আমার কয়েদ ঘর মূল ফটক থেকে দূরে, ডরমিটরির একেবারে শেষ মাথায়। সামনে ছোট্ট একখানি উঠোন। ঘরের সামনের দেয়াল খোলা, সেখানে ভারী লোহার গরাদ। দেয়ালে জানলা নেই। প্রায় আট ফুট উঁচুতে ছাদ বরাবর ফুট চারেক চওড়া তিনটে লোহার ফোকর। গরাদের দরজায় মস্ত এক লোহার ছিটকিনি। সংগে বিশাল এক তালা। দেয়ালের পলেস্তারা জায়গায় জায়গায় খসে গেছে। এখানে সেখানে কয়েকটা ছোট ছোট গর্ত। মনে হয় একসময় পেরেক পোঁতা হয়েছিল। এক কোণে কোমর সমান উঁচু ঘুণে ধরা একটা দরজা, তার আড়ালে শৌচাগার। সে যা অদ্ভুত ব্যবস্থা!

মাটির একটা ফাটা গামলা মতো। তার ওপরে ঠিক মাঝামাঝি চওড়ায় কম লম্বায় বেশি চেরা একখানি কাঠ। এরই নাম পায়খানা। এর ঠিক পাশেই ডরমিটরির পায়খানা। দুই পায়খানার মাঝে ডরমিটরির যে অংশ সেখানে অনেক বন্দিনী রাত্রে ঘুমোয়। একটা খোলা নর্দমা এই দুই শৌচাগার থেকে বেরিয়ে চলে গেছে আমার ঘরের দেয়াল ঘেঁসে। কল্পনার ঘরের পায়খানা থেকে আরেকটা নর্দমা এসে যুক্ত হয়েছে এর সঙ্গে। তিন পায়খানা মিলে গরমকালের রাতের ফুরফুরে বাতাসে সে যা দুর্গন্ধের ঢেউ। অন্নপ্রাশনের খাবার অব্দি যেন গলার কাছে উঠে আসে। এর ওপর আরেক জ্বালা মশা আর মাছি। নর্দমার পলেস্তারা খসে গিয়ে জায়গায় জায়গায় ফাটল আর খন্দ। মশা মাছি দুয়েরই প্রিয় আবাসভূমি। ভুরি ভুরি ডিম পাড়ার জায়গা ঐ সব ফাটল। এক একটা মশা দেখতে এই এত্তো বড়। আর এই দুই প্রজাতির মধ্যে কী অপূর্ব বোঝাপড়া। দিনে মাছি। রাতে মশা। ফলে কি ঘুম কি বিশ্রাম— কোনটাতেই শান্তি নেই।

প্রথম কটা দিন যেন ঘোরের মধ্যে কেটে গেল। রুটিন মাফিক সব নিয়ম। সকালে আর সন্ধ্যেয় আসবে বড় জমাদার। আমার ঘরের তালা পরখ করে যাবে। আসবে মৈমুন জল আর খাবার নিয়ে। সকাল বেলা আর এক জমাদারনী এসে আমার দাঁত মাজা দিয়ে যাবে বা স্নান করিয়ে যাবে। ব্যস, বাইরের সঙ্গে এই আমার যোগাযোগ। কথা বলার জন্যে কি যে আকুলি বিকুলি করতো মন! তাই সাদা পোশাকের অফিসাররা যখন আসতো জেরা করতে, আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচতুম। যাক, তবুও তো দুদণ্ড কথা বলা যাবে। হিন্দী জানি না বলে কী যে মুশকিল! নিজের দরকার টুকুর কথা অব্দি কাউকে বোঝাতে পারি না— মৈমুন বা অন্য মেয়ে জমাদার শুধু হিন্দীই বোঝে। আসুক ওরা জেরা করতে, মন্দ কি!

জেরার কায়দা কানুন এ কদিনে কিছু কিছু শিখেছি। বেশ একটা খেলার মতো। যা-ই ওরা জিজ্ঞেস করুক না কেন, আমি শুরু করতাম ছেলেবেলা থেকে। কোন রাখঢাক নেই। মায় খুঁটিনাটি ঘটনার বিবরণ অব্দি। শুনুক ওরা। কান ভরে শুনুক। আরো গপ্পো ফাঁদুক। এর থেকে যদি কোন সূত্র পায়, তাকে কাজে লাগাক। কত না ফাইল তো তৈরী হয়েছে আমাকে নিয়ে, ফাইল আরো মোটা হোক। আমার কি আসে যায়!

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওদের অবিশ্যি একটাই জিজ্ঞাসা— আমার সঙ্গে কোনো নকশাল নেতার পরিচয় আছে কিনা এবং এই আন্দোলন সম্পর্কে আমার কি

ধারণা। বিষয়টা নিয়ে ওরা রীতিমতো ভাবিত, কেননা যেন-তেন-প্রকারেণ নকশাল দমন করতেই হবে। কাগজগুলোও খুব লিখছে। এ হেন অবস্থায় বিহারের এক গণ্ডগ্রামে আমার উপস্থিতি রীতিমতো চাঞ্চল্যকর ঘটনা। আমি নির্ঘাৎ কোনো অস্ত্র চোরাচালানকারী দলের সঙ্গে যুক্ত, নয়তো কোনো দুর্জন প্রকৃতির আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য. যে সংস্থার একমাত্র কাজ ভারতে আন্দোলনের মদৎ যোগানো এবং এ ব্যাপারে উপযুক্ত নীতি-নির্দেশ দেওয়া। এমনকি এই সেদিন একটা টেলিগ্রাম এসেছে আমার নামে, পাঠিয়েছে আমার ইংল্যাণ্ডের বন্ধুরা,·লিখেছে, আমার কোনো রকম সাহায্য ওরা করতে পারে কিনা, —এমনই সন্দিগ্ধ মন, সেটাও নাকি একটা 'রহস্যময় টেলিগ্রাম' এবং তার বিষয়-বস্তু নাকি 'ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ।' ইতিমধ্যে কাগজে আমার একটা নতুন পরিচয় চাউড় হয়ে গেছে। আমি নাকি পাকাপোক্ত নকশাল নেত্রী। এটা শুধু আমার ব্যাপারেই নয়, নকশাল সন্দেহে যাকেই ওরা ধরে, তাকেই বলে নেতা। আসলে সবই ধোঁকা। সরকার-দেখানো ঠাট। এইভাবে ওরা প্রমাণ করতে চায়, সব নেতাকে গ্রেপ্তার করে ওরা সত্যি সত্যিই নকশাল আন্দোলন নির্মূল করতে পেরেছে।

আমার পাশের ঘরে কল্পনারও একই অবস্থা। জেরার ঠেলায় নাজেহাল। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। শুধু রাত্রে, সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে. এমনকি ঐ দূরে মিনারের মতো উঁচু গম্বুজের ওপর সশস্ত্র পাহারাদারেরাও,—আমরা তখন গরাদের দিকে মুখ করে দুজনে দুজনকে চিৎকার করে ডাকি, সাড়া দিই, দৈনন্দিন কাজকর্মের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করি, অভিজ্ঞতার আদানপ্রদান করি, চলে প্রায় মাঝরাত অব্দি। এরই মধ্যে কত কি যে বসে বসে ভাবতাম! ভাবতাম, পুলিস আমাকে এ অবস্থায় বড় জোর হপ্তা দুইয়ের বেশি আটক রাখতে পারে না। ওরাও কথা প্রসঙ্গে ওদের মনোভাব বলে গেছে। সবচেয়ে নৈরাজ্যবাদী অফিসারের মতে আমি হয়তো খুব বেশি হলে মাস তিনেকের মধ্যেই ছাড়া পাবো। ওরা স্বীকার করেছে, আমার ব্যাপারে ওদের আর কোন আগ্রহ নেই। হায় রে, তখন কি জানতাম, কী পরিমাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে আমার গ্রেপ্তারে, জল কত ঘোলা হয়েছে। সরকারের কাগজগুলিতে হেডলাইন হয়েছি আমি, আমার নতুন নাম হয়েছে 'গেরিলা নারী', আমাকে গ্রেপ্তারের নানা তৈরী করা গল্প মুখরোচক করে সাজানো হয়েছে। আমার বিরুদ্ধে মস্ত অভিযোগ, আমি নাকি ওখানে গিয়েছিলাম ইউরেনিয়াম কারখানা উড়িয়ে দেবার জন্য। ধরা পড়ার আগে নাকি আমার সঙ্গে পুলিসের জোর বন্দুক লড়াই হয় এবং এরই ফাঁকে একটা থানায় নাকি আমি বোমাও ছুঁড়ে এসেছি।

কয়েকদিন পর জেরা করতে এসেছিলো যে সব অফিসারেরা, একে একে সবাই বিদায় নিলো। কেউ যাবে দিল্লী, কেউ পাটনা, কেউ কলকাতা, কেউ পাঞ্জাব। গোছা গোছা মূল্যবান সব খবর-জবর পেয়েছে তো, সেগুলো ওপরওলাদের যথা সময়ে জানাতে হবে। আমি আবার যে কে সেই। সেই নির্জন নির্বাসন। সেই পনেরো বর্গফুট ঘর, ভারী লোহার গরাদ, সারা দুনিয়া থেকে আলাদা, একক জনমানবহীন সেই অজ্ঞাতবাস। ভিড় করে এলো মনে রাশি রাশি ভাবনা। হিসেব মেলাতে বসলুম। ধরা পড়ার প্রথম দিনটি থেকে এই পনেরোটা দিনের। এতোদিন আল্‌গা চোখে গোটা ব্যাপারটাকে দেখেছি। এখন আর আলগা নয়, গভীর ভাবে, অতলে ডুব দিয়ে। নাঃ ভয়ডর বলতে কোন কিছু আমার মনে নেই। চিন্তা শুধু বাবা মাকে নিয়ে। সব কিছু নিশ্চয়ই তাঁরা শুনেছেন, জেনেছেন। কী অশান্তিই মা ভোগ করছেন! বড় খারাপ হয়ে গেল মনটা। আর অমলেন্দু,— ওরই বা কি হাল, কেমন আছে ও। একজন অফিসার তো আমায় বলেই গেলো ওর অবস্থা নাকি আমার চেয়েও সঙ্গীন। কিন্তু কি করতে পারি আমি। আমার যে হাত পা বাঁধা। পারি শুধু বাবা মাকে একটা চিঠি লিখে সত্যি কথাগুলো জানাতে, আর পারি কর্তৃপক্ষকে চাপ দিয়ে অমলেন্দুর সঙ্গে আমার দেখা করাতে বাধ্য করতে। দেখা করার অনুমতি ওরা দেবে, একথা আমাকে এক অফিসার বলে গেছে।. দেখা যাক, কতটা কি করা সম্ভব।

ইতিমধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার, দেখলাম জেলখানার নিয়ম কানুন আমি বেশ রপ্ত করে ফেলেছি। সব আমার মুখস্থ। রোজকার কি কাজ, কাদের সান্নিধ্য আমি পাই—সব। এজন্য আমাকে আলাদা ভাবে চেষ্টা করতে হয়নি, ভাবতে হয়নি, একটু একটু করে সব অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে।

ভোর সাড়ে চারটে। অমনি কানফাটানো বেসুরো বেতালা বেজে উঠবে একটা বিউগ্‌ল, ঐ দূরের গম্বুজ থেকে। এটা মেটদের জাগাবার সঙ্কেত। ওদের ডিউটি তখন থেকেই শুরু। একটু পরেই বাজবে তিনটে ঘন্টা। কয়েদীদের জাগাবে। শুরু হলো তাদের সারা দিনের কাজ। এর পরেই একজোড়া ভারী বুটের মচ মচ আওয়াজ। অর্থাৎ বড় জমাদার আসছে। সরকারী হিসেব অনুযায়ী আমার ঘুমের প্রহর শেষ। এই তো এলো, এই আমার কয়েদ-ঘরের তিনধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠলো, তালাটা নাড়লো,— যাক নিশ্চিন্তি, আমি আমার খাঁচায় ঠিক ঠিকই বন্দী আছি!— এরপর সেই একই প্রশ্ন— এক আদমী, ঠিক হ্যায় না? এ প্রশ্ন সকাল সন্ধে দু বেলা আমাকে হপ্তার পর হপ্তা

শুনতে হয়েছে। কখনও কখনও ভাঙা হিন্দীতে আমি তাকে বলতাম, আমাকে বাইরে বের করুন, আমি ব্যায়াম করবো, লিখবার কাগজ কলম দিন, অমলেন্দুর সঙ্গে দেখা করতে দিন। হিন্দী আমাকে কল্পনা রাত্রে কথা বলার সময় শিখিয়ে দিতো। আমার কথার জবাবে গরাদের ফাঁক দিয়ে দেখতাম তার থমথমে মুখ, অবাক স্তম্ভিত চাউনি, মুখখানা তো কুকুরের মতো লম্বা, ইয়া মোটা একজোড়া গোঁফ, কিন্তু চোখে একটা শোকের ছাপ, বিষন্নভাবে মাথা নাড়তো, কিছু বলতো না। আসলে কি বলবে, কি বলতে কি বলবে— হয়তো এ সব নিয়েই ওর দুর্ভাবনা। 'মেমসায়েব' বলেই না মুশকিল। হতো অন্য কোন কয়েদী, নির্ভাবনায় কত কথা বলে দিতো। কল্পনাকে নির্ভয় দিতো প্রায়ই। বলতো, আর দেরী নেই শিগগীরই তোমাদের ছেড়ে দেবে। বিশ্বাস থেকেই বলতো। এতোদিন সরকারী চাকরী করছে, কখনো তো দেখেনি 'লেখাপড়া জানা' মেয়েদের এমন অবস্থায় বন্দী রাখে, নির্যাতন দেয়। তাই হয়তো দুজনকেই একটু সমীহ করতো। সন্দেহও। সন্ধ্যের তালা পরখ শেষ হলে গরাদের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে তন্ন তন্ন করে খুঁজতো আমার ঘর, কোথাও কিছু আপত্তিকর জিনিসের সন্ধান পায় কিনা। একদিনের একটা ঘটনা বলি। বাইরের কলে চান করতে গিয়ে এক টুকরো দড়ি কলের মুখে বাঁধা দেখে আমি নিয়ে আসি। তারপর জামাকাপড় শুকোবো বলে গরাদে বেঁধে রেখে দিই। সেদিন তালা-পরখের পর অবাক হয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো সে দড়িটার দিকে। আমাকে ইশারা করলো খুলে ফেলতে। খুললাম। চাইলো। দিলাম। আর ফেরৎ দিলো না। পরে শুনলাম, কল্পনাকে বলেছে, কয়েদে দড়ি রাখা নাকি বে-আইনী। তাই ওটা ও বাজেয়াপ্ত করতে বাধ্য হলো। ঠিক যেন সেই ইস্কুলে মাষ্টার মশাইয়ের বকুনির মতো। এতো কষ্ট পেয়েছিলাম সেদিন!

বড় জমাদার সন্ধ্যের রাউণ্ড শেষ করে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হতো মেটিনী মৈমুনের দাপট। শাড়ীর আঁচল মাথায় জড়ানো, ঠোঁটের কোণে চতুর একফালি হাসি, উদ্ধত শির, সব মিলিয়ে সে প্রমাণ করতে চায় যেন সেও একজন ছোটখাটো আমলা। দ্বিমুখী ভূমিকা তার। বন্দীদের সম্পর্কে নানান ঘটনা সাতকাহন করে কর্তৃপক্ষের কানে তোলা এবং কর্তৃপক্ষের নানা রকম খামখেয়ালকে কাজে পরিণত করা। বন্দিনী সে-ও, কিন্তু তার পোশাক পরিষ্কার, গায়ের চামড়া মসৃণ, গতরও বেশ একটু গোলালো। কেমন করে হলো এসব? জবাব অচিরেই পাওয়া গেলো। আমাদের জন্য বরাদ্দ খাদ্যের একটা অংশ সে রোজ চুরি করে বিক্রী করে। সব কিছুই তার হাত দিয়ে আসে কিনা। দেখি,

রোজই মাপ খানিকটা খানিকটা করে কমছে। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি তোমায় মজা, জেলারের কাছে তোমার নামে নালিশ করবো! কল্পনা বললো, খবরদার, অমন কাজটিও কোরো না। মৈমুন নিজেও বন্দিনী। আমাদেরই একজন। ওর সঙ্গে আমাদের ঐক্যটাই প্রধান ব্যাপার। আর তাছাড়া বাস্তবিক পক্ষে মৈমুন বা অন্য জমাদারনীর সঙ্গে বিরোধ করে এখানে বাস করাও অসম্ভব। ওদেরই দৌলতে নিয়মের কড়াকড়ি থেকে যেটুকু অব্যাহতি আমরা পাই। কি হবে নালিশ করে? বড় বড় রাঘব বোয়াল রইলো বাদ, পুঁটি মাছের দোষ নিয়ে আমরা জল ঘোলা করতে চাইছি। কি দরকার এই সব অনর্থক ঝঞ্ঝাটে।

মেয়ে মহলের বেশির ভাগ দায়িত্বই মেটিনীর ঘাড়ে, সিদ্ধান্তের দায়িত্ব জমাদারের। এদের মাঝখানে রয়েছে আরো তিন জমাদারনী, তারা নিছকই জিম্মাদার। বন্দিনীদের সাথে তাদেরও মেয়ে ওয়ার্ডে তালা চাবি মেরে বন্ধ করে দিয়ে যাওয়া হয় এবং তালা ফের যতক্ষণ না কোন ওয়ার্ডার এসে খোলে ততক্ষণ তারাও বন্দী। যেন জেলের মধ্যে এদের জন্য আরেকটা জেল। তাদের কাজ সারা দিন-রাত বন্দিনীদের নজরে রাখা। তা কাঁহাতক আর পারে ঠায় বসে বসে দিবারাত্রি নজর রাখতে। ক্লান্তি ছাড়াও একঘেঁয়েমি বলেও একটা ব্যাপার আছে। প্রায়ই দেখা যেতো বসে বসে ওরা ঢুলছে। নয়তো শুয়ে আছে বিছানায়, কয়েকজন প্রিয় বন্দিনী চারপাশে ঘিরে বসে শুরু করেছে সুখ দুঃখের কথা। বেশ রঙ্গ মশকরাও চলছে। বা কখনো সখনো কেউ আহ্লাদে গায়ে পিঠে সরষের তেল মালিশ করে দিচ্ছে, আর শুয়ে শুয়ে ওরা মালিশের আরামটুকু উপভোগ করছে। মাঝে মাঝে কে জানে কি হতো, হয়তো খেয়াল চাপতো মাথায়, নচেৎ কৌতূহল,—আসতো আমাদের দিকে, কল্পনার সঙ্গে দু একটা কথা বলে যেতো। বড় গরীব ওরা, চাকরীর শর্তও নিছক গোলামীরই নামান্তর। ছুটি বলে কিছু নেই। যদি বা কখনো ছুটি মেলে, জেলের সীমানার বাইরে যাওয়া চলবে না, কর্তাদের হুকুমের জন্য সবাইকে কান খাড়া করে রাখতে হবে। এমন কি দোকানে যাবার দরকার হলেও বড় জমাদারের অনুমতি নিতে হয়। এতো যে আনুগত্য তাতেও নিস্তার নেই। পানের থেকে চুণ খসলেই বকুনি, তর্জন গর্জন। এক দফা জেল অফিসারের আরেকদফা জমাদারের। মাথা নীচু করে শুনতে হতো। আর কি জানি কেন আমাদের দুজনের ওপর ভারী মায়া পড়ে গিয়েছিল ওদের। আমাদের যে সারাদিন সারা রাত তালা-বন্দী থাকতে হয়, এজন্য দুঃখের ওদের শেষ ছিলো না। ওদের মধ্যে সবচেয়ে

সাহসী মেয়েটি মাঝে মাঝে খুলে দিতো আমাদের তালা। আমরা দুজন অনেকক্ষণ মন খুলে গল্প করতাম।

জেলে মোট দেড়শোর মতো জমাদার। তাদের মধ্যে একজন ডিউটি জমাদার। মেয়ে মহলের ফটকের চাবি দিনের বেলা থাকতো তারই হাতে। কয়েদীদের খাবার নিয়ে ভেতরে ঢোকানো বা ডাক্তার ঢোকা বা অন্য কোন অফিসার ঢোকা—সব কিছুর দায়িত্ব তারই। জেলের প্রশাসনিক দায়িত্বের অধিকারী সহকারী জেলার আর কিছু কেরাণী। জেলারের পরেই কেরাণীদের স্থান। জেলার সবার মাথায়। জেলের দৈনন্দিন খুঁটিনাটি কার্যবিবরণী পেশ করার সমস্ত দায়িত্ব তারই ঘাড়ে। জেল-সুপার কোন কিছু কৈফিয়ৎ তলব করলে উত্তর তাকেই দিতে হবে। আর অদ্ভুত মানুষ এই জেল-সুপার। চোখে সর্বদা কালো রঙের চশমা, গায়ের রং টকটকে লাল, মাথায় টুপি আর গায়ে জ্যাকেট – মনে হতো ফিল্মের লাইনে গেলেই যেন তাকে মানাতো বেশি। পশ্চিমী ঘেঁষা উচ্চবংশের সন্তান, কয়েক বছর ক্যানাডাতে কাটিয়ে এসেছে, অ্যামেরিকান উচ্চারণের এক বিজাতীয় কায়দা শিখে এসেছে সে দেশ থেকে। অবিশ্যিই শিক্ষা অসম্পূর্ণ। খানিকক্ষণ কথা বলার পর সব তালগোল পাকিয়ে যায়, তখন শুরু হয় খাঁটি দিশী ইংরাজী উচ্চারণ। আর কী খামখেয়ালী যে মন! কি যে করবে কখন, কি বলবে কিছুরই ঠিকঠিকানা নেই। এটা আমরা যেমন বুঝতাম জেলের কর্মচারীরাও বুঝতো। কতবার যে নিজের কর্তৃত্ব জাহিরের জন্য নিজেরই দেওয়া নির্দেশের রদবদল করেছে তার আর ইয়ত্তা নেই। এড়িয়ে চলতো তাকে সবাই। হয়তো কোন কর্মচারী কাজে এসেছে, এসে দেখলো সুপার হাজির, অমনি সটকে পড়তো। কি জানি, যদি তাকে দেখেই নতুন একটা মতলব গজিয়ে ওঠে, যদি পুরনো মতটা মুহূর্তের মধ্যে পালটে যায়!

তার আগমনের মধ্যেও ছিল এক অভিনব বৈচিত্র্য কাউকে কিছু খবর দিতো না জানাতো না, হঠাৎ একদিন এসে হাজির। সঙ্গে হয়তো কয়েকজন পুলিস অফিসার, নয় স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলীর কেউ। এসেছে খাঁচার বন্দীগুলোকে দেখতে। এলেই টের পেতাম আমরা। চতুর্দিকে সাজো সাজো রব। জেলখানার একঘেয়ে জীবনে একটু ব্যতিক্রমের ছোঁয়া। জমাদারনীরা তো ভয়ে থর থর করে কাঁপতো। কে জানে, সায়েবের চোখে যদি তাদের কোন ভুলত্রুটি ধরা পড়ে যায়। একদিন এক বন্দিনীর মেয়ে দুটো লাল গোলাপ তুলে আমাকে দিয়ে গেছে। ফটকের পাশেই গোলাপ গাছ। এমন মিষ্টি গন্ধ! সঙ্গে ভালবাসার মিশেল। ফুল দুটো আমি আমার জলের পাত্রে রেখে দিলাম।

সেদিন বিকেলে মহোদয় হাজির। পড়বি তো পড় আমার ফুল দুটোর দিকেই নজর পড়লো। অমনি গালাগালির ফোয়ারা। অদূরেই এক জমাদারনী, তাকে আঙুল নেড়ে ডাকলো, এই গাধার বাচ্চা, এদিকে আয়! এলো, যেন মানুষ নয়, জড়সড় লেজ গোটানো প্রভুভক্ত কুকুর। ফুলদুটো দেখিয়ে বললো, কাঁহাসে মিলা? সে তো চুপ। তার মানেই কেউ না কেউ ফুল আমাকে দিয়েছে। দিতে এসে নির্ঘাৎ দুটো একটা কথাও বলেছে। আমার তো নির্বাসন। 'গাধার বাচ্চা' তাকে আমার সঙ্গে কথা বলতে দিলো কেন? আমি ব্যাপারটা তাকে বোঝাতে চাইলাম, সে পাত্তা দিলো না, সাময়িক বরখাস্ত করলো মেয়েটিকে। অদ্ভুত ব্যাপার, আমাদের কি এক্ষেত্রে কিছুই করার নেই? কল্পনা আর আমি সেদিনই ঘোষণা করলাম, মেয়েটির ওপর থেকে বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত আমরা অনশন ধর্মঘট করবো। কাজ হলো। পরের দিনই উঠে গেলো বরখাস্তের আদেশ। একটা লাভও হলো। জমাদারনীরা বুঝলো, ওদের হয়রানি হোক আমরা চাই না, আমরা ওদের শুভাকাঙ্ক্ষী। যে কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে ওদের হয়েই আমরা লড়তে চাই। ফলে ঘনিষ্ঠতা বাড়লো। আর একটু কাছাকাছি হলো আমাদের মন। অবিশ্যি সর্বদা নজর থাকতো, মেলামেশার ফলে চাকরীর ব্যাপারে যেন অসুবিধে না হয়।

জেল সুপার এলেই আর্জি জানাতাম, আমাদের দুজনকে এক ঘরে রাখা হোক। সে ঘেউ ঘেউ করে উঠতো। সঠিক অর্থে সত্যি সত্যি কুকুরের ডাক নয়, তবে ঐ— কুকুর যেরকম আজীবন ঘেউ ঘেউ করে একই ডাক ডাকে, তারও মুখে সেই একই রা।— এক ঘরে কোনক্রমেই রাখা হবে না। তোমরা নকশাল নেতা। এক ঘরে বসে দুটোতে মিলে ফন্দী আঁটবে, জেল পালাবার মতলব ভাঁজবে আর সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। কিছুতেই তোমাদের একসঙ্গে থাকতে দেবো না।

ওরা যে আমাদের নেতা বলে ঠাউরে নিয়েছে এটা খুব মজার সন্দেহ নেই, কিন্তু এর ফলে যে সামান্যতম পড়াশুনো করার সুযোগটুকুও পাচ্ছি না, এটাই দুঃখের। দিন কি আর কাটতে চায়! কি নিয়েই বা কাটাবো? সরঞ্জাম বলতে তো অ্যালুমিনিয়ামের একটা থালি আর বালতি, একটা চিরুনী, একটা আয়না, দুটো ওষুধের শিশি, ঘিয়ে রঙের মোটা দু ফালি ন্যাকড়া— জেলখানায় তৈরী শাড়ীর দুটো টুকরো। এই নিয়ে কি সময় কাটে? সকাল বেলা নয় আধঘন্টা ধরে ঘসে ঘসে দাঁত মাজলাম দাঁতনে। দাঁতনের একটা দিক দাঁত

দিয়ে কামড়ে একেবারে থেঁতো করে ফেললাম। তারপর প্রাতরাশ। খেলাম অনেক সময় নিয়ে। তারপর থালি মাজলাম। অনেকক্ষণ ধরে মাজার পর এমন ভাবে ন্যাকড়া দিয়ে মুছলাম, যাতে চকচক ঝকঝক করে। এরপর চুল আঁচড়বার পালা। কতই বা আঁচড়াবো? দু ইঞ্চি লম্বা তো আমার ঐ টুকটুকু চুল। আঁচড়াতে আঁচড়াতে পায়চারী করতে করতে ছোটবেলা থেকে এ পর্যন্ত পড়া যাবতীয় কবিতা সব মুখস্থ বলে গেলাম। তাতেও সময় কাটে না। তখন খানিকটা ব্যায়াম। কিন্তু ব্যায়ামে বিঘ্ন অনেক। প্রথমতঃ আমার হঠাৎ-ধরা আমাশার উৎপত্তি, দ্বিতীয়তঃ রুক্ষ পাথুরে মেঝে। একদিন করার পরই কব্জিটব্জি টনটনাতে লাগলো। ইস্ যদি একটা খাতা আর কলম পেতাম! কত রকমভাবে বলেছি, চেয়েছি, ওরা কিছুতে খাতা কলম দেবে না। দিতো একখানা করে খবরের কাগজ। কাটাকুটিতে বোঝাই। কালো কালি দিয়ে বেশিরভাগ খবরই ঢেকে দেওয়া। পৌঁছুতো অনেক বেলায়। কল্পনা আর আমি ভাগাভাগি করে পড়তাম। হাতে হাতে দেবার নেবার তো উপায় নেই, বারবার ডাকতে হতো মেটিনীকে। কয়েকদিন পর অবিশ্যি একটা নয়া রাস্তা বেরুলো। কল্পনার শৌচাগারের ওপর দেয়ালে অল্প একটু ফাঁক, তারই মধ্য দিয়ে গলিয়ে দিতাম কাগজ, বা নিতামও। কাউকে আর ডাকাডাকির দরকার হতো না। একদিন মৈমুনের চোখে পড়ে গেল ব্যাপারটা। পরদিনই পেরেক, হাতুড়ি আর একফালি কাঠ নিয়ে কজন কয়েদী হাজির। ঠুকে ঠুকে অনেক কসরৎ করে কাঠ দিয়ে জায়গাটা আটকে দিয়ে গেল। কিন্তু পেরেক বসবে কিসে, পলেস্তারা শক্ত হওয়া চাই যে। ওরা চলে যাবার একটু পরেই হুড়মুড় করে পলেস্তারা সমেত খসে পড়লো সব। গর্ত আবার যে কে সেই।

খবরের কাগজ ছাড়া আর যা পড়ার সুযোগ পেতাম তা হলো জেলখানার লাইব্রেরীর বই। পুস্তক তালিকা দেখে দুখানা বইয়ের নামের পাশে দাগ মেরে দিলাম। বসওয়েলের 'জনসনের জীবনী' এবং এক খণ্ড শেকসপীয়র। দাগ-টাগ দিয়ে তো বসে আছি প্রতীক্ষায়, কবে এসে পৌঁছবে বই দুখানা। হায় আশা! তুলোট কাগজের মতো হলদে পতপতে পাতা আর সারা পাতা জুড়ে ফুটো ফুটো ফুটো। ছারপোকাই হয়তো, কেননা পাতায় পাতায় রক্তের ছোপ। কয়েকটা তো বই খোলার সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে পড়লো মেঝেয়, কম্বলের মধ্যে গিয়ে সেঁধুলো। কী বিতিকিচ্ছিরি যে গন্ধ! সব অভ্যেস হয়ে গিয়েছিলো আমার। দেখতাম রোজ ওরা একটু একটু করে মোটা হচ্ছে, ফুলে ফেঁপে উঠছে। রক্ত শুষে বাদামী হচ্ছে শরীরের রং। সব রক্ত আমার।

সারাদিনের মধ্যে সবচেয়ে আনন্দের সময় স্নান করার মুহূর্তটুকু। ঘর থেকে বেরিয়ে বিশ গজের মতো হেঁটে আমাকে একটা কলের কাছে যেতে হতো। একমেবাদ্বিতীয়ম্ সেই কল। মুখটা সিমেন্টের গাঁথুনির মধ্য দিয়ে বের করা। তিনবার জল আসতো সারাদিনে, সকালে দুপুরে আর সন্ধ্যেয়, প্রত্যেকবার ঘন্টা দুই তার মেয়াদ। আমি যখন চান করতাম, তখন আর সব বন্দিনীরা তালা বন্দী, শুধু কড়া পাহারায় থাকতো এক জমাদারনী। আর থাকতো কলের নীচে একটা বালতি, তা থেকে মগে জল ভরে চান করতে হতো। বসে নিতাম সিমেন্টের বাঁধানো চাতালে। বেশ গরম চাতালটা। একই কলের আরেকটা দিক ওপাশে পুরুষ মহলে। আর কী গরম সেই জল! পাশেই একটা নর্দমা। পিঠের ওপর গনগনে রোদ। গরম জলে গরম রোদে পিঠ দিয়ে স্নান করে খালি পায়ে তপ্ত পাথরের ওপর দিয়ে হেঁটে নিজের ঘরে ফিরে মনে হতো, কই স্নান করে তৃপ্তির লেশমাত্রও তো লাভ হলো না! এক জমাদারনী শিখিয়ে দিয়েছিল কাপড় কাচার কৌশল। সিমেন্টের বাঁধানো চাতালে ধপাস ধপাস করে আছড়ে কাপড় কাচা। কি আর কাচবো, আমার আর আছেটা কি। প্যান্ট শার্ট ধুয়ে শুকোতে দিয়ে গায়ে জড়িয়ে রাখতাম সেই একফালি ন্যাকড়া। সেই অবস্থাতেই মাঝে মাঝে হাজির হতো অফিসার। কি করবো, আমার আর কোনো উপায় নেই। সত্যি বলতে কি, এতোটুকু জড়তা সেজন্য আমার বোধের মধ্যেও আসতো না। একবার সুপারকে বলেছিলাম আমাকে একটা ব্লাউজ দিতে। বললো, দরকার কি, তুমি তো শিগগীরই ছাড়া পাবে।

রাতেও সেই বাঁধাধরা হিসেব। কল্পনার সঙ্গে খুব একচোট চিল-চিৎকার হলো। আমি গিয়ে দাঁড়ালাম লোহার গারদের সামনে। জেলের বাইরে পিপুল গাছের মাথায় তখন চাঁদ উঠছে। একটা সাদা পেঁচাকে মাঝে মাঝে দেখতাম ঠিক বসে আছে পুরুষ মহলের ছাতের মাথায়। চাঁদের মিষ্টি আলোয় ভারী অদ্ভুত লাগতো তাকে। দেখতাম ব্যাঙ লাফিয়ে লাফিয়ে বেরোচ্ছে নর্দমার মুখ থেকে, নিম গাছের ডালে বসে আছে অজস্র ঘুমন্ত পাখী, নিম গাছটা একেবার আমার ঘরের ঠিক সামনে; দেখতাম আর মনটা কেমন উথাল পাথাল করতো। এই নিশুতি রাত, এরও তো একটা ভাষা আছে। প্রকৃতির সব কিছু মানুষের চির চেনা, তবু রোজ মানুষ সেই চেনা জিনিসটিকেই দেখে নতুন করে। আমিও দেখি। পারে নি বন্দীদশা আমাকে পুরোপুরি প্রকৃতির হাত থেকে ছিনিয়ে আনতে।

একটা ব্যাপার ঠিক ঠিকই বুঝে গিয়েছিলাম, বন্দীদশায় আমাদের অবস্থার

যা কিছু পরিবর্তন দরকার সব আদায় হবে একমাত্র লড়াই করে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে বা যুক্তি দেখিয়ে নয়। ওরা দিতে চাইবে না, নিতান্ত অনিচ্ছুক,—আমরাও ছাড়বো না, আদায় না হওয়া অব্দি লড়বো। এখন মুশকিল হলো এই, কল্পনা বা আমি কেউ তো এর আগে জেলে আসিনি। সব নিয়ম কানুন ঠিক ঠিক জানিও না। একদিন তাই জেল ম্যানুয়ালখানা দেখতে চেয়ে আর্জি পাঠালাম। জবাব শুনে রাগে আমার হাড়পিত্তি জ্বলতে লাগল। ম্যানুয়াল নাকি একখানা, আমাকে দেওয়া যাবে না; সেখানা অফিসে থাকার কথা, অফিসে থাকবে, এবং স্বভাবতই অফিসে গিয়ে পড়বার অনুমতি আমি পাবো না। সব শেষে বলে কিনা—ম্যানুয়াল মাফিক জেল চালালে আমরা নাকি সহ্য করতে পারবো না, দুদিনেই ডাক ছেড়ে কাঁদতে বসবো। হোক, আমারও গোঁ—আমি ম্যানুয়াল দেখবোই দেখবো। শেষে স্বয়ং জেলার এসে হাজির। বলে ম্যানুয়াল নামক কোন পদার্থের অস্তিত্বই নাকি জেলে নেই। কোন এক সময় বস্তুটি ছাপা হয়েছিল, আপাততঃ তা শেষ হয়ে গেছে। জেল চলে বড় কর্তার স্মৃতির ওপর নির্ভর করে। অর্থাৎ কবে তিনি কি পড়েছেন, কি তার ব্যাখ্যা করেছেন, কতটুকু কি মনে আছে—সেগুলোই জেলখানার নিয়ম। তাহলেই প্রশ্ন আসে —আমরা যে বন্দী, আমাদের অধিকার বলেও তো একটা জিনিস আছে, সেগুলো কি? আমাদের কোন্ কোন্ প্রয়োজন এবং চাহিদা সরকার পূর্ণ করবে কোন্গুলো করবে না। এগুলো আমরা বুঝবো কি করে? আসলে বোঝাবার জন্য কারুরই মাথাব্যাথা নেই। জেলখানায় এলেই কনিষ্ঠতম কর্মচারী থেকে ওপর-ওলা অব্দি সবাই ধরে নেয়, নির্ঘাৎ কোনো মারাত্মক অপরাধ করে এসেছে, তাই এখানে ঠাঁই এবং এই সব অপরাধীদের খাদ্য দিয়ে বাসস্থান দিয়ে সরকার না জানি কী দয়াই না করছে! এতো দয়া দাক্ষিণ্যের পরও যারা লিখিত নিয়ম কানুন দেখতে চায় তারা নিতান্তই অপদার্থ! অপদার্থ তো বটেই। নইলে শুরু থেকে বিনা প্রতিবাদে সব কিছু মেনে নিই! সুযোগ তো আমরাই করে দিচ্ছি। একে ওরা যদৃচ্ছ ব্যবহার করবে না তো কি।

দুপুরে খাবার নিয়ে আসতো মেটিনী। গারদের নীচের ফাঁকটুকু দিয়ে থালিটা ঘরে গলিয়ে দিয়ে ইশারা করে বলতো খেয়ে নিতে। খাবো কি? আমি তো অবাক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে শুধু দেখছি। মোটা চালের খানিকটা ভাত, তা আবার কাঁকর আর তুষে বোঝাই, কালচে সবুজ রঙের একরকম জলীয় বস্তু তার আড়ালে কয়েকটা মুসুরের দানা, পাঁচ ছ টুকরো ছালসমেত আলু, তাতে লেগে থাকা খানিকটা আঁঠালো তরল, শুনেছি এটা নাকি ভাতের ফ্যানের

সঙ্গে কটা শুকনো লঙ্কা আর একটু হলুদের মিশেল দিয়ে তৈরী হয়, ব্যস্ এই হলো দুপুরের খাবার। দেখে কি আর ক্ষিধে বলে কিছু থাকে! তার ওপর থালাটা আবার ফাটা, তার ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে সেই কালচে রঙের মহার্ঘ বস্তুটি মেঝেতে পড়ছে। তবুও যাহোক করে মনকে প্রবোধ দিয়ে হাত বাড়াতে যাবো, অমনি কল্পনা চিৎকার করে মানা করলো আমি যেন ভুলেও থালা না ছুঁই। ছুঁলাম না। ঠিক হলো অনশন করবো। খাদ্যের মান উন্নত করতেই হবে। তিন দিন পর জেলার এসে হাজির। মানলো দাবী। নতুন নির্দেশ এলো—কল্পনা এবার থেকে নকশাল বিভাগের খাবার পাবে, ওরাও নাকি এরই মধ্যে অনশন চালিয়ে খাবারের মান উন্নত করার দাবী মানাতে বাধ্য করেছে, আর আমি যেহেতু আমাশার রুগী—আমার খাবার আসবে জেল হাসপাতাল থেকে। এলো তাই। আঙুল ডুবিয়ে ডুবিয়ে চোদ্দটা শুকনো লঙ্কা তুললাম আমার ডালের মধ্যে থেকে, রেখে দিলাম ডাক্তারকে দেখাবো বলে। দেখালামও। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা। আমার অভিযোগে কান দিলো না; উপরন্তু বলে কিনা—এর চেয়ে ভালো সুপাচ্য খাবার নাকি দুর্লভ।

কদিন পরের কথা। ওপাশের নকশাল মহল থেকে কল্পনার খাবারের সঙ্গে আমাদের উদ্দেশ্যে একটা খবর পাঠানো হলো। কল্পনাকে দেবার আগে মৈমুন যথারীতি খাবারে ভাগ বসায়। সেদিনও ভাগ বসাতে গিয়ে ধরে ফেললো ব্যাপারটা। কাগজটা নাকি চাপাটির নীচে ভাঁজ করা ছিল। ফলে আবারও ব্যবস্থার পরিবর্তন। এবার ঠিক হলো কল্পনা আর আমি নিজেদের রান্না করে নেবো। একদিন করবে কল্পনা, একদিন আমি। যার যেদিন ভাগ সেদিন সে দু ঘন্টার জন্য ছাড়া পাবে। হোক গে দু ঘন্টা, তবু তো একটা জয়। আমাদের দাবীর পায়ে মাথা নুইয়ে ওরা তো এতোদিনের প্রচলিত নিয়ম ভাঙতে বাধ্য হলো।

প্রতি রোববার দেওয়া হত অমোদের হপ্তার রেশন। চাল, ভূষি মিশেল আটা, মুশুর ডাল, আলু, কটা পেঁয়াজ, একটু সরষের তেল, শুকনো লঙ্কা আর হলুদ। এই হলো বরাদ্দ। না হয় পেলাম সব, কিন্তু রাখবো কিসে? চেয়ে চিন্তে জোগাড় করলাম দুটো চটের থলি; কল্পনার ঘরের এক কোণে একটা থলির ওপর সব আলাদা করে রেখে আর একটা দিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখলাম। সপ্তাহে একদিন করে দেওয়া হতো খানিকটা নাড়ি-ভুড়ি সুদ্ধু ছাগলের মাংস। কী উৎকট গন্ধ! ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে ফোটাবার পরও মনে হতো যেন শক্ত চামড়া। একটু চা চিনিও পেতাম। অবশ্যই এটা

একমাত্র আমার জন্য। আমি ভিনদেশী কিনা। আমার জন্যে বরাদ্দ চালের মানও একটু উন্নত ধরনের,তেলটাও পরিমাণে একটু বেশি। চাল ভালো দেবার জন্য আমি প্রতিবাদ করেছি, বলেছি, চাই না, কল্পনা যা পায় আমাকেও তাই দেওয়া হোক। যথারীতি ওরা তা করেনি। এক্ষেত্রে ওরা নিয়ম রক্ষা করছে। জেলখানার নিয়মে আছে, ইওরোপীয় বন্দীরা পাবে রাজকীয় ব্যবহার, নিয়ম কানুন তো পুরনো দিনের শাসক রাজা ইওরোপীয়দেরই তৈরী, স্বাধীনতার পরেও চলছে সেই মান্ধাতার নিয়ম, সেই অনুযায়ী ওরা আমাকে উন্নত মানের চাল, পরিমাণে বেশি তেল দিচ্ছে। ফলে মানবে কেন আমার প্রতিবাদ! গোল বাঁধাতো কেবল সেই সংগ্রহ-শালার তত্ত্বাবধায়কটি। সে-ই কেবল নিয়ম ছাড়া। সে-ও কয়েদী, ভাঁটার মতো দুটো চোখ, গলায় বাঁধা জেলখানার কড়া, চাল ডাল মশলা পাতির খানিকটা অংশ সে হাতাতো। স্বাভাবিক, কেননা বাইরে এগুলোর ভালো দাম পাওয়া যায়, বিক্রীর বাজারও আছে। সুযোগ পেলে কেউ আর সুযোগের অসদ্ব্যবহার করে! মেটিনীর সঙ্গে এ ব্যাপারে তার সাট ছিল। হয়তো খানিকটা দহরম-মহরমও। প্রায়ই এটা ওটা সরিয়ে ওকে দিতে দেখতাম।

রান্না ব্যাপারটাকে অতএব দৈনন্দিন কার্যতালিকার মধ্যে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে স্থান দিতে শুরু করলাম। কত যে পথ আবিষ্কার হলো! কেমন করে কত কায়দায় রান্নার সময় বেশি লাগানো যায় এবং এইভাবে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে অনেক বেশিক্ষণ বাইরে থাকা যায়। এতো করেও রান্না কিন্তু নমঃ নমঃ। ভাতটা কোনমতে ফুটিয়ে নেওয়া, সসপ্যানে ডাল আর আলু চাপিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করা, ফুটতে ফুটতে দুয়ে মিলে গলে গিয়ে এক অদ্ভুত লেই তৈরী হতো। জমাদারনী কি পারে অতোক্ষণ ঠায় বসে থাকতে! তাগাদা দিতো। বলতাম, দাঁড়াও না, সবুর কর বাপু। আমাদের ইংরিজী খাবার এইভাবেই রান্না হয়। এতে সময় একটু বেশি লাগে। অত তাড়া দিলে রান্না নষ্ট হয়ে যাবে যে! ফাঁকে ফাঁকে তৈরী হতো চা। দুধ নেই চিনি কম— সে এক অদ্ভুত স্বাদ। অ্যালুমিনিয়ামের মগে খেতাম বলে মগের একটা উৎকট গন্ধ উঠতো। সব অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। সব। উদ্দেশ্য তো বেশিক্ষণ বাইরে থাকা, আর কল্পনার সঙ্গে কথা বলা। কত যে কথা! অফুরান, অনন্ত। শেষ যেন আর হতেই চায় না। সব জানলাম ওর, ওর বাড়ি, ঘর, পরিবার, পরিজন— কিছু বাদ গেলো না। ও-ও আমারটা জেনে নিল। ভারতীয় কত রীতি নীতিই না শিখলাম। ধৈর্য্য আছে মেয়েটার। দিনের পর দিন

বুঝিয়ে বুঝিয়ে আমাকে সংযত করলো, আমার মেজাজ ঠাণ্ডা করলো। ও-ই বোঝালো, জেলে যারা বন্দিনী, আগে কখনো তারা ইংরেজ মেয়ে মানুষ দেখেনি, এই বিবেচনা করে আমি যেন ওদের সঙ্গে সহজ ভাবে মিশি। কী সহজ সুন্দর ওর বুদ্ধি! ও না থাকলে কি করতাম আমি কে জানে।

এলো বর্ষা। আমাদের একেবারে অসুবিধের চরম। প্রায় রোজই বৃষ্টি হতো। বিকেলে আকাশ কালো করে শুধু ঝমঝম ঝরঝর— ঝরার যেন আর শেষ নেই। সঙ্গে পাগলা হাওয়া। এক একটা হাওয়ার দমক আসতো আর দিতো আমাদের ঘর পুরো ভিজিয়ে। সে একেবারে জল থই থই। কম্বল ভিজে জবজবে, রাত্রে যে এমনি মেঝের ওপরই শোবো, এমন একটু শুকনো জায়গাও নেই। বললাম সুপারকে। অনুমতি হলো, ওপরের খানিকটা আমরা চটের আবরণ দিয়ে ঢেকে নিতে পারি, কিন্তু নিচের অংশ খোলা থাকবে। না থাকলে জমাদারনী দেখবে কি করে আমরা ভেতরে কি মতলব আঁটছি! ফলে বৃষ্টির দাপট বলতে গেলে একরকমই রইলো, মাঝখান থেকে চটের একটু আড়াল হলো এই যা। কয়লা টয়লা ভিজে তো একেবারে যাচ্ছে তাই। ধরাবার জন্যে কী কষ্টটাই না করতে হতো। গভীর রাত অব্দি বহু পরিশ্রমে কোনোদিন তৈরী হতো হয়তো খান দুই আধপোড়া আধভাজা রুটি। তাতে ধোঁয়ার বিদঘুটে গন্ধ। তাই দিয়েই ক্ষুন্নিবৃত্তি। ত' দুঃখ ছিলো না। বৃষ্টি মানেই আশীর্বাদ। উনুন ধরানো থেকে রুটি সেঁকা এইসব সাত কাণ্ড করতে গিয়ে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে অনেক বেশিক্ষণের মুক্তি। বাধা দেবার কেউ নেই। কেননা ঐ বৃষ্টিতে এতোখানি ভিজে আসবে কে এদিকে বাধা দিতে। চলতো গল্প আর গল্প। একজন ভেতরে, একজন বাইরে বৃষ্টির মধ্যে। জমাদারনীরা দূর থেকে দেখতো আর ভাবতো নির্ঘাৎ আমাদের মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেছে। নইলে অমন করে বৃষ্টিতে কেউ ভেজে! আমরা ভাবতাম, কথা বলার এ এক অদ্ভুত সুযোগ। একে কাজে লাগাও। যত বেশি পারো কথা বলো, আরো বলো।

বলতামও। কোর্টে গেলে কি বলবো, কেমন করে আত্মপক্ষ সমর্থন করবো, কেমন করে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে পৃথিবীর মানুষকে শোনাবো আশার বাণী— সব আমরা আলোচনা করতাম।

আসলে, কোর্টে যে আমাদের হাজির করানো হবে এরকম একটা গুজব খুব চাউর হয়ে গিয়েছিল। মুখে মুখে শুনি একটার পর একটা তারিখ, মুখে মুখেই সেটা আবার পালটে যায়। দৌড় শুধু আমাদের জেলখানার অফিসার

অব্দি। সেখানে স্থানীয় আদালতের এক বিচারক বসে থাকেন। মোটা সোটা, আত্মসুখী গোছের চেহারা। দেখে মনে হতো, যেন খানিকটা অসহায়ও। আমাদের ব্যাপারে তার কোনো এক্তিয়ার ছিলো না, কেননা আমরা তার এলাকায় গ্রেপ্তার হইনি। যাওয়া আর ফিরে আসা এই আমাদের কাজ। যাওয়াটা ভালো লাগতো, কেননা দৈনন্দিন নিয়মের বাইরে একটা কাজ। একটু আশারও সঞ্চার হতো, হয় তো অমলেন্দুর সঙ্গে চোখের দেখাও হয়ে যেতে পারে। দেখলাম একদিন আরেকজনকে, আমাদের সঙ্গেই সে গ্রেপ্তার হয়েছিল। আমাদের বললো আমরা যেন রাজবন্দী হিসেবে গণ্য হবার দাবী জানাই। মঞ্জুর হলে সুযোগ সুবিধে বাড়বে। কল্পনা আর আমি দুজনেই পরদিন আবেদন পেশ করলাম। একটু খচখচ করছিল মনটা, কাজটা কি ঠিক হচ্ছে, অন্য সবার চেয়ে আলাদা থাকবো, এটা কি ন্যায্য দাবী? বিচ্ছিন্নতা আসবে না? এলো না, কেননা আশংকা আমাদের অমূলক। সুপার পরিষ্কার বলে দিল, আমরা রাজনৈতিক বন্দী নই, আমরা অপরাধী। অপরাধীদের অপরাধীর মতোই থাকতে হবে। রাজবন্দী বলে আমরা স্বীকৃত হবো না।

গোড়ার দিকে অফিস ঘরে গিয়ে হাকিমকে জিজ্ঞেস করতাম আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কি। তিনি ভারতীয় পেনাল কোডের চারটি ধারা গড়-গড়িয়ে মুখস্থ বলে যেতেন। বলতেন, আমরা জনা পঞ্চাশের মতো লোক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সমেত দাঙ্গা করছিলাম, আমরা সশস্ত্র ডাকাতি করেছি; হত্যার চেষ্টা করেছি এবং এইভাবে সেখানকার শান্তি বিপন্ন করেছি। এইগুলোই আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ। মনে মনে ভাবতাম, তবু শাস্তি, এই অপরাধের সাজা বড়জোর দশ বছরের জেল। কদিন পর হুকুম এলো হাকিমের সামনে যাওয়ার আর দরকার নেই। এবার থেকে তিনি আমাদের না দেখেই পরোয়ানার মেয়াদ বাড়িয়ে যাবেন। দেখো কাণ্ড! আইনে যেখানে আছে গ্রেফতারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে হাকিমের সামনে হাজির করার কথা এবং মামলা না ওঠা অব্দি পনেরো দিন পর পর তার সামনে ক্রমাগত হাজির করা, সেই আইন কিনা ওরা নিজেদের খেয়াল খুশী মতো এইভাবে সাজাচ্ছে। কি বলবো একে, ন্যায়!

প্রায় এক মাস যাবৎ টালবাহানার পর কলকাতার ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশন অফিসের এক অফিসার আমার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেলেন। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আগেই নিজেদের মতো করে সাজিয়ে তাকে যা বলার

সব বলে দিয়েছে। ফলে আমার কাছ থেকে আর তার জানতে হলো না, কেমন আছি আমি, আমার খাওয়া দাওয়ার কোনো অসুবিধে হচ্ছে কিনা। তার মুখেই শুনলাম, আমি যে ভেতরের জামাটার আবেদন জানিয়ে চিঠি দিয়েছি, ও ব্যাপারে অনুমতি আনতে হবে পাটনার সদর দপ্তর থেকে। শুনে এমন হাসি পেলো! চাই আমার ভেতরের জামা, তার অনুমতি দেবে কিনা বিহার সরকারের মাননীয় মুখ্য সচিব। মশায়ের কি আর খেয়ে পরে কোন কাজ নেই!

অফিসারকে বিস্তর অনুরোধ করলাম অমলেন্দুর সঙ্গে দেখা করতে, উনি হ্যাঁ না কিছুই বললেন না। এদিকে এদেশের সরকার আমার বিয়ের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। উদ্দেশ্য পরিষ্কার, যাতে করে আমি অমলেন্দুর সঙ্গে এ ব্যাপারে কোন আলাপ আলোচনা পর্যন্ত না করতে পারি। একলা কি করবো আমি? আমার পক্ষে কি কিছু কবা সম্ভব? নিজের বন্দীঘরে ফিরে আগা-গোড়া ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে বসলাম। ভীষণ রাগ হচ্ছে। এতক্ষণ ধরে আলোচনা হলো, ফল কিছুই হলো না। না একটা যুক্তিপূর্ণ কথা, না কোনো সিদ্ধান্ত। কি দরকার ছিলো তবে এই সাক্ষাতের! ক মাস পর আর এক অফিসার এসে হাজির। সে আর এক কাঠি ওপরে। আমাকে বলে কিনা, ভারতে যা সব হচ্ছে তা ভারতেরই ব্যাপার, আমি ভিনদেশী, আমার তাতে কোনো ভূমিকা নেই; যদিবা আমি মনে প্রাণে কিছু বিশ্বাস করে থাকি, যেন সব ভুলে গিয়ে জেল থেকে বেরোবার ব্যাপারে আত্ম নিয়োগ করি এবং সেটাই হোক আমার একমাত্র ধ্যান জ্ঞান। আমাদের চারপাশে বসা তখন এক ঘর স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের পুলিস। একটি কথাও আমি বলি নি। কিন্তু খবরের কাগজে বেরুলো, আমি নাকি ভারতীয় কর্তৃপক্ষের ভূয়সী গুণগান করে এক লম্বা বক্তব্য রেখেছি এবং সেই বক্তব্য তারা অক্ষরে অক্ষরে কাগজে প্রকাশ করেও ছাড়লো।

মনের যা কিছু ক্লেদ গ্লানি, কদিন পর একখানা চিঠি পেয়ে সব ভুলে গেলাম। লিখেছে অনামী কয়েকটি স্কুলের মেয়ে, সেই সুদূর ইংল্যাণ্ড থেকে। লিখেছে আমার প্রতি তারা কৃতজ্ঞ, আমি ভারতকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছি। প্রয়োজনে তারাও সাহায্য করতে পিছপা হবে না, চিঠিতে এই আশ্বাসও দিয়েছে। ভারী ভালো লাগলো। জেলে আসার পর এই আমার বাইরে থেকে পাওয়া প্রথম চিঠি। কিন্তু কিভাবে ছাড়লো ওরা এই চিঠি? একটু দাগ কাটলো না, একটা লাইনও বাদ দিলো না, হুবহু পাঠিয়ে দিলো পুরোটা! আশ্চর্য! খোঁজ নিয়ে শুনি, কল্পনারও একখানা চিঠি এসেছে।

লিখেছেন মাদ্রাজ থেকে এক মহিলা। এক বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বকলমে। ভদ্রলোকটি নাকি আমাদের মধ্যে একজনকে বা সম্ভব হলে দুজনকেই বউ করতে চান, শর্ত দুটো— এক, আমরা দেখতে সুন্দরী হবো, দুই— বয়েস দুজনেরই পঁচিশের নিচে হওয়া চাই। ভাবিয়ে তুললো চিঠিটা। চ্যাংড়ামি নাকি অন্য কিছু? বড় জমাদারণীকে বলে জবাবী ফর্ম আনালাম। লিখলাম সেই মহিলাকে, আপনি পাত্র সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাঠান। সে চিঠির আর কোনো জবাব আসেনি।

খুব জানতে ইচ্ছে হতো আমার সহবন্দিনীদের বিষয়ে, ওদের বেশি বেশি করে দেখার ইচ্ছে হতো। কিন্তু কোন যে উপায় নেই, সব রাস্তা যে বন্ধ। ভয় বা বিপদের সম্ভাবনাও কি কম! কেউ একজন হয়তো আমাদের ঘরের একটু বেশি কাছাকাছি ঘুরঘুর করছে, মেটিনী দেখে ফেললো, বা জমাদারনী— অমনি সে কি গালাগালির চোট! কখনো কখনো দু এক ঘা লাগাতেও কসুর করতো না। তবু ঐ যে বলে একটা টান, চুম্বকের মতো আর্কষণী একরকম শক্তি— ওরা আসতো, এতো কিছু সত্ত্বেও, এবং আসতো ওদের মধ্যে যারা সাহসী তারাই। বিকেল ঘনিয়ে তখন সবে সন্ধ্যের ঘোর লেগেছে, দেখতাম ছায়ার মতো একটা দুটো শরীর এসে আমার গারদের সামনে দাঁড়ালো। তখন সবার বিশ্রামের সময়। কারুর চোখ পড়তো না ওদের গতিবিধির দিকে। আমি তো চাই প্রাণ খুলে ওদের সঙ্গে কথা বলতে। পারতাম না, বুঝতাম না যে সব কথা; তবু হৃদয় দিয়ে বুঝতাম ওদের হৃদয়ের টান। সন্ধ্যের পর স্থূলাঙ্গিনী এক চাষীর মেয়ে আমার ঘরে তেলের বাতি দিয়ে যেতো। মেঝের ওপর বাতি নামিয়ে রেখে রোজ হাসতো আমার দিকে তাকিয়ে, তারপর মেটিনীর ঘরমুখো মুখ করে মুখ ভ্যাংচাতো। ও নাকি ওকে আমার সঙ্গে কথা বলতে পই পই মানা করে দিয়েছে। ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী আমার তখন রোজ একটা করে কমলালেবু বরাদ্দ। আধখানা আমি না খেয়ে ওর জন্যে রেখে দিতাম। যেই না দিতাম ওর হাতে, কী আনন্দ! শাড়ীর আড়ালে লুকিয়ে অমনি ছুটতো পায়খানার দিকে। সেখানে বসে লুকিয়ে লুকিয়ে খেতো। কল্পনার কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম, ওদের কারুরই এখনো বিচার হয় নি, কেউ দু বছর কেউ চার বছর কেউ বা আরো বেশি দিন এখানে আছে। কয়েক জনের তো ছেলে মেয়ে এখানেই বড় হয়ে গেল। কী ভালো লাগতে যে এই বাচ্চাগুলোকে দেখলে! বড়রা মানা করতো, কে শোনে তাদের মানা। গুটি গুটি হাঁটতে হাঁটতে চলে আসতো আমার ঘরের বাইরে। গারদের ওপাশে

জড় হতো। আমাকে বলতো চুল আঁচড়ে দিতে, দিতাম। বলতো, আয়না দেখবো, দেখাতাম। কেউ বা চাইতো আমার চশমাটা, দিতাম পরিয়ে। ঘরে ছিলো একটা ঝাঁটা, তার কাঠি দিয়ে বানিয়ে দিতাম ওদের হরেক রকম খেলনা। খাবারও দিতাম।

এই ভাবে টানা তিন মাস। বিরাম নেই অবকাশ নেই, চক্রাকারে আবর্তিত এক একটি দিন। নাঃ, সুপারকে আর কিছু বলবো না। কোনো আর্জি নয়, কোন দাবীও নয়। ওরা ভাবে, আর্জি মানা মানেই দাক্ষিণ্য দেখানো। আর্জি না মেনে ভাবে আমাদের খুব সাজা দিল। কি লাভ ওদের কাছে দয়া প্রার্থনা করে! দুজনের এক ঘরে থাকা—থাকি নয় না-ই হলো, এই তো বেশ, এ ভাবেই নয় কাটিয়ে দেবো আগামী শত শত দিন। মনটাকে এই ভাবে যখন বেঁধে ফেলেছি, সেটা সেপ্টেম্বর—সকালে একদিন সুপার এলো জেল পরিদর্শনে। আমারই ঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলো, হঠাৎ বলে কিনা, তোমরা দুজন কি একসঙ্গে থাকতে চাও? তুমি আর কল্পনা? স্বভাবতঃই জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করিনি। কিন্তু অবাক কাণ্ড। পরদিন সকালে ভারী তালাটা খুলে গেল। বাইরে তখন রোদ আর আকাশ। হুকুম এসেছে আমরা এবার থেকে একসঙ্গে থাকবো। আমি এবং কল্পনা।

শুরু হলো মুক্তির সে এক নতুন যুগ।

সকাল থেকে সন্ধ্যে আমরা বাইরে। আমাদের তালা নেই, বন্ধন নেই। মাথার ওপর খোলা আকাশ। রোদ আসছে আকাশ চুঁইয়ে। কী যে অপরূপ সেই প্রথম দিনটি! অপরূপ আরো একটা কারণে। মৈমুন চলে গেছে। কী অসহ্য যে লাগত ওকে! সব সময় শয়তানী, এর পেছনে ওকে লাগিয়ে দেওয়া— জীবন যেন দুর্বিসহ করে তুলেছিল। ছ বছর পর আদালতে উঠলো ওর মামলা। দেখা গেলো, মামলার প্রধান সাক্ষী ততদিনে মারা গেছে, আরেকজন সাক্ষী বেপাত্তা। ফলে বেকসুর খালাস। ও, ওর স্বামী দুজনেই। দুজনেরই বিরুদ্ধে এক তরুণী অপহরণের অভিযোগ। ওর স্বামী নাকি তাকে বিয়েও করেছিল। স্বামীও এতোদিন বন্দী ছিল জেলে।

মৈমুনের বদলি এলো নাগো। বাইশ বছর বয়েস। সাত বছরের মেয়াদ। এরই মধ্যে কয়েক বছর কাটানো হয়ে গেছে। কাকে নাকি খুন করতে গিয়ে ছিল, সেটাই ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ। কর্তৃপক্ষ এরকম কয়েদীকেই এই সব দায়িত্বের কাজে বেছে নেয়। লোভনীয় কাজই বটে। অন্যের ওপর খবরদারী করা, কর্তৃপক্ষের অনুগত কর্মচারী হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করা। এবং বিনিময়ে নির্দ্ধারিত মেয়াদের কিছু ছাড় বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা লাভ করা। এ সুযোগ কেউ কি পায়ে ঠেলে! অচিরেই নাগোর যোগ্যতার পরিচয় পেলাম। বন্দিনীদের মধ্যে ত্রাস সঞ্চার করে নিজের অস্তিত্ব সে প্রমাণ করলো। তবে আমাদের খুব একটা ঘাঁটাতো না। একটু এড়িয়েই চলতো। সারা ওয়ার্ডে আমরাই একমাত্র তালাখোলা বন্দী কিনা। কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে সব তো আমাদের নজরে পড়ে। আমাদের পেছনে লাগলে যদি পালটা ওর কাজকর্ম নিয়ে আমরাও ওর পেছনে লাগি!

বড় অপূর্ব লাগতো জেলখানার ঘেরা উঠোনটুকু। টানা তিনমাস তো তালাবন্দী। ভালো লাগবে এটাই স্বাভাবিক। মনে হতো যেন স্বর্গ। কে আর চায় স্বর্গ থেকে বিদায় নিতে? যেহেতু কড়াকড়ি আমাদের ওপর অনেকটা শিথিল, বলতে গেলে সারা দিন উঠোনেই কাটাতাম। আহা, সে যে কী আনন্দ! দেখতে দেখতে শীতটাও পড়লো। শরীরও সারলো। কাজের আগ্রহ আবার একটু একটু করে ফিরে পাচ্ছি। এমনিতে তো করার কিছু নেই। শুধু হাঁটতাম। ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে দুপুর অব্দি কল্পনা আর

আমার বিরামবিহীন হাঁটা। এমাথা থেকে ওমাথা। শেষে রোদ যখন অসহ্য হয়ে উঠতো, পুড়ে যেতো পিঠ, ফিরে আসতাম ঘরে, একটু ঠাণ্ডা হবার জন্য। আর হাঁটতে হাঁটতে হাত পা ছুঁড়ে সে যে কত গান! একটার পর একটা, যেন স্রোতের মতো, কুলুকুলু নদীর মতো। দেখলে মনে হতো আমরা যেন কোন অভিযানে বেরিয়েছি। বিকেলে দুজনে বসতাম পেয়ারা গাছের নীচে। কল্পনার জার্মান ভাষা শেখার বড় আগ্রহ, আমার আবার হিন্দী আর বাংলা। লেখা পড়ার তো কোনো সরঞ্জাম নেই, গাছের শুকনো ডাল দিয়ে লাল মাটির ওপর আঁক কেটে এ ওকে যতটা সম্ভব বোঝাতাম।

হাজারিবাগ জেলের জেনানা মহলের বন্দীদের কারুরই বেশি দিন থাকার কথা নয়। সবারই মেয়াদ কম। সবাই হয়তো দিন গুণছে কবে হাজতে মামলা উঠবে। ফলে কাজও কিছু নেই। (জেলখানায় একমাত্র সাজাপ্রাপ্ত কয়েদী-দেরই পরিশ্রমের কাজ করার নিয়ম।) সকালবেলা হয়তো এলো কিছু সরকারী পোশাক ওপাশের পুরুষ বিভাগ থেকে, তাতে বোতামের ঘর তুলতে হবে। হলো তোলা। তারপর ওয়ার্ড সাফাইয়ের কাজ। ঝাড়পোঁছ করতে হবে। হলো ঝাড়পোঁছ। তারপর হয় ফুলবাগান পরিচর্যা, নয়তো রান্না নয়তো শুধু বসে বসে গল্প। এই রান্নার নিয়মটা হাজারিবাগ জেলে অদ্ভুত। ডাল আর তরকারিটা সরকারী রান্নাঘর থেকে দেওয়া হবে, শুধু ভাত আর রুটির বদলে পাবে চাল আর আটা। নাও যে যার রান্না করো। কয়লা পাবে না, কেরোসিন পাবে না, বাসন পাবে না, করো রান্না! কয়লা পেতে হলে একদিনের খাবার জলাঞ্জলি দিতে হবে। মানে ত্যাগ আর কি। কিন্তু বাসন কোনক্রমেই পাওয়া যাবে না। ভাত বা রুটি রাঁধতে হবে সেই অ্যালুমিনিয়ামের থালিতে।

হাতে এখন আমাদের অজস্র সময়। সুযোগও। মানা করার কেউ নেই। ঘোরাফেরার ফাঁকে ফাঁকে সময় পেলেই সহবন্দিনীদের সঙ্গে বসে বসে গল্প করা। করতো আসলে কল্পনা, আমি শুনতাম। জানিনা যে ওদের ভাষা। কল্পনা অনুবাদ করে দিতো। খুব লজ্জা হতো। ঈস্ কবে যে শিখবো হিন্দীটা!

সন্ধ্যের দিকে মাঝে মাঝে বসতো নাচগানের আসর। অল্প বয়েসী মেয়েরা সার বেঁধে জুড়তো গ্রাম্য গান, সেই সঙ্গে নাচ। সব লোক-নৃত্য। আমরাও কয়েকটা নাচ শিখে নিয়েছিলাম। ঘুরে ঘুরে একই ঢঙে নাচতো ওরা বারবার, সঙ্গে একই সুরে পুনরাবৃত্তি। শুনতে শুনিতে আনমনেই হয়তো কখন তাল মিলিয়েছি জানিনা, ওরা কিন্তু ঠিকই খেয়াল রাখতো। তালে তালে নাচতে নাচতে হঠাৎই টেনে নিতো আমাকে দলে। তারপর সে যা লম্ফ

ঝম্পের চোট! কখন নিজেও যেন মিশে যেতাম। যারা বসে বসে দেখতো, খুব বাহবা দিতো।

এ গেলো একটা দিক, জীবনের আরেকটা দিকও আছে।

শীত পড়েছে জাঁকিয়ে, অথচ শীতের পোশাক তেমন নেই। না একটা অতিরিক্ত কম্বল, না জামা কাপড়। সে যা শীত! পরনের জুতোজোড়া অব্দি ওরা ফেরত দেয় নি। সেই নিয়ে নিয়েছে গ্রেপ্তার হবার সময়। রোজকার হাঁটা, ব্যায়াম সব বন্ধ। হাঁটবো কি করে? কন্‌কনে ঠাণ্ডা মাটিতে কি পা ছোঁয়ানো যায়। পা ইতিমধ্যেই বেশ ফেটেছে, ফাটা জায়গা দিয়ে রক্তও ঝরে। অন্যান্য বন্দিনীদেরও তথৈবচ। আমাদের তবু জুতো পরা অভ্যেস। ওরা জীবনে হয়তো কোনদিন একবার পা গলিয়েও দেখেনি। খালি পায়ে হাঁটাচলায় অভ্যস্ত। ফেটেফুটে ওদেরও পায়ের বিশ্রী অবস্থা। বাচ্চাগুলো তো যন্ত্রণায় কেঁদে ককিয়ে অস্থির। কি করি! একটা তো উপায় বের করতেই হয়।

বেরোলো। একদিন এক জমাদারনীকে বললাম একটা কাঁচি ধার দিতে। চুল কাটবো। মেয়েটা ওরই মধ্যে একটু কোমল হৃদয়ের। দিলো। ওর সামনেই কচকচ করে কেটে ফেললাম কম্বলের একটা ধার। ওর তো চোখ ছানাবড়া! বললাম, চুপচাপ থাকো, তুমি চুপ থাকলে কর্তাদের কেউ জানতেও পারবে না। তারপর সেই কম্বলের টুকরোটা মুড়ে, মাঝখানে খবরের কাগজ আর পিচবোর্ড পুরু করে দিয়ে তার সঙ্গে দড়ির বাঁধন লাগিয়ে তৈরী হলো জুতো। দড়ি করলাম হাসপাতাল থেকে চেয়ে চিন্তে আনা ব্যাণ্ডেজ বাঁধার কাপড় দিয়ে। প্রয়োজন তো মিটলো। টহলদারীর কাজও ফের শুরু করলাম। জুতোর জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আর্জি জানাবার কিন্তু বিরাম নেই। ওদের সেই এক গৎ—আমরা যেহেতু রাজবন্দী নই, আমাদের জুতো দেওয়া চলবে না। এদিকে হাজারিবাগে শীত যখন জাঁকিয়ে পড়ে তাপমাত্রা প্রায় শূন্য ডিগ্রীর কাছাকছি পৌঁছে যায়।

রাজবন্দী বস্তুটি কি, এ সম্বন্ধে সঠিক কিছু ধারণা করার সুযোগ হলো নভেম্বর নাগাদ। ৭০ সাল। সেদিন পর্যন্ত কল্পনা আর আমি কিন্তু আলাদা আলাদা ঘরেই থাকি। যদিও বাইরে মেলামেশা করার আমাদের অবাধ সুযোগ। হঠাৎ রাত্রে হুকুম এলো, আমাকে আমার ঘর খালি করে দিতে হবে, আমি যেন কল্পনার ঘরে গিয়ে থাকি। অবাক হলাম, সেই সঙ্গে খুশীও। সঙ্গ বা সঙ্গী কে না চায়। বিশেষ করে সে যখন হয় মনের মতো। কিন্তু ব্যাপারটা কি? হঠাৎ এই দয়া! রাতারাতি কি 'বদলে গেল মতটা।' শুভ বুদ্ধির উদয় হলো

যে বড়! কল্পনার ঘরের দাওয়ায় বসে অন্ধকারেই দেখি, সার সার পুরুষ বন্দী আসছে। কারও কাঁধে চেয়ার, কারো মাথায় টেবিল, কেউবা চৌকি নিয়ে, কেউ বালিশ লেপ তোষক কম্বল নিয়ে, কেউ রান্নার হাতা খুন্তি হাঁড়ি কড়াই সমেত—যেন একটা মিছিল। অন্ধকারে আরো কত কি আমাদের সামনে দিয়ে লোকের পিঠে কাঁধে চলে গেল ঘরে, আমরা চিনতেও পারলাম না। বেশ এক ⌐স্থ ঝাড়পোঁছ হলো। শেষে আরো অনেক রাতে এসে হাজির ঘরের মালিক। অর্থাৎ বন্দিনী—আমাদের নতুন অতিথিনী।

যথারীতি পরদিন ভোর সকালে বড় জমাদারের আগমন। ভারী বুটের মচমচ আওয়াজ। গোণা পর্ব শেষ হলো। সে চলেও গেলো। নয়া-অতিথির তখনও ঘুম ভাঙেনি। বাচ্চাদের মতো গুটি গুটি পায়ে আমরা গিয়ে উঁকি মারলাম। প্রথমে চোখে পড়লো একটা মশারী, তার ভেতরে দামী নীল শাড়ীর আভাস। কৌতুহল বাড়লো। জানতে হচ্ছে মহাশয়াটি কে। খানিক পরে এসে দেখি ঘুম থেকে উঠেছেন। আলাপ হলো। ইনি কেন্দ্লা কোলিয়ারীর খনি শ্রমিক ইউনিয়নের সেক্রেটারী। ধরা পড়েছেন খনির ম্যানেজার সম্প্রতি খুন হয়েছে, সেই সূত্রে। হাজারিবাগ থেকে কোলিয়ারী মাইল কুড়ি দূরে। যেহেতু এটা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, তাই তিনিও রাজবন্দী।

শুনে তো আমি থ। এমন পয়সাঅলা ঘরের মেয়ে, সাজপোশাকের এমন বাহারী চটক—সে কিনা ছেঁড়া নোংরা পোশাক পরা কঙ্কালসার একদল শ্রমিকের নেত্রী, জীবনটাকে যারা হাতের মুঠোয় করে মাটির নীচে নোংরা স্যাঁৎসেঁতে পরিবেশে ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে মাটি খুঁড়ে তুলে আনে কালো হীরে! মেরুর দুটো দিক বলে মনে হচ্ছে না কি? মুখে তো কত কি-ই বললো, শ্রমিকের প্রতি দয়ায় যেন তার প্রাণ মন উথলে উঠছে। আমি মেলাতে পরলাম না। হাজার চেষ্টা করেও না।

আর জেলকর্তাদেরও বলিহারি। যেন সে এমনই এক আজব জীব, আমাদের থেকে সব কিছুতে ভীষণ ভীষণ রকমের আলাদা। বন্দী সে-ও, তবে তার ঘরে তালা নেই। সারা দিনমান সে জেলখানার চৌহদ্দির মধ্যেই কাটায়, তবে আমাদের কারুর সঙ্গে না। যত খাতির তার বড় কর্তাদের সঙ্গে। অফিস ঘরে ঠায় বসে সারাদিনে কত না তার সামাজিক দায়দায়িত্ব, সব পালন করে। ফেরে রাত নটা দশটা নাগাদ। ভোরবেলা উঠেই তার প্রথম কাজ, দরকারী নানাবিধ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের একটা ফিরিস্তি তৈরী করে ফেলা। এগুলো তার চাই। পায়ও। বাজার থেকে কিনে প্রতিটি জিনিস

ফিরিস্তি মিলিয়ে তাকে দুপুরের আগেই পৌঁছে দেওয়া হয়। খাওয়া দাওয়াও আলাদা। খাদ্য তালিকায় নানান দেশী বিদেশী রান্নার মিশেল। দর্জিকে দিয়ে মাঝে মধ্যেই বাইরে থেকে দামী দামী জামা বানিয়ে আনে। আর চটি! বলামাত্র বাইরে থেকে পুরো দোকানটাই হয়তো উঠে আসে জেলখানায়, তার থেকে বাছাই করে সে নিজের জোড়া নিয়ে নেয়। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, এ সবই নাকি তার প্রাপ্য। কোনটাই হিসেবের বাইরে নয়। রাজবন্দীদের নাকি এমনই মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে।

কয়েকটি দাসীও সে জুটিয়ে নিয়েছিল। সকলেই আমাদের সহবন্দিনী। কত যে তার চাহিদা! পূরণ করতে করতে সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি তাদের তো প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি। একান্ত নিজস্ব কাজও সে অক্লেশে তাদের দিয়ে করাতো। একদিন একজনকে দেখি তার মাসিকের ন্যাকড়া ধুচ্ছে। ছি ছি! বিনে মাইনের কাজ। কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটাকে এইভাবে সাজাতো—যেন তারা স্বেচ্ছায় উপযাচক হয়ে বিশিষ্ট রাজবন্দিনীর সাহায্যার্থে এগিয়ে গেছে। আপত্তি করার জো নেই। ন্যায্যত করা যায়। কেননা বিনা বিচারের বন্দীদের দিয়ে কোন কাজ করাবার নিয়ম নেই। এবং জেলে এদের সংখ্যাই বেশি। সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীর সংখ্যা শতকরা মাত্র দশ ভাগ। এতো বড় একটা জেলের এতো শত কাজ কি আর ঐ সামান্য মানুষ দিয়ে চলে। তাই বিনা-বিচারের বন্দীদেরও খাটানো হতো। অবিশ্যি এই বে-আইন বেশিদিন চলে নি। বন্দীদের একরোখা মনোভাবের কাছে কর্তৃপক্ষ নতিস্বীকার করে। মাইনে চালু হয়। তবে অর্থ দিয়ে নয়, অতিরিক্ত খাদ্য সামগ্রী দিয়ে।

দিন পনেরোর মধ্যে রাজবন্দীর ঘর তো ঘর নয়, যেন একটা দোকান। কত কাপড়, কত খাবার, কত এটা ওটা ঘরোয়া জিনিস! সব সরকারের দেওয়া। খুব খেতো মেয়েটা। দুধ, মাংস, ডিম, মুরগী একটা না একটা তো রোজই, কোনদিন একাধিকও। ভারতের ব্যাপক মানুষের কপালে এর একটিও জোটে না, জেলের ভেতর তো এসবের কথা কল্পনাও করা যায় না। যাই হোক, তিন হপ্তা পর তার জামিনে খালাসের হুকুম এলো। যাবার সময় প্রতিটি জিনিস গুছিয়ে নিয়ে গেলো সঙ্গে করে। কয়েকটা আলু শুধু নেয় নি, দিয়ে গেলো এক জমাদারনীকে। যখন যায় সে, সে এক দেখবার মত দৃশ্য। বন্দিনীর দল লাইন বেঁধে চলেছে তার পেছন পেছন, প্রত্যেকের হাতে একটা না একটা সামগ্রী, চলেছে তাকে ফটক অব্দি এগিয়ে দিতে, পুরোভাগে তার বিজয়ীর মতো দৃপ্ত পদক্ষেপ, যেন বিরাট এক জয়ের পর লুণ্ঠিত দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে সে স্বরাজ্যে ফিরে যাচ্ছে।

ভাবি বসে বসে তার কথা। ধনী পরিবারের মেয়ে, রাজনীতি করে নাম যশ করার উচ্চাকাঙ্খা। ট্রেড ইউনিয়ন তার ক্ষমতালাভের সোপান। আকাঙ্খা পূর্ণ হয়েছে। অনেকদিন পর কাগজে দেখেছি, সে বিহার বিধান সভার সদস্যা নির্বাচিত হয়েছে। সে আর তখন সোসালিষ্ট পার্টির কেউ নয়, সে কংগ্রেস। সেই মুহূর্তে অবস্থান বদলানোটাই জরুরী ছিল। ফলে আর কিছু হোক না হোক, আমার ধারণা, সেই খুনের অভিযোগটা ধামা চাপা পড়ে গেছে।

একটি উপকার সে আমাদের করেছিল, আমি কখনো ভুলবো না। মতের দিক থেকে যতই গরমিল হোক, বিনা বিচারে এতোদিন জেলে আটক রাখার ব্যাপারটা সে ন্যায় বলে মানতে পারে নি। ভাবলাম, দেখিই না, অন্যায়ের বিরুদ্ধে কতটা ন্যায় তাকে দিয়ে করানো যায়। গেলাম একদিন। কাগজ কলম চাইলাম। কাগজ কলম যে সুপার দেয় না, এটা অন্যায়। আপনি ন্যায় করুন! দেখলাম ভীষণ খুতখুতুনি। সুপার যখন দেবে না, তখন নিয়ম লঙ্ঘন করে তার দেওয়াটা কতখানি ন্যায্য এইসব নিয়ে রীতিমতো ভাবতে বসে গেলো। ভাবুক বসে, আমরা বিদায় নিলাম। রইলাম তক্কে তক্কে। একদিন গিয়েছে অফিস-ঘরে, তালা টালা তো খোলা, বেমালুম হাতালাম ওর একটা পেন্সিল আর কাগজ। ব্যস্ আমাদের ন্যায় কাজ শেষ। ভাগ্যিস তুমি অন্যায় মনে করেছিলে, নইলে এই উপকারটুকু তো পেতাম না।

পরেও কয়েকজন রাজবন্দী দেখেছি, সবারই ধরন ধারন একই রকমের। বিস্তর সুযোগ তাদের দেওয়া হয়, খানিকটা শ্রদ্ধাও। জেলের সব কর্মচারীই তাদের সম্ভ্রমের চোখে দেখে। কে জানে বলা তো যায় না ভারতের যে ধরনের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি এই মান্যবর রাজবন্দীটি হয়তো কালে দিনে কোন একটা কেউকেটা হয়ে বসতে পারে, শ্রদ্ধা না দেখালে তখন বিপদ। কজন জমাদার তো আমাদের অব্দি বললো, আমরা সরকার বানালে ওরা আমাদের দাসানুদাস হয়ে থাকবে।

ক্ষমতা ফলাবার লোভ না থাকলে কেউ জেলখানার কাজে আসে না। এরকম একটা কথা প্রচলিত আছে। কিন্তু ভারতের ছবিটা আলাদা। কাজের সুযোগ এখানে কম। জেলখানায় কাজ করতে আসাটাও নিছকই একটা চাকরী। উদ্দেশ্য অর্থ রোজগার। বেশির ভাগ কর্মচারী এখানে এসেছে এই একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে। হয়েছে নির্মম। ভেতরের পশু সত্তা ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে। এটা হয়তো চাকরীরই একটা শর্ত। ওপর ওলার হুকুম মানতে হবে, সে যত নির্দয় নিষ্করুণই হোক না কেন।

তবে সবাই যে এই বাধ্যবাধকতার শিকার এমন নয়। কিছু কর্মচারীকে দেখেছি, তারা স্বেচ্ছানির্দয়। অন্যকে অত্যাচার করেই তারা সন্তুষ্ট। বাকীরা ছাপোষা মানুষ। দয়া মায়া সহানুভূতি সবই আছে। আমাদের প্রতি মমত্ববোধ তাদের কিছু কম ছিল না। কাজের ফাঁকে ফাঁকে আসতো বসতো গল্প গুজব করতো নানান খবরাখবর দিতো। ওদের মধ্যে একজনের কি জানি কেন হয়তো ভাল লেগে গিয়েছিল আমাকে, অমলেন্দুর খবর এনে আমাকে দিত। পথ চেয়ে বসে থাকতাম কবে তার ডিউটি পড়ে। দূর তো এমন কিছু নয়, হয় তো আমারই ঘরের দু একটা ঘর পরে অমলেন্দু থাকে। কিন্তু খবরের প্রশ্নে তো সেই যোজন তিনেক দূর! পথ চেয়ে তাই তো প্রতীক্ষা।

একদিন এই জমাদারটি বললো, অমলেন্দুর মা নাকি এর মধ্যে একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে ফিরে গেছেন। অনুমতি মেলে নি। সঙ্গে নাকি আমার জন্যে কিছু জামাকাপড় এনেছিলেন, সেগুলোও নাকি আমাকে দিতে দেওয়া হয়নি।

এইসব ঘটন অঘটন মিলিয়েই একেকটি দিন। দিনের যোগফল মাস। মাস পেঁাছে যায় বছরের সীমান্তে। মুক্তির কোন সম্ভাবনা নেই। সব হিসেব ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে। গুজব রটলো, দুর্গাপূজোর পরেই নাকি অক্টোবরে আমাদের বিচার শুরু হবে। হলো না। দেখতে দেখতে সব পূজোই চলে গেল। এদিকে অসুবিধে দিনকে দিন বাড়ছে। বাড়িতে লিখবো একটা চিঠি, পাঁচ দিন সাধ্য-সাধনার পর চিঠি লেখার ফর্ম পাওয়া গেল। জমাদারকে রোজ মনে করিয়ে দিতে হতো রোজকার রেশনের কথা, একদিন ভুলে গেলেই বিপদ। সেদিন আর খাওয়া জুটবে না। খবর কাগজে কালো কালির দাগ ক্রমশঃ বাড়ছে, লেখার কাগজ কলমের দাবী দাবীই রয়ে গেল। এদিকে সেই জুতো জোড়া ছিঁড়ে গেছে, খালি পায়ে মাটিতে হাঁটতে পারি না। ইট পাথরের খেঁাচায় কত জায়গা ছড়ে গেল। হিমঠাণ্ডা পাথরের মেঝেতে শুয়ে গা হাত পায়ে শুধু ব্যথাই হয়, ঘুম আর আসে না। এদিকে দিনের বেলা ঘরে যে দুদণ্ড বসে কাটাবো, তার উপায় নেই। একটুও রোদ পড়ে না ঘরে, ফলে কনকনে শীত। বাইরে বেরুলে হাওয়া আর ধুলো। গায়ের চামড়া তো কুচকে কুমীরের চামড়ার মতো থলথলে হয়ে গেছে। তবুও বলবো, আর মতো বন্দিনী, তাদের তুলনায় আমরা অনেক ভাগ্যবান। কল্পনার মা আমাদের দুজনের জন্যেই জামাকাপড় দিয়ে গেছেন। ওদের তো একটার বেশি দুটো কাপড় নেই। সর্বাঙ্গ ঢেকে বসে থাকলেও কি আর ঐ একখানা কাপড়ে শীত

মানে। কম্বল তো দুখানাই ছেঁড়া। একখানা মেঝেতে পাতে, একখানা গায়ে দেয়। রাতের ঠাণ্ডার দমক দিনের তুলনায় দশগুণ। কি হয় ঐ দুখানা কম্বলে! তার ওপর সেই মুগুর ডাল আর তরকারীর ঘ্যাঁট। কে জানে বাপু এখনও ওরা কেমন করে খায়। আমাদের তো দুদিনেই খিধেটিধে উবে গিয়েছিল।

ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে ঠিক করলাম আমরা অনশন করবো। দীর্ঘ অনশন। আমাদের নিজস্ব দাবী দাওয়া আছে, আছে অন্যান্য বন্দীদেরও দাবী দাওয়ার প্রশ্ন। জেলার বললো, অনশনে কোন লাভ নেই। নেই তো নেই, তবু করবো! আমাদের মনের দৃঢ়তা দেখে হুকুম দিল আলাদা আলাদা ঘরে তালা বন্ধ করে রাখতে। রাখলো। শুরু করলাম অনশন। পাঁচ দিন পাঁচ রাত একটানা। এ কদিনে এলো শুধু ডাক্তার, বড় জমাদার আর জমাদারনীর দল। ছ দিনের দিন সকালে এক মূর্তিমান কেরাণী এসে হাজির দুজোড়া চটি হাতে। কল্পনার জন্যে একজোড়া বেগুনে রঙের প্লাষ্টিকের, আমার জন্যে রবারের। দেখে তো কল্পনা রেগে আগুন। আমি বললাম, হৈ চৈ করে লাভ নেই, নিদেন পক্ষে একটা দাবী যখন মিটেছে, বাকী গুলোও নিশ্চয় ধীরে ধীরে মিটবে। সেদিনই খানিক পরে ঘোষণা শুনলাম, সব বন্দীর জন্যে এক প্রস্থ বাড়তি পোশাকের ব্যবস্থা হবে এবং খাওয়া দাওয়ার মানও উন্নত হবে। কিন্তু কাগজে কাটাকুটি থাকবে। ও ব্যাপারে কিছু করা যাবে না। বিচারের ব্যাপারটাও তাই। ওটা জেল কর্তৃপক্ষের এক্তিয়ারের বাইরে, তাদের হাত পা বাঁধা। তবে আমরা যেহেতু ধলভূম থেকে গ্রেপ্তার হয়েছি, আমরা যেন সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে লিখিত আবেদন করি। যা করার সেখানেই নিষ্পত্তি হবে।

সুতরাং অনশন শেষ। এর বেশি কিছু পাওয়াও যাবে না। লিখিত আবেদনে যে কোন কাজ হয় না, এটা সবাই বোঝে। আবেদন পেলেই ওরা ধরে নেয় সাজা কমাবার আর্জি বা বন্দীর কোন অনুযোগ। ছেঁড়া কাগজের মতোই তা মূল্য পায়। অবিশ্যি একটা লাভ হলো। হপ্তায় একটা করে আবেদন পেশ করবো, অতএব কলম চাই, কাগজ চাই। দিতো। আমরা ঘন্টাখানেকের জন্য কলমটা তো আটকে রাখতে পারতাম। ফেরৎ দেবার আগে কালিটুকু ঢেলে রাখতাম ওষুধের শিশিতে, তাই দিয়ে রাত্তিরে বসে বসে লিখতাম। কত কি লেখার! গল্প, কবিতা, আমার অভিজ্ঞতা, আরো কত কি। যে কাগজে মুড়ে চা আসতো, সেটাই লেখার কাগজ। বা লাইব্রেরী থেকে আনা বইয়ের মলাটের পরের পাতাছুটো, বা রেশনের ফিরিস্তি

পেশ করার নোট বইয়ের পাতা। কলম করেছিলাম ঝাঁটার কাঠি দিয়ে। দিব্যি লেখা যেতো।

অনশনের শাস্তি হিসেবে একমাস যাবৎ খবরের কাগজ আসা বন্ধ হলো। কিন্তু শাড়ি সবাইকে দেওয়া হলো একখানা করে। অবশ্যই মোটা কাপড়ের, জেলখানায় বন্দীদের হাতে তৈরী। ব্লাউজ আর শায়ার জন্য দিলো মাপ মতো কাপড়। কিভাবে বানাবে সেটা নিজেদের দায়িত্ব। দেখো দিকি, কাঁচি নেই স্থঁচ নেই কাটবে কি দিয়ে, সেলাই করবে কিভাবে! শেষে শুনলাম ব্যবস্থা নাকি একটা হয়েছে। এক জমাদারনীর মেশিন আছে। তাতেই সবাই সেলাই করে নিয়েছে যার যার পোশাক। জমাদারনী অবিশ্যি এমনিতে ছাড়েনি, সকলের প্রাপ্য চালের একটা অংশ তাকে ছেড়ে দিতে হয়েছে। তাই নিয়ে তবে সে দিয়েছে মেশিন ব্যবহার করতে।

কদিন পরেই পঁচিশে ডিসেম্বর, যীশুর জন্মদিন। টহলে বেরিয়ে বড় জমাদার হঠাৎই এক সাংঘাতিক আবিষ্কার করে বসলো—কল্পনার তালাটা ভীষণ পলকা হয়ে গেছে, অবিলম্বে ওটা পালটানো দরকার। কিন্তু যতদিন না বদলি তালা আসছে, উপায়! থাকতে দেবার যে আর জায়গা নেই! ফলে আবার সেই পুরনো নিয়ম। দুজনের এক ঘরে রাত কাটাবার আদেশ। সুপার বললো, দুজনকে একসঙ্গে রাখার বিপদ আছে, আরেকজন বন্দিনী যেন ওদের সঙ্গে ঘুমোয়। এক এক রাত্রে এক এক জন। একই লোক থাকলে যদি আমরা হাত করে নিই, যদি মগজ ধোলাই করি! আমরা তো হাতে স্বর্গ পেলাম। রোজ এক একজনের দেখা হবে, তার মানেই তার ইতিহাস আমরা জানতে পারবো—তার অতীত জীবন, তার অপরাধ সব। জানলামও। বেশির ভাগই নিম্ন বর্ণের। ভারতীয় ভাষায় এদের বলে পশ্চাদবর্তী শ্রেণী। উপজাতীয় বন্দীর সংখ্যাও কম নয়। ছোট-নাগপুর বলতে গেলে এই উপজাতীয়দেরই মাতৃভূমি। নানান গোষ্ঠীতে তারা বিভক্ত। তাদের ভাষা আলাদা, ধর্ম আলাদা, সংস্কৃতিও আলাদা। নিম্নবর্ণের মানুষদের মহাত্মা গান্ধী বলেছেন হরিজন, অর্থাৎ কৃষ্ণের সন্তান। তার আগে গোড়া হিন্দু ধর্মানুযায়ী এদের বলা হতো অস্পৃশ্য।

এদের অনেকেই ধরা পড়েছে বিনা লাইসেন্সে চোলাই মদ তৈরী করার অপরাধে। কেউ বা জমি নিয়ে গোলমালের জের হিসাবে। আবার কারুর বিরুদ্ধে অভিযোগ হত্যা বা হত্যার প্রচেষ্টা। দু একজন ছাড়া কেউ বাড়ি থেকে চিঠিও পায় না বা আত্মীয় স্বজনও আসে না দেখা করতে। এতোখানি

পথ আসবে, তার তো একটা গাড়ি ভাড়া আছে। কোথায় পাবে সে ভাড়ার টাকা! চিঠি লেখাতে গেলেও লিখিয়েকে পয়সা দিতে হয়। তাই বা কোথায়। বড় গরীব যে এরা। শুনতে শুনতে কী যে খারাপ লাগতো! ভাবতাম নাঃ, জেলে যতদিন আছি সবটুকু সময় এদের কাজে লাগাবো, আপন করতে হবে এদের, এদের পাশে দাঁড়াতে হবে। তবে না জেল জীবন আমাদের সার্থক। তবে না সত্যিকারের তৃপ্তি।

সকালে পায়চারি করার সময় দেখতাম চাল আর তেল মেপে কয়েদীদের দেওয়া হচ্ছে। চাল নিতাম অ্যালুমিনিয়াম মগে আর তেল একটা লম্বাটে ছোট সিগারেটের টিনে। এ ব্যাপারে একটা গোপন কথা রাতের সাথীদের একজন ফাঁস করে দিয়েছিল। কয়েদীরা নাকি প্রাপ্য রেশনের একটা অংশ জেল কর্মচারীদের কাছে বিক্রি করে দেয়, বিনিময়ে হয় পয়সা পায় নয় তো সমমূল্যের বাজার থেকে কেনা প্রয়োজনীয় কোন জিনিস। কেনা বেচা চলে জলের দরে, বাজারে যা দাম তার অনেক অনেক কম দামে। একরকম বাধ্য হয়েই করতে হয় এ কাজ। কেননা টুকিটাকি নানা দরকারী জিনিসেরও দরকার হয়, যা জেলখানায় দেওয়ার নিয়ম নেই। ফলে সবাই কম কম খায়, বাকী চাল বা আটা বা সাবান সরিয়ে রাখে বিক্রীর জন্য।

মন্দ কি! আমরাও তো এরকম করতে পারি। কত জিনিসের দরকার— দাঁতমাজা, চুলবাঁধার ফিতে—কল্পনার যে একমাথা ঘন চুল, সেফটিপিন, আরও কত কি! ফলে শুরু হলো। এক জমাদারনীকে বললাম। সে তো প্রথমাবস্থায় কিছুতেই রাজী হয় না। মনে সন্দেহ, এটা আমাদের কোন চাল কিনা, শেষে লোভে পড়ে যদি ওদের আখের নষ্ট হয়! বুঝিয়ে সুঝিয়ে যাহোক করে রাজী করানো গেলো। কটা টাকা জমলো। এক টিন নেসকাফে আনালাম। বলতে গেলে রীতিমতো বিলাসই বটে। কদিন পরেই খ্রীস্টমাস্। গুড় আর আটাও খানিকটা আনালাম। তৈরী হলো মিঠাই। সবাইকে বিলি করা হলো। সে এক সত্যিকারের উত্তেজনাই বটে। ২৫শে ডিসেম্বর সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি এক অভাবনীয় কাণ্ড। কে যেন আমাদের দোরগোড়ায় রেখে গেছে বড়সড় একটুকরো কেক আর এক ডজন কলা। দুপুরেও আরেক কাণ্ড। আমাদের এক সহকর্মী কায়দা করে ছুটির দিনের মাংসের রেশনের সঙ্গে দিয়ে দিল দুটুকরো মেটে। সব মিলিয়ে সত্যিকারের এক উৎসব। আরো একটা ব্যাপার পরিষ্কার হলো—জেনানা মহলের বাইরেও আমাদের পরিচিতি আছে, সহকর্মীরও অভাব নেই।

গ্রীষ্মমাসের পর শীত এলো জাঁকিয়ে। কষ্টের যেন একশেষ, বিশেষ করে রাত্তিরে। যার যতটুকু জামা কাপড় সব পরে গুটিসুটি মেরে জড়াজড়ি করে কম্বলের নীচে ঢুকেও যেন শীত আর যেতে চায় না। এক হরিজন মেথর আসতো পায়খানা সাফাই করতে। সে দিনও এসেছে, দেখি কী প্রচণ্ড কাঁপুনি। ঠকঠক ঠকঠক করে কাঁপছে তো কাঁপছেই। যেন বিরাম নেই, শেষ নেই। আহা রে বেচারী! পরনে একটা মাত্র ছেঁড়া গেঞ্জী আর একটা হাফপ্যান্ট। শীত কি যায়! জমাদারনীর অনুমতি নিয়ে কল্পনা দিলো ওকে একটা শাল। দুটো শাল তো আমাদের। তা শাল গায়ে দিয়ে সে তো ফিরে যাচ্ছে পুরুষ মহলে। পেছন পেছন মেটিনীও ছুট। বলে কিনা, ও নাকি শালের আড়ালে আমাদের চিঠি চোরাই করে নিয়ে যাচ্ছে, ওকে তল্লাসী করা হোক, হলো। কিছুই পাওয়া গেল না। রাগে জ্বলতে লাগলো মেটিনী। প্রথমতঃ ওর মনে সন্দেহ, কেন উপযাচক হয়ে আমরা ওকে শালটা দিলাম। দ্বিতীয়তঃ হিংসে।—ওকে দিলাম না, দিলাম মেথরকে! অত দামী অত ভাল একটা শাল! ওর না কতদিনের শখ এরকম একটা শালের! স্বভাবতই ব্যাপারটা ওখানে মেটার নয়। মেথরকে শাস্তি পেতে হলো। সারাদিনের জন্য নির্জন নির্বাসন। জেনানা মহলে আসাও তার বন্ধ। বড় জমাদারের কাছে প্রতিবাদ জানালাম। বললাম ওর ওপর থেকে শাস্তি তুলে নিতে। কে শোনে কার কথা। বিশেষ করে আমাদের কথা। আমরা যে নকশাল। এরকম নির্দেশই আছে, কারুর সঙ্গে মেলামেশা আমাদের বন্ধ। তা সে মেথরই হোক কি অন্য কেউ।

কদিন পর সুপার এসে হাজির। বললেন, বিহার সরকার নাকি অমলেন্দুর পরিবারের লোকজনের সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাতের অনুমতি দিয়েছে। তার মানে বিয়েটাকেও ওরা ঘুরিয়ে মেনে নিচ্ছে। ফেব্রুয়ারীর গোড়ার দিকে আসবেন অমলেন্দুর বাবা। এরই দিন কতক পর অমলেন্দু গোপনে আমাকে একটা চিঠি পাঠালো। পড়বি তো পড়, সেই মেটিনীর হাতে। খবর পৌঁছলো পুরুষ মহলে। শাস্তি হিসেবে অমলেন্দুকে ডাণ্ডাবেরী পরতে হলো। আর শুধু কি তাই! নির্দেশ হলো, আমাদের দুজনেরই বাইরের সাক্ষাৎকার পরবর্তী হুকুম না হওয়া পর্যন্ত বন্ধ। কী কান্না যে কেঁদেছিলাম সেদিন! ডাণ্ডাবেরী পরে রয়েছে মানুষটা, সামান্য একটু ভুলের জন্য। কী যে কষ্ট ডাণ্ডাবেরীর! হাতের কনুই আর পায়ের হাঁটু মিলিয়ে একটা লোহার বেড়ি। বেড়ির সঙ্গে একটা করে বিশ ইঞ্চি মাপের লোহার ডাণ্ডা, সেটা আবার কোমরের আরেকটা ডাণ্ডার সঙ্গে আটক। কোমরেও আবার ওরকম একটা বেড়ি। সেটা

শিকলি দিয়ে দেয়ালের সঙ্গে বাঁধা। ভীষণ ভারী সেই এক একটা বেড়ি। একে ওজনের ভার, তার ওপর নড়াচড়া বন্ধ। কাঁহাতক মানুষ পারে ঐভাবে ঘুমোতে বসতে শুতে পেচ্ছাপ পায়খানা করতে!

ভুল আমাদেরই। নিয়ম নিষেধে সামান্য ছাড় পেয়ে আমরা ভেবেছিলাম, সাজা বুঝি কমে গেল, বুঝি দিন এইভাবেই কাটবে। তা কি হয়! বিপদের ঘেরাটোপে বসে বিপদ কি কাটে!

রবিবারে উপোস দেওয়া এখানে একটা নিয়মের মতো। জরুরীও বটে। উপোস দেবে, এটা আগে জানিয়ে দিতে হয়। অনুমতি পেতে বিলম্ব হয় না। বিনিময়ে পায় কিছু বিলাস দ্রব্য। যথা বিড়ি খৈনী কখনো বা ভাঁড়ারে টান না পড়লে খানিকটা চিনি। ওপর ওপর দেখে মনে হয়, দানের পেছনে দয়ার যেন অন্ত নেই, যেন কয়েদীদের প্রতি সেবার পরাকাষ্ঠা দেখানো হচ্ছে। আসলে কিন্তু উলটো। এই সামান্য ছুটছাট দু একটা জিনিসের বিনিময়ে কর্তৃপক্ষ চায় সবার মুখ বন্ধ করে রাখতে, এবং অনুগতও। কেননা নেশা বলে কথা! নেশা মানেই তো সুযোগ। সুযোগ যদি পেতে চাও, অতএব হে কয়েদীগণ, তোমরা মুখে কুলুপ এঁটে থাকো, কোনো প্রতিবাদ করো না, বিরুদ্ধাচরণ করো না। করলেই কিন্তু সুযোগ কেড়ে নেওয়া হবে। তখন আর মাথা খুঁড়লেও গতি নেই। এদিকে ভাঁড়ারের যারা তত্বাবধানে, তাদের কাছে উপোস মানেই পোয়াবারো। লাভের একটা মস্ত সুযোগ। উপোস মানেই সেদিনের রেশন বাদ। রেশনের মোট যা দাম, তার চেয়ে যথেষ্ট কমদামী ঐ বিড়ি ঐ খৈনী। দুটো দামের তফাৎটুকুই তাদের লাভ। মেয়েরা এই ঠকবাজীর ব্যাপারটা ভালো করে বোঝে, তবু মুখ খোলে না। যথারীতি দল বেঁধে উপোস দেয়। বিড়ি খৈনী তো তারা খায় না, তাদের দরকার টাকা। জেলখানায় রোজগারের এটা একটা প্রধান উপায়। রোজগার না করলেও চলে না, কেননা কখনো হয়তো একটা ওষুধ দরকার, নয়তো একটু সাজগোজের জিনিস, কিংবা একটা ব্লাউজ, বা কটা কাঁচের চুড়ি, নিদেনপক্ষে মুখ বদলাবার মতো একটু তরি তরকারী—পয়সা ছাড়া কোত্থেকে এসব জুটবে। তাই রোববার পড়লেই উপোসের ধুম। তাই বলে সত্যি সত্যি অবিশ্যি না খেয়ে থাকে না। ঐ দিনটির জন্ত রোজকার রেশন থেকে আগে থেকেই এক আধ মুঠো সরিয়ে রাখে। ভোর না হতেই সবাই ছোটে বাগানের দিকে, খুঁজে পেতে দু একটা কি যেন পাতা টাতা জুটিয়ে আনে। তারপর সেই পাতা চাল আটা আর নুন মিশিয়ে চাপিয়ে দেয় উনুনে। সব মিলে মিশে হয় লপ সি। ছোট বড় সবাই চেটেপুটে খায়। সেদিনের বরাদ্দ

তরি তরকারী সব যায় মেটিনী আর জমাদারনীদের ঘরে। দুটো একটা আলু কি মুলো কি সরষে শাক ওরা তার থেকে কয়েদীদের দয়া করে দেয়। সেগুলোও চালান হয় লপ্সীতে। কিন্তু আসল সমস্যা দাঁড়ায় রান্না করা নিয়ে। কোথায় করবে রান্না? সব যে উপোস। দুটি মাত্র উনুন জ্বলছে দুদিকে, একটা আমাদের, আরেকটা মেটিনীর। মেটিনীর উনুনে রান্না করতে যাবার হাজারো ঝঞ্ঝাট। আগে তার নিজের রান্না শেষ হবে—বেশ রসিয়ে রসিয়ে, অনেকক্ষণ সময় নিয়ে; তবে তো বাকী সবার রান্না। যদি নিভে যায় এর মধ্যে তো গেলো। দ্বিতীয়বার জ্বালানোর হুজ্জুৎ কে আবার করে। ফলে সব চোট আমাদের উনুনের ওপর। একের পর এক আসছে আর রাঁধছে। আমরা চুপচাপ হাত পা গুটিয়ে বসে আছি। এদিকে ক্ষিদেয় পেট যাচ্ছে জ্বলে। কিন্তু উপায় কি! ক্ষিদে যেমন আমাদের, ওদেরও তো তাই। নয় রইলাম আমরাও উপোস। আগে ওদেরগুলো মিটুক।

রোববারের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো সাক্ষাৎকার। জেলের ভাষায় এরা বলে মোলাকাতি। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই হয়তো জেলে কিংবা বাপ-ছেলে বা ছেলে-মা, দুজন থাকে দু প্রান্তে—কয়েক রোববার পর পর অফিস ঘরে মোলাকাতের অনুমতি হয়। সময় মাত্র দশ মিনিট। সামনে বসে থাকে ছোট-জেলার। যা কিছু কথাবার্তা সব তার সামনেই বলতে হবে। দেখে শুনে আমি তো থ'। বলতে গেলে প্রায় সবারই কেউ না কেউ জেলে, দুজনের অপরাধ এবং দুজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এক। আর দেখা করতে যাবার আগে সে যে কত তোড়জোড়। স্বজনের জন্যে আগে থেকেই তো রোজকার রেশনের একটু না একটু সরিয়ে রেখেছে। শনিবার রাতে কটা চাল, ক মুঠো ছোলা জলে ভিজিয়ে রাখলো। সকাল বেলা বসে বসে বাটলো শিল নোড়ায়, তৈরী হলো থকথকে এক ধরনের লেই। তাতে গুড় বা নুন মেশালো। বানালো ছোট ছোট বরফি মতো। সরষের তেলে ভাজলো বেশ কড়া করে। বেশ তেল চপচপে ভাব। এগুলো নিয়ে যাবে এরা সাক্ষাতের সময়, প্রিয় জনের হাতে তুলে দেবে।

দেখতে দেখতে বেলা তিনটে। এবার সাজগোজ। সকালে এক ফাঁকে শাড়ি কাচা হয়ে গেছে। শুকিয়েও গেছে এর মধ্যে। পরলো বেশ যত্ন করে। চুল আঁচড়ালো। খাবারগুলো বাঁধলো একটা কাগজের প্যাকেটে, নয়তো কম্বলের ছেঁড়া অংশে। পাঁচটার একটু আগে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজলো। ডিউটি জমাদার খুলে দিল ফটক। বেরোলো সবাই একে একে লাইন করে।

জমাদারের হাতে নামের একটা তালিকা। এক একটা নাম হাঁকছে আর এক একজন ফটক পেরিয়ে অফিস ঘরের দিকে ছুটছে। তারপরের অধ্যায় অন্ধকার। কি হলো সেখানে জানিনা। ফিরে এলো মিনিট পনেরো পর। মুখে খই ফোটার মতে আনকোরা কিছু গুজব। নকশাল ছাড়া বাকী পুরুষ বন্দীদেব কিছুটা স্বাধীন ভাবে জেলখানার ভেতরে ঘোরাফেরার অধিকাব আছে। তাবা নানান খবর পায়, সব জমা করে রাখে এই দিনটিব জন্য। সে যে কত রকমেব খবব। কাব বিচার হবে, কে বদলি হবে, কোন্ কোন্ বড কর্তা জেল পরিদর্শনে আসবে, কার ছাড়া পাবার সময় এগিযে আসছে, কে বা জামিন পাবে—সব। কল্পনা আর আমি তো হাঁ করে বসে থাকতাম ওদেব ফেবার অপেক্ষায। যদি কিছু চমকদার খবর শোনা যায়।

গোড়ার দিকে ভারী অসুবিধে হতো ডাকা ডাকির ব্যাপার নিয়ে। কাকে কি বলে ডাকবো সেটা একটা সমস্যা। ভারতে গুরুজনকে নাম ধরে ডাকা মানেই অসম্মান দেখানো। সব শিখে নিলাম ধীবে ধীবে। আমার চেযে বয়েসে বড় কোন মহিলা, সে আমার হয় মা, নয় মাসী। ওবা বলে 'মৌসী'। এদের কাছে আমি বেটি। কেউ বলে দিদি, একজন ডাকে নানী। অর্থাৎ ঠাকুমা। সে কিন্তু আমাব মাযের বযেসী। একজন তাকে ধমক দিযেছিল—চালাকি নাকি, ওর আমি ঠাকুমা। ও বলে কিনা—ঠাকুমাই তো, নইলে চুলগুলো অমন ধপধপে সাদা হবে কেন? ধপধপে সাদা চুল এদেশে বয়েসের নিদর্শন। চুল নিযে ভুগতেও হয়েছে আমাকে খুব। অনেক অফিসাবকে দেখেছি এই ভুল করতে। জেলের অন্যান্য কর্তাদেরও। জেল সিপাইদেব তো কথাই নেই। সবাই ভাবতো আমার পাকা চুল। লেখাব সময়ে বয়েসের ঘবে সাতাশেব চেয়ে তাই কিছু বেশিই লিখতো।

মায়েদের মধ্যে একজনের কথা বলি। তার নাম সৈবুন্নিসা। বছর পঁয়তাল্লিশ বযেস, জাতিতে মুসলমান। বিশ বছর ধরে সে জেল খাটছে। শুধু সে-ই নয়, তার স্বামী, তাব তিন ছেলে, এক ভাইপো—সবাই। জমির দখলদারী নিয়ে শরিকে শরিকে মারপিট, পরিণতিতে এক শরিকের মৃত্যু—এই হলো তাদের অপরাধ। যখন এসেছিল হাজতে, তাব ছোট ছেলের বয়েস তেরো। পাঁচ বছর পরে সে এখন আঠারো বছরের যুবক। বড ছেলের বয়েস এখন চব্বিশ। শুধু তিন মেয়ে জেলের বাইরে। তিনজনেই নাবালিকা। একজনের তিন, একজন চার আর একজনের ছ বছর বয়েস। এই অবস্থাতেই সে তাদের রেখে হাজতে এসেছে। মাঝে মাঝেই ডুকরে কেঁদে ওঠে তাদের নাম

ধরে। কি হচ্ছে তাদের, কিভাবে কি করছে এই নিয়ে চিন্তার আর শেষ নেই। চিন্তা হবারই কথা। গ্রামীন সমাজের নিয়মকানুন যে আলাদা। নির্মমতা সেখানে আছে বাঘের মত ওত পেতে। ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য তাদের দাসীর মতো খাটতে হতে পারে, ক্রীতদাস হিসেবে কেউ তাদের আরেক জনের হাতে বিক্রী করে দিতে পারে, পরিণতি তো একটাই—সবশেষে বেশ্যাবৃত্তি।

তা ছেলেমেয়ে তো কেউ কাছে নেই, আমাদের ওপব দিতো সব স্নেহ উজার করে। কি ভালো যে বাসতো। আটা গুলে তাই দিয়ে ভাজতো আসকে পিঠে, একটা লোহার চাটু কোত্থেকে কিভাবে যেন যোগাড় করেছিল। আমরা বসে থাকতাম উন্মুখ হয়ে। ভাজতো, আর তুলে দিতো আমাদেব পাতে। গবমাগবম কী যে অপূর্ব তার স্বাদ। খুব আয়েস কবে খেতাম। ভাবী খুশী হতো মা। বাকীরা তো অবাক। আমরা তাহলে অচ্ছুৎদের হাতেও খাই। কোনো বাধা নিষেধ নেই আমাদের। ব্যস্, আর যায় কোথায়। তবে তো তাদেরটাও খেতে হবে। শুরু হলো খাবার খাওয়ানোর ঘটা। এটা ওটা—কত রকমেব লোভনীয তার স্বাদ। সবই কিন্তু হাতে তৈবী। আব কী দবাজ মন। আমাদের ভালো লেগেছে দেখে নিজেব ভাগেরটুকুও অক্লেশে তুলে দিতো আমাদের পাতে—এমন দরাজ ভালবাসা আব কোথায় পাবো।

বড ভাল লাগতো রোহিনীকে। কম বয়েসী চাষীব ঘবের মেয়ে, বন্ধু হয়ে গিয়েছিল আমাদেব। ওর বিরুদ্ধে নাকি খুনের অভিযোগ। গাযে কী তাগদ! সাবা দিন পবিশ্রম করতো, তবু কখনো ওকে ক্লান্তি বোধ করতে দেখিনি। জমি কোপানো থেকে শুরু করে জমাদারনীর কাপড কাচা—কোনো কাজেই সে পিছপা নয়। কতবাব বলতো আমাদের—কি কাজ আছে দাও, আমি করে দিই। আমাদের কাপড় কাচতে চাইতো, ঘর ঝাঁট দিয়ে দেবে বলতো, চাই কি বললে আমাদের গা টিপেটুপে তেল মালিশ করে দেবারও আব্দার জানাতো। আমরা রাজী হতাম না। কোনটাতেই। লেখাপড়া জানি বলে এমন তো নয় যে আমরা গতর খাটুনির কাজ ছোট চোখে দেখি। নিজেদের সব কিছু নিজের হাতেই করতাম। কয়লা ভাঙতাম, কাপড় কাচতাম, বাসন মাজতাম, ঘর ঝাঁট দিতাম, কোনটাই খারাপ লাগতো না। আর যত দেখত ও, অবাক হতো। মনের কাছাকাছি আসতো। ঐ যে আমরা সুযোগ থাকতেও ওকে দিয়ে কোন কাজ করাই না, সেটাই ওর ভালো লাগার কারণ।

একদিন কিন্তু কিন্তু করে জানালো ওর মনের একটা গোপন বাসনা।

লেখা পড়া শেখার নাকি ওর ভীষণ ইচ্ছে। কল্পনা এক পায়ে খাড়া। বিকেলে কাজ চুকিয়ে বসে যেতো ছাত্রীকে নিয়ে, একটা একটা করে হিন্দী অক্ষর লেখাতো। হায়, তখন কি জানি এর পরিণাম কি হবে! সেটা কিছুদিন পরেই টের পেলাম।

শিকার

২৫শে এপ্রিল রবিবার, ১৯৭১। উপোসের দিন এবং যথারীতি মোলাকাতেরও দিন। কল্পনা আর আমি এতদিনে গ্রামীণ রান্নার পদ্ধতি রপ্ত করে ফেলেছি। সকাল থেকে গ্যাঁট হয়ে বসেছি এক ফালি কম্বল ভাঁজ করে, সামনে গনগনে উনুন, রান্না চলছে। কয়েদীদের আত্মীয় পরিজনের জন্য। আজকের বিশেষ রান্না ছোলার ডালের বড়া। সে যা বিশ্রী অবস্থা! উনুনের চারপাশে তেল ছিটে ছাই ছড়িয়ে রীতিমতো এক পাকশালের ছবি। হাত আমার ছোলাবাটায় মাখামাখি। শাড়িতে তেলের ছোপ। বেশ চলছে কাজ, হঠাৎ ছুটতে ছুটতে মেটিনী এসে হাজির,—দিদি দিদি, তোমার এখুনি অফিস ঘরে যেতে হবে, তোমার মোলাকাতি এসেছে। বুকটা ছলকে উঠলো। আমার আবার মোলাকাতি! কে আসবে আমার সঙ্গে দেখা করতে! নির্ঘাৎ মিথ্যে কথা। মিথ্যে বলে একে তাকে বোকা বানানো এখানকার পরিচিত রেওয়াজ। ও নিশ্চয় আমার সঙ্গে মজা করছে।

কিন্তু মজা যে নয়, একটু পরেই টের পেলাম। বড় জমাদার এসে হাজির। এসব ক্ষেত্রে ও-ই এসে কয়েদীকে নিয়ে যায়। বললো, লোক এসেছে। না না, এমবাসী অফিসের কোন কর্তা ব্যক্তি নয়, সম্পূর্ণ আলাদা লোক। একজন নয়, দুজন। এসেছে শুধু আমারই সঙ্গে দেখা করতে।

আর আমাকে পায় কে! অমনি চুল আঁচড়ালাম। জট পড়েছে চুলে, চিরুণী যেন চলতে চায় না। শাড়ী পালটাবো! কিন্তু শাড়ী যে আর নেই। ..নার মার দেওয়া সবেধন নীলমণি এই একখানা। আমার প্যান্ট শার্ট তো কবেই ছিঁড়ে গেছে। তাছাড়া ওসব আর পরতে ভালোও লাগে না, শাড়ীতেই এখন বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

তেলের ছোপধরা শাড়ীখানাই আবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটু অদলবদল করে পরলাম।

তারপর বড় জমাদারের পেছন পেছন সোজা অফিস ঘর।

চারদিকে কাগজ আর ফাইলের পাহাড়, একধারে কিছু উৎসুক কেরানী। এরই মাঝে হতবিহ্বল দুই ব্যক্তিত্ব যেন প্রশান্তির দুই সমুদ্র—অমলেন্দুর বৃদ্ধ মা আর বাবা। আমাকে হাত নেড়ে কাছে ডাকলেন, বসতে বললেন। সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল, আমি কি করি। শান্ত সুবোধ গৃহবধুর মতো হেঁট হয়ে শ্বশুর শাশুড়ির পদধূলি নিই কি না। নিলাম না। কাছে গিয়ে শুধু বসলাম। ওঁরা অমলেন্দু আর অমলেন্দুর ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। চেয়েছিলেন তিনজনের সঙ্গেই এক জায়গায় দেখা করতে, অনুমতি মেলেনি। আহা রে, এই বৃদ্ধ বয়েসে পাঁচশো মাইল পথ পাড়ি দিয়ে এসেছেন ছেলে ছেলে বৌ-এর খোঁজ নিতে। কাপড় নিয়ে এসেছেন, নারকোলের নাড়ু, সুগন্ধি সাবান এনেছেন, একটা তালপাতার পাখাও এনেছেন—গরমে যে আমার খুব কষ্ট হয়! নিশ্চিন্ত করলাম তাঁদের, বললাম উদ্বেগের কোন কারণ নেই। ওরা দশমিনিট সময় মঞ্জুর করলো। দশ মিনিটে বুক অনেকখানি হালকা করে জেনানা মহলে আবার ফিরে এলাম।

এসে হুঁশ হলো, রাগও হলো। নিজের ওপর নিজেরই রাগ। একটু প্রস্তুতি নেই, কিছু না, হুট করে ডেকে নিয়ে গেলো আমায়! কত কথা মনে মনে তৈরী করে রেখেছিলাম বলবো বলে, কিছুই যে বলা হলো না। নিজেকে ভীষণ অপরাধীও মনে হলো। এই বৃদ্ধ বয়েসে কত না হেনস্থা করছি ওঁদের। অমলেন্দুর সঙ্গে বারেকের জন্যে চোখের দেখাও হলো না। কি লাভ হলো তবে এই দশ দশটা মিনিটে! এতোদিন দেখিনি কাউকে, কিছু মনেও পড়েনি। আজ যে বারেবারে মন উতলা হচ্ছে, জেলখানার বাইরের জীবনের কথা যে বারেবারে মনে পড়ছে। সব তোলপাড় হচ্ছে যে মুহুর্মুহু। এই সব বিষাদের জন্যই কি এই ক্ষণিকের সাক্ষাৎকার।

বিষাদ ভুলে 'স্বাভাবিক' হতে সময় লাগলো দুদিন।

এদিকে নারকোলের নাড়ুগুলো মহা সমস্যায় ফেলেছে। কল্পনা আমি দুজনেরই ইচ্ছে সবার সঙ্গে ভাগ করে খেতে। কিন্তু দিয়ে থুয়েও আমাদের জন্যে যা থাকবে, তার সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। তাহলে কি হবে! নাড়ু যে আমাদের ভীষণ প্রিয় জিনিস। ওরা তো খুদকুড়ো যা পায় সবাইকে সমান ভাগ করে খাওয়ায়। আমরাই বা কেন করবো না। সমান ভাগে ভাগ! করলাম তাই।

লোভ জয় করে ঠিক ঠিক ভাগ করে সবকটা নাড়ু বিলি করলাম। কোন পক্ষপাতিত্ব নয়। কেননা এটা বড় দুর্বল জায়গা। কাউকে কম কাউকে বেশি দেওয়া নিয়ে মাঝে মাঝেই দেখি কোন্দল লাগে। আমরা বাপু কারুর সঙ্গে কোন্দল করতে চাই না।

কিন্তু আমরা চাই না মানেই এমন তো নয় যে অন্য কেউও চায় না। ঝড় যে আকাশের এক কোণে দানা বাঁধতে শুরু করেছে, তখন কি ছাই ভুলেও বুঝতে পেরেছি। রোহিনীকে নিয়েই এর সূচনা। কল্পনা যে রোহিনীকে 'পড়া-লিখা' শেখায় এটা মেটিনীর ঘোর অপছন্দ। এটা সে পক্ষপাতিত্ব বলেই মনে করে। মনে মনে হিংসায় জলে আর ভাবে রোহিনী যদি পড়াশুনো শিখে কোনদিন তাকে ভাগিয়ে তার জায়গা দখল করে নেয়! ভারী রাগ তাই রোহিনীর ওপর। রাত্তিরে আমাদেরকে ঘরে তালাবদ্ধ করে ওয়ার্ডে গিয়ে রোহিনীকে কথা শোনায়, টিটকিরি দেয়। অবস্থা এমন পর্যায়েও পেঁৗছেছে, কথা শুনে আর থাকতে পারেনি রোহিনী, কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসেছে আমাদের কাছে, প্রতিকার দাবী করেছে। কাঁহাতক আর মুখ বুজে সহ্য করা যায়। একদিন মেটিনীকে মুখোমুখি পেয়ে খুব একচোট ডেঁটে দিলাম। বললাম, এমন হলে আমরা কিন্তু আর বরদাস্ত করবো না। কী ভুল যে করেছিলাম সেদিন! মেটিনী মতলব ভাঁজতে লাগলো, কি করে আমাদের হেনস্থা করা যায়।

কদিন পরের কথা। বড় জমাদারের কাছে রিপোর্ট হলো কল্পনা কি নাকি একটা জিনিস বাগানের শেষ মাথায় লুকিয়ে রেখেছে। ঠিক তখনই আবার সারা জেলখানা জুড়ে নিরাপত্তার গেড়ো কষাকষির তোড়জোড় চলছে। স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিস নাকি খবর পেয়েছে নকশাল বন্দীরা জেল ভেঙে পালাবার মতলব ভাঁজছে। মাত্র আগের দিন এরই ভিত্তিতে নতুন নির্দেশ এসেছে, একজন নয় তিনজন করে কয়েদিনী আমাদের ঘরে রাত্তিরে শোবে। ব্যস্‌, আর যায় কোথায়। রিপোর্ট পেয়ে জমাদার জানালো জেলারকে। আমাদের কিছু বললো না। বলাটা তার স্বভাবতঃই নিয়মের বাইরে। তবে কিছু যে একটা হতে যাচ্ছে অনুমান করতে দেরী হলো না। যে কড়া চাউনি তার চোখে মুখে, তালা আটকাবার সময় যে নিষ্করুণ থমথমে মুখ—বছর খানেক তো কাটিয়ে দিলাম ফাটকের চৌহদ্দির মধ্যে, ওদের চোখ মুখ ভঙ্গি দেখলেই অনেক কিছু আমরা বুঝে নিতে পারি। একটা যে কিছু ঘটতে চলেছে এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

বড় জমাদার চলে যাবার পরই এলো এক জমাদারনী। তালা পরখ করবার ছুতো। আসলে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়। চুপি চুপি ডাকলো।

বললো, সুপার আর জেলার নাকি আসছে আমাদের তল্লাসী করতে। যদি গোপন কিছু থাকে আমরা যেন নিশ্চিন্তে তাকে দিয়ে দিই। দিলাম। থাকার মধ্যে তো কটা টাকা আর চোরাগোপ্তা পথে আসা খান দুয়েক চিঠি। যাক, শান্তি! আর তো ভয় ভাবনার কিছু নেই। যেন কিছুই জানিনা আমরা, কিছু বুঝিনা এমন এক ভান করে জামা খুলে যেমন গরমের দিনে শুধু ভেতরের জামা পরে মেঝের ওপর সবাই শোয়, আমরাও যথারীতি শুয়ে পড়লাম।

রাত তখন ঠিক দশটা। তীব্র একটা আলো এসে পড়লো চোখে, সঙ্গে পুরুষ কণ্ঠের কিছু কথা। পুরুষ! এতো রাতে! কই ঘন্টির আওয়াজ তো শুনিনি। নিয়ম হলো জেনানা মহলে যে কোন পুরুষ ঢোকার আগে ঘন্টি বাজবে, আগে থেকে সবাইকে জানান দেবে। এরা নিয়ম মানার প্রয়োজনটুকুও বোধ করেনি। চোরের মতো চুপি চুপি চলে এসেছে সোজা আমাদের ঘরের সামনে, আলো ফেলেছে মুখে—আলোর বৃত্তে আমাদের সারা শরীর, একটু যে পুরুষ দেখে ভদ্রস্থ হবো, সে সুযোগটুকু দেবার মতো ভদ্রতা জ্ঞানও ওদের নেই। সুপার আর কয়েকজন অফিসার। আর কী তর্জন গর্জন—বেরোও, বাইরে যাও!

বেরোলাম। অমনি দুজনকে পাশের ঘরটাতে পুরে তালা আটকালো। তারপর শুরু হলো তল্লাশ। কুড়ি মিনিট ধরে সে কী তোলপাড়! টান মেরে ফেলে দিল ঘরের সব জিনিস। অাঁতি পাঁতি করে প্রতিটি ইঞ্চি খুঁজলো। খুঁজুক। আমাদের ভারী বয়ে গেছে। গান জুড়লাম। গলা ছেড়ে চিৎকার করে গান। একটা অ্যালুমিনিয়াম থালায় তালও ঠুকতে শুরু করেছি। পরে এক জমাদারনীর মুখে শুনেছিলাম, গান শুনে সুপার নাকি রীতিমতো হকচকিয়ে গিয়েছিল। সে যাই হোক, ঘর তল্লাসীর পর এবার আমাদের শরীর তল্লাসীর পালা। ডাকলো এক জমাদারনীকে। আমাদের অাঁতি পাঁতি খুঁজলো পাওয়ার মধ্যে পেলো একটা পেন্সিল, কল্পনা লুকিয়ে রেখেছিল শায়ার ভাঁজে। এরই মধ্যে এক জনের নজর গেলো এককোণে কয়লার স্তূপটার দিকে। তাইতো, ওটা যে এখনো দেখা হয় নি! অমনি মেঝের ওপর ছত্রখান হলো কয়লা। কিছুই পেলো না। চলে গেলো মাথা নীচু করে। আমাদের তালা খুলে দেওয়া হলো। মনের ওপর এমনই চাপ গেছে যে সারা রাত দু চোখের পাতা এক করতে পারলাম না।

এখানেই শেষ নয়, আরো আছে। সকালে গারদের তালা খুলে আমাদের বাইরে বেরোতে দেওয়া হলো না। ভেতরেই রইলাম। একটু পরে দেখি জনা কুড়ি কয়েদী সমেত এক জমাদার এসে হাজির। সারা উঠোনটা তারা কোদাল

দিয়ে খুঁড়লো, ফুলগাছ গুলো উপড়ে উপড়ে তুলে ফেললো, ডাল কাটলো সব কটা বড় বড় গাছের। ব্যস্, তবে শান্তি। হায়রে আমাদের সাধের নিম গাছ। কোথায় গেল তার অতো ডাল পালা পাতা। হাত নেই পা নেই শুধু ফুট বারো উঁচু একটা গুঁড়ি। তাকিয়ে দেখি জুঁই গাছটাও নেই। আম পেয়ারা লেবু আর পাতা বাহারেরও দফা গয়া। গুলঞ্চ গাছটাও উধাও। সব কিছু নিঃশেষ করার পর ওরা আমাদেব তালা খুলে বেরোতে দিয়েছে। সব ফাঁকা। চারদিকে হা হা করছে একটা শূন্যতা। বুকটা যেন কান্নায় ভেঙে পড়তে চাইছে। প্রকৃতির জগতে ছিলো আমাদের কটা বন্ধু, তাদেরও এরা নির্মম হাতে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। রইলো কি তাহলে ? এতো দুর্দশার মধ্যেও তবু যা এদেব ছায়ায দাঁড়িয়ে একটু শান্তি পেতাম। সে শান্তিটুকুও কি এদের সহ্য হচ্ছিল না ?

রাতারাতি সব যেন কেমন পালটে গেল। জেল আর জেল নয়, যেন একটা দুর্গ। ঝড়ে র যেন একটা পূর্বাভাস পাচ্ছি। কে জানে আরও কত কি ঘটবে জমাদারনীরা তো ভয়ে জড়সড়। ওরাই না একটু আধটু আস্কারা দিতো আমাদের। যদি সেটা জানাজানি হয়ে যায়, সব সময় এই ভয়। সবাইকে বললো, খবরদার, কেউ যেন আমাদের ধার কাছ অব্দি না মাড়ায়। যদি ঘূণাক্ষরেও আমরা জানতে পারি কি হতে যাচ্ছে বা হবে, চাবকে তাহলে পিঠের ছাল তুলে নেওয়া হবে। সুতরাং নির্বাসন। সবার থেকে আলাদা হয়ে একক একাকী কালযাপন। রাগ হয়, কিন্তু রাগ ফলাবো কার ওপর ! সন্দেহের চোখে সবাই দেখি দূর থেকে তাকায়। করবো কি। সন্দেহ ঘোচাবার পথ যে বন্ধ। মনটাও সব মিলিয়ে খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কিছুতেই কোন ব্যাপারে মন বসাতে পারি না। শুনেছি, ও প্রান্তে প্রতিটি নকশাল কয়েদীকে নাকি তল্লাসী করা হয়েছে। কেমন আছে অমলেন্দু ? আমরা তো তবু দু একটা খবর পাই, ও তো একলা নির্জনে বন্দী দীর্ঘদিন। খবর পাবার তো কোন উপায়ই নেই। আমাদের ঘরে যে তল্লাসী হয়েছে, তা কি ও শুনেছে ? হয়তো শুনেছে। কিন্তু শোনাই তো কাল। চিন্তায় চিন্তায় ওর কি রাত্রে ঘুম হবে ! কি করে জানাবো ওকে আমি ভালো আছি চিন্তার কোন কারণ নেই ? জেল-সেপাইগুলো বড্ড যে ঘুরঘুর করে। কি করে ওদের চোখ এড়িয়ে খবর পাঠাই ?

পুরনো নিয়মগুলোও যেন ফিরে ফিরে আসছে। রাত্রে দুজনকে আর এক ঘরে থাকতে দেওয়া হয় না, দুজনের জন্য দুটো আলাদা ঘর। আমাদের কাগজ, বই,

চিঠি, সব বন্ধ। খাবার দেবার আগে একদফা জমাদারনী, একদফা মেটিনী খুঁটিয়ে পরখ করে। যেন কেউ আমাদেব চেনেও না। কদিন আগে যে জমাদারনী বন্ধুর মতো হেসে হেসে কথা বলতো, আমাদের দুর্দশায় সহানুভূতি জানাতো, সে যেন এখন অচেনা মানুষ। আব উঠোনের ঐ হা হা খালি ভাবটা যেন বুক আমাদের টুকরো টুকরো কবে ভেঙে দিযেছে। গান করতে পারি না, রঙ্গ রসিকতাও বন্ধ, এমন কি বান্নাব একটু অদলবদল তা নিয়েও যেন আলোচনা করতে আব ইচ্ছে কবে না। কেমন যেন মূক স্থবিব থম মেরে গেছি আমরা। আর, সব সময় একটা অস্বস্তি, কি যেন ঘটবে, ঘটতে যাচ্ছে। সন্ধ্যেবেলা বড় জমাদারের তালা পরখ যেন আর শেষ হতে চায না। যাবার আগে ঘরের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মেবে অনেকক্ষণ ধরে দেখে। একদিন তো সরষের তেল আর নারকোল তেলের শিশি দুটো নিযে গেল। কত বললাম, কত আপত্তি জানালাম, কিসের কি! শিশি নাকি জেলখানায নিষিদ্ধ, সে জেলারকে দেখাবে। "কিন্তু শিশি দুটো তো তল্লাশীর আগে থেকেই আছে।" থাকতেই পারে, তল্লাশীর সময় নজর পডে নি। বললো, আমি নিযম ভঙ্গ করেছি, এবং ইচ্ছাকৃতভাবে। নিযম ভাঙাটা একটা মস্ত বড অপবাধ।

রাগে শবীব জ্বলতে লাগলো। কিন্তু কি করবো। আমি যে নিরুপায়।

তা বলে একেবারে নির্বান্ধব যে তা নয়। এই দুর্দশার দিনেও আসতো সুকরী। সে আমাদের ভোলে নি। বড ভালো লাগতো ওকে, বড আপন লাগতো।

জাতে হরিজন জেলে আসার আগে ঝাড়ুদারের কাজ করতো একটা কারখানায়, হাজারিবাগের কাছাকাছি। ও আর ওর স্বামী দুজনের বিরুদ্ধেই অভিযোগ, ওদের কাছে নাকি চোরাই তামার তার পাওয়া গেছে। তেমন একটা জটিল কেস নয়, জামিন পাওযা সহজ এবং বলতে গেলে খরচ খরচাও কম। তা জমি জিরেত তো বেশি নেই, তার ওপর উকিলগুলো বড় শয়তান। এর মধ্যে সঞ্চয় যেটুকু যা ছিলো, সব দুয়ে নিয়েছে, তবু হাজত বাসের গেরো কাটে নি। সব শুনে আমরা বুঝেছিলাম, উকিলটাই যত নষ্টের গোড়া, পই পই করে মানা করে দিয়েছিলাম, যেন আর তাকে একটি আধলাও না দেয়, স্বামীকেও যেন এই মর্মে মানা করে দেয়। শোনে নি বারণ। তবু দিয়েছে। কাজ চলে যাবার যে বড ভয়। বেশিদিন জেলে পচলে বেরিয়ে গিয়ে যদি দেখে মালিক অন্য কাউকে কাজে নিয়ে নিয়েছে!

পনেরো দিন পর পর পড়তো ওদের মামলার তারিখ। ওরা দুজনেই যেতো। এদিকে আমাদের এই অবস্থা। সুকরী ভোলে নি আমাদের। নকশালদের

একটা ওয়ার্ডে স্বামী করতো মেথরের কাজ। স্বভাবতঃই নকশাল বন্দীদের প্রতি ভালবাসা ছিল। শুধু তো ওর নয়, অনেকেরই। সকলেরই ভাগ্যে জুটেছে লোহার বেড়ি। তা কোর্ট থেকে ফিরেই স্তকরী স্তযোগ খুঁজতো। ফাঁকা পেলেই ছুটে আসতো আমাদের কাছে, নকশাল বন্দীদের ব্যাপারে বিস্তর খবরাখবর দিতো। ওর কাছেই শুনলাম, ওদিকে তল্লাশী হয়েছে নাকি আরো পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে। এক রাত্তিরে শেষ হয়নি, ফের হয়েছে, ফের। নাকি পাঁচিলের এক জায়গায় একটা ডিনামাইট পাওয়া গেছে। যে কয়েদী মাল পাচার করে ভেতরে এনেছিল, সেই নাকি পরে স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ পুলিসের কাছে সব বলে দেয়। স্তপার তখন ক্লাবে। খবর দিয়ে আনা হয় তাকে। তারই তত্ত্বাবধানে চলে অনুসন্ধান পর্ব।

খবরের সঠিকতা নিয়ে মনে সন্দেহ ছিল। অনেককে জিজ্ঞেস করেছি। কেউ ঠিক ঠিক করে কিছু বলতে পারে নি।

একদিন কোর্ট থেকে ফিবে স্তকরী একখানা চিঠি দিল। চোরাগোপ্তা চিঠি, লিখেছে আমাদেরই এক সহমর্মী। যেন চোখ কান খোলা রাখি আমরা, সদা সতর্ক সাবধান থাকি, যেন কোন ভাবেই কারুর উস্কানির ফাঁদে পা না দিই। এমনই নানা ধরনেব সতর্কবাণী। এক সহৃদয় জমাদার নাকি ওদের বলেছে, যে কোন মুহূর্তে সরকারী তরফ থেকে নকশালদের ওপর আক্রমণের সম্ভাবনা আছে। অফিস ঘবে কর্তারা আলোচনা করছিল, ও শুনেছে।

চিঠি পড়ে কি যে করবো, কিভাবে কি প্রস্তুতি নেবো, কিছুই ঠিক করতে পারলাম না।

এদিকে নিরাপত্তার দাপটে জেল কর্মচারীদেরও অবস্থা সঙ্গীন। ডিউটিতে আসছে কি ডিউটি দিয়ে বাড়ি যাচ্ছে—একেবারে আগাপাস্তলা তাদেরকেও তল্লাশ। কি করে আর সস্তায় কেনা চাল ডাল তেল বাইরে নেবে? পেট চলা যে দায়। বাইরে অতো দাম দিয়ে জিনিস কেনার মাইনে কি সরকার বাহাদুর দেয়? তাই নতুন মতলব ঠাওরালো। খানিকটা বাধ্য হলোও বলা যায়। টঙের ওপরে ঐ যে সব নজরদার, ওদের সঙ্গেই একটা বন্দোবস্ত করলো। ওপর থেকে একটা দড়িতে বাঁধা বালতি এক সময় ঝুপ করে নেমে আসবে, তাতে তুলে দেবে ওরা পাচার করার মতো যাবতীয় জিনিস, বালতিটা ফের উঠে যাবে, নামবে গিয়ে ওপাশে পাঁচিল ডিঙিয়ে। সেখানে লোক থাকবে কর্মচারীদের। তারাই সব সংগ্রহ করে নেবে। কাজটা প্রচণ্ড

ঝুঁকির সন্দেহ নেই। কেননা ধরা পড়লে একেবারে চাকরী নিয়ে টানাটানি। তবু না করে উপায়ও নেই।

ফলে রাগ গিয়ে পড়লো সব নকশালদের ওপর। ওদের জন্যেই তো এতো ঝঞ্ঝাট, এতো হাঙ্গামা। এই প্রায় রোজকার তল্লাসী, এতো সতর্কতা নিরাপত্তার এতো জোরদার ব্যবস্থা একি আগে ছিল! মেটিনী আর এক জমাদারনী আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলতো, নকশালরা আসার আগে জেল নাকি ছিল বাড়ির মতো। এরা এসেই তো দিল সব লণ্ড ভণ্ড করে। মেয়েদের রাগ আবার স্থপারের ওপর।... ...হাড়হাভাতেটা দিলো কিনা সব ফলের গাছগুলো মুড়িয়ে! রাগ হবারই কথা। প্রায় সকলেই তো চাষীর ঘরের মেয়ে, চাষ বাস করে বা ক্ষেত মজুরী করে পেট চালায়। ফসল ফলানোটা তাদের কাছে ভাগ্যের লক্ষণ। আর ফসল নষ্ট করা পাপ। পাপী কি আর ভগবানের কাছে রক্ষা পাবে! এসব আমরা ওদের মুখেই শুনেছি বেশ কিছু দন পর। গোড়ার দিকের ভয়টা কেটে যাবার পর কে আর ওদের আটকায়। আটকালেই বা শুনছে কে। গুটি গুটি সবাই আবার এসে আগের মতো ভিড় জমাতে লাগলো।

তল্লাসীর পর থেকে স্থপারের দায় দায়িত্ব যেন ঢের ঢের গুণ বেড়ে গেল। দিন নেই রাত নেই— হুটহাট করে চলে আসে। রাতেই বরং বেশি। ঘুরে ঘুরে দেখে কোন কর্মচারী ঘুমোচ্ছে কিনা বা পাহারায় কারো এতোটুকু ত্রুটি হচ্ছে কিনা। তিন অল্পবয়েসী জমাদারনী তো ঘুমোনোর অপরাধে সাময়িক বরখাস্ত হলো। সারা রাত ধরে শুনতাম 'গিণতির' নাম ডাকা। কখনো বা লোহার ডাণ্ডা দিয়ে ঠুকে ঠুকে গারদের লোহাগুলো পরীক্ষা করে দেখা হতো। তালা পরখ হতো বারে বারে। মাঝে মাঝেই কারণে অকারণে ঘন্টি বাজতো। দিনের বেলা স্থপারের শুধু টহল আর টহল। সন্দিহান কোনো কিছু কোথাও লুকোনো আছে কিনা দেখছে। চোখ ঘুরছে চারিদিকে। একদিন আমাদের এদিকে এসে হৈ হৈ করে জমাদারনীকে তলব। কি ব্যাপার, না আমরা একটা পিস্তল লুকিয়ে রেখেছি ঘরের মধ্যে ওকে গুলি করবো বলে, ও খবর পেয়েছে, জমাদারনী একবার ভালো করে খুঁজে দেখুক। আর একদিন। আমাদের খাবার আসছে চটের থলিতে ঢেকে, থলিটা সরিয়ে ছুটো কমলালেবু হাতের লাঠিটা দিয়ে নাড়লো, তারপরই চিৎকার—কোন্ আহাম্মক এই পেয়ারা এদের খেতে দিয়েছে? আহাম্মকটি স্বয়ং জেলখানার ডাক্তার, তারই নিদান অনুযায়ী এ ছুটির আগমন। সেটা মহাশয়কে জানানো হলো। তাতেও সন্তুষ্ট নয়।

শেষে গন্ধ শুঁকে যখন বুঝলো পেয়ারা নয় ও দুটো কমলালেবুই, তখন সুড় সুড় করে হাত গুটিয়ে নিলো।

সে বছর এপ্রিল থেকে অক্টোবর একটানা বৃষ্টি। কোনদিনই বলতে গেলে কামাই নেই। ঘর দোর ভিজে স্যাঁতো যাচ্ছে তাই অবস্থা। কাপড় চোপড় আর শুকোয় না। বইয়ে ছাতা পড়েছে। এদিকে চাল আটা যা মুখে দিই কেমন যেন তিতকুটে লাগে। দেয়াল চুইয়ে চুইয়ে জল পড়ে কয়লা থেকে শুরু করে কম্বল চটের থলি সব ভিজে গেল। জ্বালানীর কাঠগুলোও রেহাই পায় নি। বাইরে, বিহারের গ্রামদেশের অবস্থা তো আরো করুণ। মাসের পর মাস এক একটা গ্রাম জলের নীচে, ফসল নষ্ট—কত লোক যে না খেতে পেয়ে মারা গেছে, তার আর ইয়ত্তা নেই। আমাদের বরাত্তে জোটে কটা কালো কালো আলু। মুখে দিলে তার তীব্র ঝাঁঝ সারা মুখে ছড়িয়ে যায়। কি করবো, না খেয়ে তো উপায় নেই, তাই খাচ্ছি। আকাশ তো ঘোলাটে হয়েই আছে। আর উঠোনটা যেন পুরো দস্তুর একটা জলা ভূমি।

সেদিন রবিবার। বিকেল। ঝমঝম করে বৃষ্টির লহরী চলছে। আমি আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করছি, রাত্রের জন্য যা হোক করে কটা চাপাটি তো বানাতে হবে। হঠাৎ পাগলা ঘন্টি বেজে উঠলো। সঙ্গে জমাদারদের বাঁশির ফুঁ। দৌড়ে এলো জমাদারনী, সাত তাড়াতাড়ি আমাদের ঘরে ঢুকিয়ে তালা আটকে দিলো। তালাটা লাগানো সবে শেষ হয়েছে কি হয়নি, শুনলাম গুলির আওয়াজ। একটা, দুটো, ঝাঁকে ঝাঁকে...দু ঘন্টা ধরে চললো। টানা দু ঘন্টা। গারদ শক্ত মুঠোয় ধরা, বুক কাঁপছে ধক ধক করে, নিরুপায় আমি শুধু শুনছি, আর শুনছি। সব আওয়াজই পুরুষ মহলে। প্রতিটি কোণ থেকে যেন বাজী ফুটছে রাশি রাশি। কে জানে যদি কোনো বুলেট ছিটকে আসে—জমাদারনী ভয়ে জড়সড় হয়ে এক কোণে লুকিয়ে পড়লো। সারা শরীরটা আমার থর থর করে কাঁপছে। আকণ্ঠ উদ্বেগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, মাথাটা ইঁটের মতো ভারী, মনে হচ্ছে যেন এক্ষুনি ছিঁড়ে পড়বে। পাঁচটার সময় বড় জমাদার এলো। উস্কখুস্ক চুল, টুপি নেই মাথায়, ছন্নছাড়া চেহারা, পায়ে জুতো নেই—গুণে গেল, মেয়েরা সব ঠিক আছে কিনা। নটা নাগাদ এলো বিহার মিলিটারী পুলিসের একটা দল। জেলের বাইরে ওদের ছাউনী। এসেছে আমাদের তল্লাশী করতে। অফিসারটার দাঁতে দাঁত চেপে সে কী খিল খিল হাসি!—বেশ হয়েছে, মরেছে তো কটা নকশাল! পরদিন সকাল হলো। আমাদের তালা খোলার নাম নেই। খুললো বেশ খানিকক্ষণ পরে।

জমাদারনীদের জিগেস করলাম কি ব্যাপার। খবর কি? কেউ কিছু বললো না। বড জমাদার সবাইকে মানা করে দিয়েছে। মোটেই শান্তি পাচ্ছি না মনে, স্থির থাকতে পারছি না। দেখে একজন বললো, ঘটনা এমন কিছু নয়, বিডি আর খৈনী নিয়ে কয়েদীদের সঙ্গে এক জমাদারের গোলমাল লেগেছিল, তাই ক বাউণ্ড ফাঁকা আওয়াজ করে গোলমাল থামানো হয়েছে। মিথ্যে। সব মিথ্যে। মিথ্যেকে সত্যি বলে কিছুতেই মানতে পারলাম না।

পরদিন সকালে খাবার দিতে এলো এক কয়েদী। রোজই আসে। হাত গলার কাছে তুলে জিভ বের করে হাতের আঙুল দেখিয়ে ইশারা করে বললো দশজন বন্দী মারা গেছে। অর্থাৎ তাদের হত্যা করা হয়েছে। খুন! তবে কি অমলেন্দু নেই! মনের সে যে কী তোলপাডানি। কখনো মনে হয় ও বেঁচে নেই। সেই ভাবেই ভাবনাটাকে অনেকক্ষণ ধরে এগোই; আবার কখনো ভাবি—না বেঁচে আছে। তখন আবার সেইভাবে স্বপ্নের প্রাসাদ রচনা করি। সঠিক খবরটি পেলাম অনেক দিন পর। কাগজে সংবাদ পড়ে অমলেন্দুর দিদিরা এসেছিলেন দেখা করতে, আমার সঙ্গেও দেখা করে গেলেন। বললেন, তারা কথা বলে এসেছেন ওর সঙ্গে, দেখে এসেছেন। ভালোই আছে। কোনো চিন্তার কারণ নেই। আমাদের সঙ্গে যারাই গ্রেপ্তার হয়েছিল, কারো কিছু হয় নি, সবাই সুস্থ আছে। এটা জানতে অবিশ্যি একটু সময় লেগেছিল। ২৫শে জুলাই ৭১ এর ঘটনা। লণ্ডনের টাইমস্ পত্রিকায় বেরোলো আগস্টের শেষাশেষি। হাই-কমিশন অনেক কাঠখড পুডিয়ে এই পত্রিকাটি নিয়মিত আমাকে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। অত দেরীতে ছাপা খবর, স্বভাবতঃই জেল কর্তৃপক্ষ খুঁটিয়ে নজর করবার কথা খেয়াল করেনি, তাই কাটাকুটিও কিছু করে নি। লিখেছে, ১৬ জন নকশাল বন্দী সেদিন নিহত হয়েছে। আরো কদিন পর টাইমস অফ ইণ্ডিয়ায় নজরে পডলো আর এক চিলতে খবর। লিখেছে, ১২ জনকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। সত্যি সত্যি কি হয়েছিল, কিভাবে কি ঘটলো জানলাম বেশ ক'মাস পরে, এক জমাদারনীর মুখে। একদল নকশাল নাকি দরজা ভেঙে সোজা চলে গিয়েছিল ফটক অব্দি, তারা নাকি পালাতেই যাচ্ছিল। জেলার দেখে ফেলে, সিপাইদের নির্দেশ দেয় গুলি চালাতে। গুলিতে চোখের নিমেষে ঢলে পড়ে সেই কটি প্রাণ। সশস্ত্র সিপাই দল তারপর ছুটে যায় বাকী বন্দীদের দিকে, 'বিশ্বস্ত' কয়েদীরা এক একজন নকশালকে দেখিয়ে দেয়—জেল ভেঙে পালাবার আসল বন্দী নাকি তারই,—তাকে সিপাই বুকে বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি করে। মাত্র জনা ছয়েক তাজা যুবককে দিয়ে শুরু হয়েছিল যে

ঘটনা, তা-ই শেষে রূপ নেয় নিষ্ঠুর নির্মম হত্যালীলায়। ঘটনার এক মাস পরেও জেল হাসপাতালে ৩১ জন আহত বন্দীর খবর আমরা পেয়েছি। বেশ কয়েক বছর পরে সেই ঘটনার উল্লেখ করে বড় জমাদার আমাকে বলেছিল, যদি সে থাকতো ঘটনাস্থলে, তাহলে হয়তো রক্তপাত হতো না। কর্তৃপক্ষ তো এমনই একটা ছুতো খুঁজছিল দীর্ঘদিন ধরে।

সে বছরই আরো ৪৫টি হত্যার খবর পেলাম। মেদিনীপুর, বহরমপুর, দমদম পাটনা, কলকাতা—বিভিন্ন জেলে একই ধরনের ঘটনা, পরিণতিতে অবাধ গুলি। হাজারিবাগ জেলের ঘটনা নিয়ে পরে একটা বিচার বিভাগীয় তদন্তেরও আয়োজন করা হয়েছিল। তদন্তকারী জনৈক অবসর প্রাপ্ত বিচারক। তিনি বিস্তর অনুসন্ধানের পর রায় দিলেন, গুলি চালনা যথেষ্ট সঙ্গত ছিলো। সে-অবস্থায় কর্তৃপক্ষের আর কিছু করণীয় ছিলো না। 'বিশ্বস্ত' কয়েদীরা পুরস্কৃত হয়েছে। প্রত্যেকের পাঁচ বছর করে সাজার মেয়াদ হ্রাস পেয়েছে।

শুধু ভেতরেই নয়, জেলের বাইরেও তখন চলছে নিষ্ঠুর হত্যালীলা। কাগজেই সব দেখি। ওদের চোখ এড়িয়ে যায়, তাই দাগ দিয়ে কালো করে দেয় না। বারাসতে পাওয়া গেছে এগারোটি যুবকের মৃতদেহ, রাস্তায় ছড়ানো, অনুমান করা হচ্ছে সবাই নাকি নকশাল। কেউ কেউ বলছে, পুলিসই এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক। এরকম রহস্যজনক হত্যার সন্ধান দমদমেও পাওয়া গেছে, সুদূর ডায়মণ্ডহারবারেও। কাগজেরই খবর, থানা লক আপে পুলিসের প্রহারে বহু নকশাল যুবক প্রাণ হারাচ্ছে। একজনের একটা ছোট্ট চিঠি একদিন কাগজে পড়লাম। তার বাড়ির পাশেই থানা। পুলিসের অত্যাচারে বন্দীর আর্ত চিৎকারে সে সারা রাত ঘুমোতে পারে নি। এদিকে কল্পনার বাড়ি থেকেও কোনো খবর নেই। পরে জানা গেল, ওর এক ভাই আর এক ভাইপোকে নকশাল মর্মী এই অভিযোগে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে। ছেড়েছে তিন মাস পর।

অনেকদিন পর এক মহিলার সঙ্গে জেলেই পরিচয় হলো। ঘটনাচক্রে তিনি জনৈক জেল অফিসারের আত্মীয়া। বাড়ি বীরভূমে। বললেন, 'ঘর থেকে টেনে টেনে বের করে পুলিস যে কত যুবককে বাড়ির দোরগোড়াতেই গুলি করে মেরেছে তার আর ইয়ত্তা নেই। যে রক্ষক সেই ভক্ষক। আইনের যারা প্রতিভূ, তারা জনগণের চোখে আতঙ্ক। আতঙ্ক সৃষ্টি করে তারা চায় জনগণকে নকশাল-পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে। এটাই তাদের একমাত্র কাজ।

তা জুলাই মাসের সেই রবিবারের ঘটনার পর থেকে গোটা জেলখানার চেহারাটাই যেন বদলে গেল। আদর্শ জেল বলতে লোকে জানতো হাজারিবাগ

জেল, গাছপালায় বোঝাই, ফুলের কেয়ারী—সব মিলিয়ে পরিবেশটা সত্যিই লোভনীয়। কোথায় গেল সেই সৌন্দর্য! উদয়াস্ত শুধু করাতের ঘরঘর আর কুড়ুলের ঘা। দেখতে দেখতে আমগাছ কোতল, পেয়ারা গাছ বরবাদ, কাঁঠাল গাছ উধাও, কাঠগোলাপ ভিটেছাড়া—সব মিলিয়ে সে প্রায় কয়েক ডজন গাছ। সুনসান হলে টঙে বসা নজরদারদের যে সুবিধে হবে প্রতিটি অংশে নজর রাখতে। হায়রে সবুজ! এক একটা গাছ কাটে, আর সেই দিকটা যেন খোলা মেলা সাদাটে হয়ে যায়। আড়াল যেন সব ভেঙে পড়ছে। খোলা মাঠ যেন একটা যুদ্ধক্ষেত্র, একধারে আমরা বন্দীর দল, আর এক ধারে ওরা, সশস্ত্র, বন্দুক নিয়ে তৈরী। আমাদের পাঁচিলের ধারে দুটো আম গাছ কাটার পর সোজা চোখ গিয়ে পড়তো টঙে। ঐ তো, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ষাট গজ মাত্র ফারাক। জল নেই, ঝড় নেই, রোদ নেই, দাঁড়িয়ে আছে ঠায় বন্দুক নিয়ে। যে কোন মুহূর্তে আমাদের দিকে তাক করে ঘোড়া টিপতে পারে। রাত্রে শুয়েও অসোয়াস্তি। পুরো ঘরটাই তো টঙ থেকে দেখা যায়। কি জানি বাপু, যদি ঘুমের মধ্যে বুক তাক করে ফস্ করে একটা গুলি ছিটকে দেয়।

যুদ্ধে বন্দী হলে বন্দীরা যেভাবে থাকে, যেন ঠিক তাই। সেই ভাবেই আছি, সেই ভাবেই কাটছে আমার দিন। কিন্তু বাইরেও যে মাঝে মাঝে খবর জানাবার দরকার পড়ে। বিশেষ করে বাবা মাকে। একটা চিঠি যে এক্ষুণি দিতে হয়। লণ্ডনের কাগজে বেরিয়েছে খবর, ওরা নিশ্চয় পড়েছেন, বুঝতেই পারছি কী উদ্বেগ নিয়ে ওরা দিন কাটাচ্ছেন। কিন্তু লিখবো কি? সত্যিকারের সব কিছু লিখলে তো ওরা সে চিঠি বাইরে যেতে দেবে না। তবে কি মিথ্যে লিখবো? তাই বরং ভালো। অর্ধসত্যের চেয়ে তো ভালো। ওরাও খুশী হবে। বাবা মা-ও খবর পেয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত হবেন।

লিখলাম ভালোই আছি, সুখে স্বচ্ছন্দে কাটছে আমার দিন, তোমরা ভেবো না, কিচ্ছু ভেবো না। এদিকে উত্তরোত্তর ভয় বাড়ছে। চিঠি যথারীতি ছাড়-পত্র পেলো। থমথমে ভাব। চারদিকে আতঙ্কের ছায়া। কয়েদীরা আসে, কাজ করে, কেমন বিমর্ষ। যেন মানুষের কাঠামোতে এক একটা শবদেহ। ঢুকতে বেরোতে সবাইকেই জোর তল্লাসী করা হয়। সেপাইরা তাকায় আমাদের দিকে সন্দেহের চোখে। অন্যান্যদের শাসায়, সাবধান, কেউ যদি ভুলেও কোন প্রতিবাদ করে কি অন্যায় অবিচার নিয়ে একটা কথা বলে তো সর্বনাশ। অমনি 'নকশাল' হিসেবে তার ভাগ্যেও জুটবে নির্বাসন। ফলে সব চুপচাপ। ভয়ে কুঁকড়ে থাকা চেহারা। ব্যতিক্রম শুধু সৈবুন্নিসার

স্বামী। মাথার চুল ধপধপে সাদা, বুড়ো মানুষটা খবর নেবার তাগিদে হঠাৎ একদিন গিয়ে হাজির অমলেন্দুদের তল্লাটে। আর যায় কোথায়! সিপাইরা দেখে ফেললো। নকশালদের সাহায্য করার অভিযোগে হলো নির্বাসন। একক, নির্জন, দলছাড়া। ছেলে বড় জমাদারকে দশ টাকা কবুল করে কদিন পর ছাড়িয়ে আনলো। সবই শুনলাম সৈবুন্নিসার মুখে। মরমে মরে গেলাম। ছি ছি, আমার জন্যই না এই ভোগান্তি! সে অবিশ্যি খবর পাঠিয়েছে, ফের সে চেষ্টা করবে খবর আনার, আমি যেন দুশ্চিন্তা না করি।

এদিকে যুদ্ধ লেগেছে। পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ। কাগজে খুব ফলাও করে লিখছে। জাতীয় চেতনা বাড়াবার জন্যে যেন উঠে পড়ে লেগেছে কাগজগুলো। পূর্ব পাকিস্তানে তো সেই মার্চ মাস থেকেই একটা তোলপাড ভাব, গৃহযুদ্ধ এই লাগে কি সেই লাগে। দলে দলে উদ্বাস্তু আসছে ভারতে। তাঁবু গেড়েছে কলকাতার কাছাকাছি। বড় মর্মান্তিক তাদের অবস্থা। ভারতও যেন একটু একটু করে ভেতবে ভেতরে প্রস্তুতি নিচ্ছে। চুপচাপ বসে থাকলে তো চলবে না। আগষ্টে সই হয়েছে ভারত সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি, তাতে বন্ধুত্ব আর সহযোগিতাব আশ্বাস। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শোনা যাচ্ছে ভারত নাকি যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করবে, দরকার হলে পূর্ববঙ্গে সেনা পাঠাতেও পিছপা হবে না।

আগষ্টের শেষাশেষি আরেক চমক। সুপার এসেছে, সঙ্গে এক পুলিস অফিসাব। চেহারা চালচলন দেখেই কিন্তু আমরা সব ঠাউরে নিয়েছি। সে কিছুতেই নিজের পরিচয় দেবে না। শুরু হলো জেরার পর জেরা। আমার নাম কি, আমি কোন্ দেশের নাগরিক, আমার পাসপোর্টের নম্বর কত এই সব। সবই কিন্তু নানান ফাইলে বহু আগে থেকেই কর্তৃপক্ষের কাছে মজুত। কল্পনা বললো, আমি যেন চুপ করে থাকি, ভুলেও যেন নতুন করে এসব আবার বলতে না বসি। ফিস ফিস করেই বলেছে তবু সুপারের কান তো। ঠিক শুনে নিয়েছে কল্পনার কথা। বাপরে বাপ সে কী রাগ! হাতের লাঠিটা তুলে এই মারে কি সেই মারে! বললো, যাও ও ঘরে যাও। তো আমিও গুটিগুটি পা বাড়িয়েছি কল্পনার পেছু পেছু, বলে কিনা, তুমি না, তুমি এখানেই থাকবে, ওর সব প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। তা পনেরোটা মাস তো এরই মধ্যে কেটে গেলো গারদের আড়ালে, এখানকার এই পরিবেশে—নিয়ম কানুন তো আমিও কিছু কিছু শিখে নিয়েছি। আমি তো জানি, জেলখানার নিয়মে আছে, পুলিসের কেউ জেলখানার চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকতে পারবে না। যে লোকের প্রবেশই নিষেধ, তার আবার প্রশ্নের জবাব কি!

বসে পড়লাম মেঝের ওপর। সাফ সাফ জানিয়ে দিলাম, একটি প্রশ্নেরও জবাব আমি দেবো না বা কোন কাগজে সই সাবুদ করবো না। সুপার তখন কল্পনাকে পাশের কুঠুরীতে ঢোকাতে গেছে, বেশ ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ পাচ্ছি, শাসাচ্ছে কল্পনাকে—এতোবড় সাহস, কিনা সুপারের সামনে কথা বলে! কথাও চিরতরে বন্ধ করে দেবে। বলে-টলে তো যেন রাজ্য জয় করে ফিরে এলো। এবার আমার ওপর চোট।—কথা আমাকে বলতেই হবে। প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিতেই হবে। আমি চুপ। শেষে উপায়ান্তর না দেখে শাসালো, আমার বই পত্র কাগজ সব নিয়ে যাবে, একটি টুকরো কাগজও আমি আর কোনদিন পাবো না। সব আমার বন্ধ। সারা দিন-রাত আমাকে তালা বন্ধ অবস্থায় থাকতে হবে। আমি শুধু জবাবে বললাম, আমি যা করছি নিয়ম মেনেই করছি এবং তা সত্ত্বেও যদি কর্তৃপক্ষ কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়, তবে আমি অনির্দিষ্ট কালের জন্য অনশন করতে বাধ্য হবো। বললো, বেশ, তাই হোক। যে মুখ দিয়ে আমি প্রশ্নের জবাব দিইনি, সে মুখে এক ফোঁটা খাবারও যাতে না ঢোকে সেটা সে দেখবে।

বলে চলে গেল।

সে রাত্রে জলটুকুও দেওয়া হলো না আমাদের। বাতিটাও দিলো না। অবাক কাণ্ড, এতো কিছুর পরেও ভোর বেলা আমাদের তালা কিন্তু খুলে দিলো। দিক, আমরাও ছাড়ছি না। খবরের কাগজ, বই এসব ফেরৎ না দেওয়া পর্যন্ত আমরা অনশন চালিয়েই যাবো। দাঁতে দাঁত দিয়ে পড়ে রইলাম। বিকেল হতে দেখি টনক নড়েছে। একজন এসে কাগজ, বই দিয়ে গেল। আমরাও অনশন ভাঙলাম।

রাত কাটলো। ভোরের আলো তখনও ভালো করে ফোটেনি। আমাদের গারদের ওপরকার ঘন্টিটা হঠাৎ বেজে উঠলো। আওয়াজ মেলাতে না মেলাতেই এক জমাদারনী হাজির, কল্পনাকে বললো চটপট তৈরী হয়ে নিতে, তার কলকাতায় বদলীর হুকুম হয়েছে। তাই বুঝি এতো দয়া। সাত তাড়াতাড়ি করে এক বেলার অনশনেই সব মেনে নেওয়া! ওকে ছিনিয়ে নিচ্ছে আমার কাছ থেকে।" আমাকে একলা করে দিচ্ছে।

· সব ভাগাভাগি করলাম। ওর আমার সবই তো এতোদিন মিলে মিশে ছিল, এবার সব আলাদা হলো। চুল বেঁধে দিলাম। কী ঘন একপিঠ চুল কল্পনার! এই শেষ বারের মতো ওর পরিচর্যা করা। চুল বাঁধতে বাঁধতে কাঁদলাম। কি করে দূরত্ব সত্ত্বেও যোগাযোগ রাখা যায় তার পরিকল্পনা

করলাম। আচ্ছা, অমলেন্দুকেও কি কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হবে? বলে দিলাম, যদি ওর সঙ্গে দেখা হয়, ও যেন অমলেন্দুকে আমার খবরাখবর বলে। বাস্তবিক অমলেন্দুও সেদিনই কলকাতায় বদলী হয়েছিল। আমি জানতে পারি নি। প্রায় দু মাস পর খবর পেয়েছিলাম।

একটু পরেই ওরা কল্পনাকে নিয়ে গেল। ততক্ষণে অন্যান্য বন্দীদেরও তালা খুলে দিয়েছে। গেলাম ফটক অব্দি, ওকে বিদায় জানাতে। ফিরে এলাম, বুকটা যেন ফাঁকা। বেশি দিন একসঙ্গে রাখবে না আমাদের, আগে থেকেই জানতাম, সেই ভাবেই মনটাকেও তৈরী করে নিয়েছি, তবু মন কি মানে! চোখের জল যে বাঁধ মানে না। এতো কান্না জমা ছিলো আমার বুকের মধ্যে! কই, আগে তো বুঝি নি।

সৈবুন্নিসা আর রোহিণী এসে আমার পাশে বসলো। সান্ত্বনা দিলো—ভাবনা কি আমার, ওরা তো আছে! তাড়াতাড়ি উনুন জ্বাললো মা, চাটু পেতে বসলো পিঠে ভাজতে। একটু চিনি ছড়িয়ে দিলো পিঠের ওপর। কত দিনের কত কষ্টের সঞ্চিত চিনি! ও জানে, মিষ্টি আমি খুব ভালবাসি। আন্তরিকতায় বুকটা ভরে উঠলো। তবু মন কি প্রবোধ মানে! মানতে চায়! কল্পনাকে আমি যে সব বোঝাতে পারতাম। দু দণ্ড কথা বলে শান্তি পেতাম। কেমন করে বোঝাবো এদের আমার সব মনের কথা। কেমন করে মনের কাছাকাছি আসবো! আর অমন সাথীই বা পাবো কোথায়—আমার প্রিয় কল্পনার মতো সহচরী। সব তুচ্ছ করেছে হেলায়। স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে—সোজা রাস্তা তো খোলাই ছিলো সামনে। 'ভালো' একটা বিয়ে, সুখী স্বচ্ছন্দজীবন, সন্তান সন্ততি, পরিবার পরিজন চাইলে কি না পেতো। কিসের অভাব ওর! সব বিসর্জন দিয়ে নেমে এলো পথে। দুঃখী মানুষের কাঁধে কাঁধ মেলালো, বরণ করলো যন্ত্রণার শৃঙ্খল, কলকাতার বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে দেখলো ক্ষুধা, দেখলো ব্যাধি, দেখলো হিংসা, দেখলো মৃত্যু, একটু একটু করে মনটাকে তৈরী করলো, শক্ত করলো। কই, আমি তো পারিনি। নিশ্চিন্ত নিরাপদ জীবনের স্রোতে গা ভাসিয়েই তো ছিলাম এতোদিন। মুহূর্তের জন্যও কি পেরেছি তাকে হেলায় তুচ্ছ করতে? কাছে নেই ও এখন, নিজেকেই নিজের অসহ্য লাগছে। অত ভালবাসাই বা আমি কোথায় পাবো—দুঃখী মানুষের জন্য? ওর মতো এক বুক ভরা সহানুভূতি! এক বন্দিনীর ইতিহাস শুনতে শুনতে দেখেছি ওকে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়তে, আরেকদিন দেখেছি ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে হৃদয় দিয়ে এক অসুস্থ বন্দিনীর সেবা করতে। অত যে সাধের

ওর একপিঠ চুল, তা-ও সেদিন বাঁধতে ভুলে গিয়েছিল। পারবো আমি চরম বিপদের মুহূর্তে ওর মতো অমন খলখলিয়ে হেসে উঠতে? পারবো যারা আমাদের মনোবল ভাঙতে আসতো, ওর মতো হাসি তামাসার ছলে তাদের ঘায়েল করতে? অন্যায়ের বিরুদ্ধে অমন সোচ্চার প্রতিবাদেরই বা ভাষা আমি পাবো কোথায়? আর অমন আত্মত্যাগ—তা-ই বা আমি কিভাবে অর্জন করবো?

ভুলতে পারিনি ওকে। সেদিনও না, আজও নয়। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরবর্তীকালে কত লড়াই করতে হয়েছে, প্রতি মুহূর্তে মনে হয়েছে—ইস্, কল্পনা যদি পাশে থাকতো, কী ভরসাটাই না পেতাম!

সন্ধ্যেবেলা প্রকাশকে আগলে ধরলাম বুকে। বন্দীর ছেলে। কল্পনা ওকে বড় ভালো বাসতো। জানিনা কোথায় এখন কল্পনা, কোথায় বা অমলেন্দু। শুনেছি লালবাজার পুলিসের সদর দপ্তর নাকি কলকাতার জঘন্যতম নরক। সেই নরকেই কি শেষ অব্দি ওদের নিয়ে গেল?

প্রকাশকে বুকে জড়িয়ে আমি তখন উঠোনে। প্রকাশ উঁচু গম্বুজটার দিকে আঙুল তুলে বললো, কল্পনা মাসী ঐখানে আছে, তাই না? মাসী কবে আসবে বলো না গো? প্রকাশকে আরো শক্ত করে আমি বুকে চেপে ধরলাম।

পাশের ঘর ফাঁকা, রাতটা লাগে নিঃসঙ্গ। যেন শেষ আর হতে চায় না। এমনি করে হপ্তা দুই কাটলো। দেখি একদিন গুটিগুটি লিওনী এসে হাজির। সেই শুরু হলো লিওনীর যাতায়াত।

নতুন এসেছে এখানে জমাদারনীর কাজ নিয়ে। প্রথমটায় দেখে তো আমি অবাক—এইটুকুনি মেয়েটা কেমন করে জোটালো এই উদ্ভট চাকরী! কতই বা বয়েস—বড়জোর একুশ। একদিন নিজেই সব বললো। নিজের বাপ তো নেই, থাকতো সৎ বাপের কাছে। তা সে-ও যখন চোখ বুজলো, তখন কি আর সতাতো দাদারা রেয়াত করে! যদি পরে জমিটমির ভাগ চেয়ে বসে সবাই! তাই দিলো সবাইকে দূর করে। পাঁচটি সন্তান নিয়ে মা হাবুডুবু খেতে লাগলেন।

সব মনে আছে ওর। দারিদ্র্য—কী নির্দয় করুণ তার রূপ। ঘরদোর নেই, থাকতো চেনাজানা একজনের বাড়ির উঠোনে। থালা-বাটির বালাই নেই, বড় বড় পাতা ছিঁড়ে আনতো, তারই ওপর রেখে খাবার খেতো। এক বেলার আহার, কোনক্রমে বহু কষ্টে সংগ্রহ করা চারটি চাল। সঙ্গে কটা পাতা সেদ্ধ। মাঝে মাঝে জুটতো এটা ওটা কাজ।—ইট বওয়া, গাড়িতে মাল বোঝাই করা, সিমেন্ট বওয়া—মা মেয়ে দুজনেই খাটতো। তারপর আরো অনেক পরে দুঃখের শেষ। সরকারী চাকুরী লাভ। এবং লিওনী খুশী। মাইনে তার প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট। খাবার দাবার প্রচুর, এমনকি নিরাপত্তারও কিছু কমতি নেই। মাইনের টাকায় এখন ও ভাই বোনেদের ইস্কুলে পড়ায়। সমাজেও খুব খাতির। আর কি চাই!

লিওনী খ্রীষ্টান। জন্মগত নয়, ধর্মান্তরিত। ইওরোপীয় পাদ্রীরা এদেশে এসে বহু লোককে ধর্মান্তরিত করতে পেরেছিল। এই জেলখানায় আরো কয়েকটি খ্রীষ্টান জমাদারনী আছে। কিন্তু ওর মধ্যে একটা তফাৎ লক্ষ্য করেছি। অন্যান্যদের মতো ও অ-খ্রীষ্টান স্বজাতিদের জংলী যা বর্বর বলে অভিহিত করে না। স্থানীয় আদিম উপজাতি সম্প্রদায়ের মেয়ে। সেইরকমই থাকে। কখনো ইওরোপীয় আদব কায়দা অনুকরণের চেষ্টা করে না। মনটা ভীষণ তেজী,

এখানে ঘোর প্যাঁচের এতটুকু স্থান নেই। যত দেখি তত মুগ্ধ হই। ফলে ভালবাসা, ফলে. বন্ধুত্ব। কখনও বলতো না, জেলে কেউ এসেছে মানেই সে অপরাধী। জেনে শুনে কি কেউ জেলে আসার জন্যে অপরাধ করে? বাদবাকী জমাদারনীরা কিন্তু তাই ভাবতো। বন্দীদের ও বলতো, সরকার তাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব নিয়েছে, তাদের জীবন সার্থক। দুঃখ কষ্টের মধ্যে নিজে তো কাটিয়েছে অনেকদিন, বন্দীদের দুঃখ তাই হৃদয় দিয়ে অনুভব করতো। কাপড় পুরনো হয়ে গেলে নষ্ট করতো না বা বিক্রী করতো না। বন্দীদের মধ্যে এনে বিলি করে দিতো। সময় অসময়ে সবাইকে নানান সাহায্যও করতো।

তা সে বছর দুর্গাপূজায় আমরা ঠাকুর দেখার অনুমতি পেলাম। অবশ্যই বাইরে নয়। জেলখানার ভেতরে। পুরুষ বিভাগে বন্দীরা গড়েছে মূর্তি। 'লাইব্রেরী'তে সেই মূর্তি পুজো হচ্ছে। সব মেয়েরা মিলে আমরা ঠাকুর দেখতে গেলাম। তার আগে পুরুষ বন্দীদের ওয়ার্ডে ঢুকিয়ে তালা দেওয়া হয়েছে। আমাদের পেছনে কয়েকজন অফিসার—চমকদার পোশাক আশাক পরে রয়েছে ছুটির মেজাজে। চোখ কিন্তু সদা সতর্ক আমাদেরই ওপর — আমরা দুর্গা ঠাকুর দেখছি। নামেই লাইব্রেরী, বই পত্রের নাম গন্ধও কোথাও নজরে পড়লো না, আমাদেরই মেয়ে মহলের মতো টানা একটা ঘর—তাতে ঠাকুর বসে আছে, আশে পাশে ছেঁড়া কম্বলের ওপর বাবু হয়ে বসা কয়েকজন কঙ্কালসার বন্দী। এরা মহাপূজার আয়োজক। কোটরাগত চোখ, ভাবলেশহীন মুখ—বসে আছে যেন খড়মাটি দিয়ে তৈরী কিছু মূর্তি। তা দেখছি সবাই মনোযোগ দিয়ে, বেশ একটা শ্রদ্ধামিশ্রিত তদ্‌গত ভাব, হঠাৎ প্রকাশের মা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো, 'হে দুর্গা মাঈ, আমার প্রকাশের বিচি ফুলে গেছে, সারিয়ে দাও মা। দয়া করো।' শুনে তো আমরা মুখ চাপা দিয়ে হাসতে লেগেছি। অফিসারদের চোখেও চাপা হাসির রোল। ছোট জেলার বললো, 'কে ওটা, বিষনি না? ঠিক ধরেছি!' ঠিকই বটে। প্রকাশের মায়ের নাম বিষনি। একটা পা খোঁড়া, তাই নিয়ে নিজের অশান্তি, তার ওপর ছেলের এই দুর্ভোগ। জেলের ডাক্তার ওষুধ দিয়েছে, নিজে পয়সা খরচ করে জড়িবুটি কিনে এনেছে বাইরে থেকে। কিছুতেই সারে না। কি আর করবে বেচারা, শেষ আর্জি তাই মা দুর্গার কাছেই জানালো। আর অবাক কাণ্ড, সারলোও কয়েকদিন পর। পরে তো এই নিয়ে কী হাসা-হাসিটাই না আমরা করেছি। ও বলতো, হাসো আর যা-ই করো বাপু, সেরেছে তো।

পুজোর পরে আরেকজন জমাদারনীকে কাজে নেওয়া হলো। মোট দাঁড়ালো

পাঁচজন। দিনমানে দুই। রাত্তিরে তিন। গম্বুজগুলোর ওপর জোরালো আলো বসলো। যদিও আমার ঘরের কাছাকাছি গম্বুজের আলোটা জ্বলতে সময় লাগলো পাক্কা একটি বছর। রাত্রে ঠিক হলো তিন বন্দিনী আমার সঙ্গে শোবে। আমি একলা আছি সেজন্য নয়। আমাকে চোখে চোখে রাখবে বলে। সব আয়োজনই ২৫শে জুলাইয়ের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে।

অতএব এক নয়। আমরা এখন চার। অদ্ভুত চারটি প্রাণী। নভেম্বরের সেই জমাট বাঁধা শীত। থমথমে রাত। কদিন আগে শেষ হয়েছে বর্ষা। দেয়ালের স্যাৎসেঁতে ভাব এখনো কাটেনি, আর সকালে কুয়াশার সে কী ঘনঘটা! বিছানা করতাম ঘন করে গায়ে গা লাগিয়ে, একটু উষ্ণতার জন্য সে কী আকুলি বিকুলি! সন্ধ্যের ঘোর লাগতে না লাগতেই যে যার বিছানায়, শুরু হতো গল্প, নয়তো লোক ঠকানো ধাঁধা। আমি কি পাবি ওদের সঙ্গে পাল্লা দিতে! একে হিন্দী, তার ওপর দেশজ টানে ঠাসা। কাঁহাতক বুঝে শুনে উত্তর দেওয়া যায়। চুপচাপই থাকতাম। তবু বলবো, কল্পনা যাওয়ার পর এই একটা লাভ আমার হয়েছে। এতোদিন হিন্দী বুঝবার মূল দায়িত্ব ছিল ওর। আমাকে ইংরাজীতে অনুবাদ করে বোঝাতো। এখন ওর অভাবে নিজেকেই চেষ্টা করতে হচ্ছে সরাসরি হিন্দী বুঝবার। এবং তাতে একটু একটু ফলও হচ্ছে।

ঠিক গরাদের ধারটায় বিছানা করে নিতো বুলকানি। অস্থিচর্মসার হাঁপানীর রুগী, আগে কয়লাখনিতে কাজ করতো, কি যেন একটা ছোটখাটো চুরির দায়ে আজ তিন বছর হাজতে। এখনও আদালতে মামলা ওঠে নি। সব সময়ই জ্বর জ্বর ভাব, ঠাণ্ডা তেমন একটা মালুম পায় না। তাই নিজেই জায়গা করে নিয়েছে ওই খানটায়। ঠাণ্ডার প্রথম চোটটা ওর ওপর দিয়েই যায়। মোহিনীর বিছানা ঠিক তার পরেই। মোহিনীর স্বামী, বড়ছেলে দুজনেই হাজতে। জমি নিয়ে গোলমাল। তাতে মোহিনীর ভগ্নিপতির মৃত্যু—এটাই ওদের তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ। চারটি শিশু সন্তানকে গাঁয়ের বাড়িতে রেখে এসেছে। তাদের নিয়ে নিশিদিন শুধু ভাবনা আর ভাবনা। ছুটির দিনে বা কোন উৎসবের দিনে বাইরের কেউ হয়তো 'বিশেষ' কিছু খাবার দিলো খেতে, ওকেও দিলো। হাতে নিয়ে অমনি জুড়ে দিলো ডাক ছেড়ে কান্না। খাবে কেমন করে, ওর চারটি বুকচেরা ধনকে যে খাওয়াতে পারলো না! এক ছেলে আসতো মাঝে মাঝে দেখা করতে। মোলাকাতির পর প্রতিদিন সে কী আকুল কান্না! হয়তো শুনেছে, সংসার চালাবার জন্যে আরো কিছু ঋণ করতে হয়েছে, সেই দুঃখে পা ছড়িয়ে বসেছে কাঁদতে। একবার তো কান্না আর কিছুতে

থামাতে পারি না। জিজ্ঞেস করলাম ব্যাপারটা কি। বলে, ছেলে এসে বলে গেল, বলদ দুটো নাকি হঠাৎ মারা গেছে। বলদ বন্ধক রেখে ছেলে ঠিক করেছিল সেই টাকা দিয়ে বাবা মা দাদাকে জামিনে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে। তা আর হলো না।

পান্নো শুতো ঠিক আমার পাশটায়। জাতে সাঁওতাল। বয়েস হয়েছে, বিধবা। ১৮৫০ সালে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঐতিহ্যবাহী এই সাঁওতাল সম্প্রদায়। ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝেই কেঁপে উঠতো, ককিয়ে উঠতো। বিড়বিড় করে কি যেন সব বলতো। আসলে স্বপ্নে দেখেছে মেয়েকে। নিজের হাতে পাথরের ঘা মেরে এই মেয়েকেই না সে মেরে ফেলেছিল। বলতো, খুন করবো না তো করবো কি। শরম ঢেলেছিল শয়তানী আমার মুখে। আমি তাই নিজের হাতে খুন করেছি। লজ্জারই কথা। গাঁয়ের মোড়লের ছেলের দৌলতে মেয়ের পেটে এসেছিল বাচ্চা, মেয়ে যখন সেকথা জানিয়ে তাকে সাদী করতে বললো, সে বললো বিয়ে কবা তার পক্ষে অসম্ভব। এদিকে গাঁয়ের পাঁচজন টিটকিরি দেয়। ইজ্জৎ তুলে গাল পাড়ে। পান্নো একদিন মেয়েকে খুব মারলো। তাতে কি আর লোকের মুখ বন্ধ হয়। টিটকিরি আর বে-ইজ্জতির ফোয়ারা আগের মতোই বইতে লাগলো। একেবারে কুল মান পরিবার পরিজন নিয়ে টানাটানি। আর সহ্য করতে না পেরে পান্নো ফন্দী এঁটে মেয়েকে নিয়ে গেল জঙ্গলে, কাঠ কুড়িয়ে আনতে। কাঠ কুড়োতে যেই নিচু হয়েছে মেয়ে, অমনি পাথরের ঘা বসিয়ে দিলো মাথায়—মোক্ষম সেই ঘা। মেয়ে আর উঠলো না। পান্নো নিজেই এসে পুলিসেব হাতে ধরা দিল। চার বছর রইলো জেলে, তারপর মামলা উঠলো। বিচারে বিশ বছরের কারাবাস। সেই মেয়াদই এখন কাটাচ্ছে।

অথচ মুখের দিকে তাকিয়ে অনেক খুঁজেও কিন্তু একটু রাগ বা ক্রোধের চিহ্ন দখতে পাই না। ভীষণ বাধ্য। আর শান্ত নম্র বলতে যা বোঝায়। যদি কেউ কখনও একটু কড়া কথা বলে, অমনি কেঁদে ফেলে শিশুর মতো, গুছিয়ে একটা কথার জবাব অব্দি দিতে পারে না। মাঝে মাঝে আমাকে এসে বলতো, গুণে দাওতো, আমার কত পয়সা হলো। উপোস দিয়ে জমানো পয়সা, রোজগার করতো কিন্তু গুণে হিসেব করতে পারতো না। জমাদারনী পয়সা দিয়ে গেলে ছুটে আসতো আমার কাছে—একটু গুণে দাও, ঠিক দিলো কিনা। রোববার হলেই আমাকে দিতো খানিকটা আটা আর এক দলা গুড়। বলতো, বেটি, আমাকে একটু পিঠে বানিয়ে দে তো।

এক্ষেত্রে হত্যার পেছনের কারণটি হলো প্রতিশোধ এবং সম্মান রক্ষা। এমনটি আমি আর কারুর ক্ষেত্রে দেখি নি। এখানে আইন ভাঙার প্রশ্নও ওঠে না। হত্যা করেছে, তার সাজা আছে, এজন্য জেল খাটতে হবে—এটুকুই জানতো। তবু সম্মান রক্ষার মহান দায়িত্ব পালন তো হলো। আমি দেখেছি, সরকার বাহাদুর যেসব আইন কানুন করেছে এবং যা জবরদস্তি চাপিয়ে দিয়েছে দেশের মানুষের ওপর, এইসব গ্রাম্য সহজ সরল মানুষের কাছে তার কোন মূল্যই নেই। এসব তারা বোঝে না, এসব নিয়ে মাথাও ঘামায় না। খুন বলতে যে আগে থেকে অনেক পরিকল্পনা করে উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার প্রয়োজনে একটি নিপুণ হত্যাকাণ্ড—এর উদাহরণ আমি আমার পাঁচ বছরের জেল-জীবনে একটিও পাই নি।

ভারতে এক একটি গ্রাম মানে এক একটি দেশ। দেশের সীমানার বাইরে আরো যে কিছু আছে বা থাকতে পারে, এ বোধটুকুও বেশির ভাগ মানুষের নেই। গ্রামই তার জগৎ। এখানে শুধু কুসংস্কার, ভূত, ডাইনী, পিশাচ, রাজা, রাণী—এই নিয়েই তাদের দিন কাটে। বিশেষ করে আমার সহ বন্দিনীদের। এদের অনেকেই খবরের কাগজ কখনো দেখেনি। আমারটা এলে সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে, অন্ধের মতো তাকায় কালো কালো অক্ষরগুলির দিকে। একজনের প্রশ্নের জবাবে একদিন বলেছিলাম, কাগজে ছাপা হয় দামী দামী সব খবর। শুনে সে বললো, তাহলে দেখোতো, আমার মামলার খবরটা বেরিয়েছে কিনা। 'সরকার' কথাটা লোকের মুখে এরা শুনেছে, কিন্তু কেউ এদের বলে নি, দেশটা কিভাবে চলে, কিভাবে কে কি কাজ করে। জানবার কিন্তু ভীষণ আগ্রহ। কত প্রশ্ন যে আমাকে করতো। —কেরোসিন তেল কোথায় পাওয়া যায়। কাগজ কিভাবে তৈরী হয়, খবরের কাগজ ছাপা হয় কিভাবে, ইত্যাদি। সব গুছিয়ে বলতে পারতাম না, কেননা হিন্দীর জ্ঞান তো আমার মাপা। তবু চেষ্টা করতাম। হাত পা নেড়ে যতটা সম্ভব বুঝিয়ে দিতাম।

বাগানে একবার ফুলকপি হলো। সবার খুব আনন্দ। কিছুদিন পর দেখা গেল, ফুলগুলোতে পোকা ধরেছে, শুঁয়োপোকা। মোহিনী বললো, নির্ঘাত কেউ মাসিক অবস্থায় বাগানে গিয়েছিল, এ তারই পাপ। কারুর হয়তো বারবার শরীর খারাপ হচ্ছে, সারছে না, একজন বললো, ওর চোখ লেগেছে, শয়তানের চোখ। শয়তানকে ঠেকাবার জন্যে অনেককে দেখেছি ছেলে মেয়ের কপালে কাজলের ফোঁটা দিতে, কোমরে তাবিজ বাঁধতে। একবার

তো ভীষণ তর্কই বেঁধে গেল। এক বন্দিনীর ফিটের ব্যামো, ফিট হলেই তার চোখ কপালে ওঠে, সারা শরীর থরথরিয়ে কাঁপতে থাকে। কেউ কেউ বললো, উঠবে না! ও তো ডাইনী। ছেলেপুলে সব চিবিয়ে খেয়ে নেবে। রাত্তিরে কেউ আর তার কাছে শুতে চায় না। এই নিয়ে রোজ ঝগড়া। আমি জমাদারনীকে বললাম, বেশতো কদিন আমার ঘরে শুতে দাও, প্রমাণ হোক ও ডাইনী নয়, তার পর আবার ওয়ার্ডে গিয়ে শোবে। বেঁধে গেল তাই নিয়ে তক্কাতক্কি। শেষে আমার প্রস্তাবে সায় দিল। শান্ত হলো সবাই।

এক একদিন সার বেঁধে সবাই বসে যেতাম ছেঁড়া কাপড় সেলাই করতে, নয়তো যাঁতা ঘুরিয়ে ডাব্জা ছোলা ভাঙতে। শুরু হতো তখন গাঁয়ের গল্প। কী যে তার অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি! শুনে শুনে যেন আর আশ মেটে না। সবাই চাষীর ঘরের মেয়ে, আর বড় গরীব। নিজেরা বাড়ি ঘর বাঁধতে পারে নি, থাকতো বাপ ঠাকুদ্দার তৈরী মাটির ঘরে। ওপরে খড়ে ছাওয়া চাল। বিয়ে তো হয়েছে সেই কোন্ ছোটবেলায়, তখনো যৌবনের ফুল ফোটেনি। ভারতে কিন্তু আইন করে বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ করা আছে। গাঁয়ে কি আর কেউ আইনের ধার ধারে! বর জুটিয়ে আনতো তৃতীয় আরেকজন, বিয়ে হতো, তারপর প্রথম মাসিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুরালয়ে গমন। স্বামীর সঙ্গে প্রথম দেখা বিয়ের দিনেই। এদের মধ্যে দু একজন যারা শহরে বা শহরতলীতে থাকে, দু একটা সিনেমা দেখেছে, ইওরোপীয় বিয়ের কায়দাকানুনের সঙ্গে তারা পরিচিত। এটাকে ওরা বলে 'লাভ ম্যারেজ'—খোদ ইংরিজীতেই বলে। ওদের ধারণা, এ ধরনের বিয়ে করতে পারে একমাত্র ছায়াছবির নায়ক নায়িকারা আর বড় ঘরের ছেলে মেয়েরা। সমাজ তো আর এজন্যে তাদের দোষ দেবে না। ওদের সমাজে এসব মেনে নিলে তো! মাথা খুঁড়ে মরলেও সমাজ এ বিয়েতে সায় দেবে না। সেই তো গিয়েছিল একটা মেয়ে পরপুরুষের সঙ্গে পালিয়ে। ফিরে যখন এলো, কত না হেনস্থা। প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো ভেড়ার রক্ত খেয়ে। তাতেও হলো না, গাধার পিঠে চাপিয়ে তাকে সারা গ্রাম ঘোরানো হলো, সবাই দেখলো। তাতেও শেষ নয়, তারপর স্ন্যাড়া করে দেওয়া হলো মাথা, একঘরে করে একটা একলাটে কুটীরে থাকতে দেওয়া হলো। তবে না পাপ খণ্ডন। আরো আছে। কোনো মেয়ের এরকম কিছু হলে সেই পরিবারের জাত মার যায়। জাতে উঠতে হলে তাকে জরিমানা দিতে হয় গ্রাম পঞ্চায়েতকে, গোটা গাঁয়ের লোককে নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াতে হয়। এই নেমন্তন্নের নাম জাতভাত, অর্থাৎ জাত ফিরে পাবার খাওয়া।

আর স্বামী মানে তো এক পরম শ্রদ্ধার বস্তু। তার নাম কি মুখে উচ্চারণ করা যায়। করা তো পাপ। পাপের ঠ্যালায় এদিকে জেল-কেরানী বাবুদের ভোগান্তির একশেষ। আদ্দেক ফর্মে স্বামীর নামের ঘর ফাঁকাই রেখে দিতে হয়। জিজ্ঞেস করলে মস্তবড় জিভ কাটে। শেষে অনেক পীড়াপীড়ির পর উপায় একটা বের হয়। বলবে নাম, তবে কাউকে শুনিয়ে নয়, কোন বৃদ্ধার কানে কানে। একবার মাত্র বলবে, যৎপরোনাস্তি ফিস ফিস করে। যা শুনবে বৃদ্ধা, সেটাই কেরাণীবাবুকে বলে দেবে। ফলে যা নয় তাই। শুনলো অস্পষ্ট খানিকটা শব্দ, বৃদ্ধা নিজের খুশীমতো বুদ্ধি খরচ করে সেই শব্দের ওপর নির্ভর করে বানিয়ে দিলো যাহোক একটা নাম। সেটাই বসে গেল ফাঁকা ঘরে। আর পাপেরও কি এখানে শেষ! আরো না কত আছে। ঘোমটা খুলবে পর পুরুষের সামনে—উঁহু, কক্ষনো নয়। শ্বশুরের সঙ্গে কথা বলবে—বাপরে বাপ, এর চেয়ে অপরাধ কি আর আছে। আর ভাসুর—ওর সামনে তো যাওয়াই পাপ!

প্রায় সকলেই অল্প বিস্তর স্বামীর হাতে মার খেয়েছে। তার জন্য ক্ষোভ নেই, কেননা এটা ওদের হিসেবে জীবনেরই একটা নিয়ম! একজন একবার স্বামীর পাতে নুন বেশি দিয়েছিল তাই সে মার খেয়েছে। আরেকজন দিয়েছিল ঠাণ্ডা ভাত, সেই অপরাধে স্বামী তাকে মেরেছে। এমন কর্তব্য পরায়ণ স্বামীর জন্যে কিন্তু দায়িত্বের অন্ত নেই। সে বাড়ি ফেরেনি, অথচ খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে তবু খাওয়া যাবে না। একজনকে মাসিকের কদিন নাকি বাড়ির পুরুষেরা বাড়ির মধ্যেই ঢুকতে দেয় নি, উঠোনের একধারে থাকতে হয়েছিল। এরই মধ্যে একটু যাদের পয়সাকড়ি আছে, সেই সব পুরুষেরা বাড়ির বৌকে বাড়ির বাইরে মোটে বেরোতেই দেয় না। এটা গরীবদেরও নিয়ম। তবে কিনা উপায় নেই। পেটের তাগিদে কাজ করতে মাঠে ঘাটে যেতেই হয়, তারা বাধ্য হয়ে সায় দেয়। বেশির ভাগ স্বামীরই পত্নীর সংখ্যা একাধিক। বড় ভাই মারা গেলে তার বৌকে এরা নিজের বৌ করে নেয়।

একটু একটু করে আমিও ওদের আচার আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়লাম। করবো কি, ওরা তো আর পাশ্চাত্য নিয়ম কানুন জানে না, যদি আমার ভিন দেশী আচরণ দেখে আমাকে এক ঘরে করে দেয়! অতএব পুরুষবন্দী বা জেল সিপাইয়ের সামনে জোরে হাসা বা জোরে জোরে কথা বলা বন্ধ হলো। বন্ধ না করাটাই 'নির্লজ্জ বেহায়াপনা।' মাসিকের সময় বাগানে

যাওয়া বন্ধ করলাম। বলা যায় না, গেলে ফলে পোকা লাগলে যদি আমাকে সবাই দোষ দেয়।। সিঁথিতে সিন্দুর দেওয়াও শিখে নিলাম। অর্থাৎ পরিষ্কার— আমি বিবাহিতা, আমার আর স্বামীর দরকার নেই।

ডিসেম্বরের গোড়ায় লাগলো পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ। লাগবে, এটাই ঠিক ছিলো। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায় একটার পর একটা এরোপ্লেন, সবাই বেরিয়ে আসে ওয়ার্ড থেকে, মুখ তুলে যতক্ষণ দেখা যায় দেখে। বাইরের আলোগুলোর মাথায় টিনের ঠুলি পরানো হলো। সারা রাত ধরে শুনতাম রাস্তা দিয়ে লরী ছুটে যাওয়ার আওয়াজ। সতেরো দিন পর সব শেষ। যুদ্ধ খতম। যুদ্ধে ভারত জিতেছে। যুদ্ধবাজ :কাগজগুলো অমনি দেখি সুর পালটে সবাই 'শত্রু'র পরাজয় আর ভারতের জয় নিয়ে মাখো মাখো সব লেখা লিখতে শুরু করে দিয়েছে। যুদ্ধ শেষ, তবু ভারতীয় সৈন্য পূর্ব-বঙ্গে মোতায়েন রইলো, পাকিস্তানী বন্দীদের নিয়ে আসা হলো ভারতে, ঝাড়া দুটি বছর তাদের আটক রাখা হলো।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার কদিন পরেই বদলীর খবর। রোহিণী সৈবুন্নিসা আর পান্নোকে ভাগলপুর জেলে যেতে হলো। শুধু মেয়ে কয়েদীদের জন্যেই নাকি বিহারের ঐ জেল। আরেকজনেরও বদলী হবার কথা ছিল। কিন্তু হলো না। তার পরিচিত এক বন্দী ছোট জেলারকে পঁয়ষট্টি টাকা ঘুষ দিয়ে বদলী রদ করলো। বন্দিনীর বাড়ি হাজারিবাগে। পাঁচ বছরের মেয়াদ। আর তো কটা দিন, নয় এখানেই কাটিয়ে দেবে। বদলী রদ হবার আর একটি কারণ, সে তার ছ বছরের শিশু কন্যার সঙ্গে ইতিমধ্যেই এক কয়েদীর ছেলের বিয়ের কথাবার্তা প্রায় পাকা করে ফেলেছে।

রোহিণী চলে যাবার পর শুনলাম, রোহিণী নাকি অফিস বাবুর কাছে জেলে ঢুকবার সময় রূপোর মল আর বালা জমা রেখেছিল, ফেরৎ চেয়েছে। কিন্তু পায় নি। বিস্তর খোঁজ করেও নাকি তার হদিশ মেলে নি। অফিস বাবু আশ্বাস দিয়েছে, পরে ভাগলপুর জেলে সব পাঠিয়ে দেবে। আর কি পাঠায়! দেবার হলে তখনই দিয়ে দিতো। শুনেছি নাকি দিয়ে দেয়ও। তবে না দেবার ঘটনা এই প্রথম শুনলাম।

রোহিণী চলে যাবার কদিন পর অমলেন্দুর একটা চিঠি পেলাম। পোষ্ট কার্ডে লেখা। লিখেছে কলকাতার আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে। আমার কাছে গোটা ব্যাপারটাই অপ্রত্যাশিত। জবাব দেবার ভারী ইচ্ছে হলো। কিন্তু দিয়ে কি লাভ! ওরা কি আর সে চিঠি বাইরে যেতে দেবে! চিঠিখানা বে

কেরাণীবাবুটি দিল, সে-ই আমাকে প্রথম দিন পুরুষ বলে ঠাউরেছিল। এতো দিনে তার মনেও বোধহয় আমার জন্য একটু দরদ জমেছে। নইলে চিঠি দেবার সময় তারই বা চোখে মুখে অমন আনন্দের ছোঁয়া কেন আসবে! অমলেন্দুর বাবাও লিখেছেন, আরেকখানা চিঠি। লিখেছেন, কলকাতার জেলে অবস্থা নাকি আমাদের এখানকার চেয়েও খারাপ। অমলেন্দু লিখেছে কাঠ কাঠ কয়েকটা কথা। এছাড়া অন্য কিছু লেখার উপায়ও নেই। না থাক, তবু এই আমার কাছে প্রেমপত্র। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার নানারকম ভাবে পড়লাম। এর পর বাকী সাড়ে তিন বছরে ওর আরো তিনখানা পোষ্টকার্ড আমার নামে এসেছে। একটাও পাই নি।

চলে গেল রোহিণী আর সৈবুন্নিসা। আবার সেই শূন্যতা। সেই মন-ফাঁকা বুক-ফাঁকা একটা অনুভূতি। জেলখানায় এসে কাউকে ভালবাসার বুঝি এই জ্বালা। জ্বালা জুড়িয়ে দিলো মোহিনী—আমার নতুন মা। ঠাণ্ডা মেঝেয় বসতে বারণ করা থেকে শুরু করে আমার রান্না করে দেওয়া, আমার যত্ন আত্তি করা সবই করতো। কাঁধ সমান লম্বা হয়েছে এতদিনে আমার চুল। লাইফবয় সাবান ঘষে ঘষে হাল যেন শনের নুড়ী। রাত্তিরে চাপড়ে চাপড়ে আমার মাথায় নারকোল তেল মাখিয়ে দিতো। বলতো, বাড়িতেও নাকি এই ভাবে তেল মাখাতো মেয়ের মাথায়।

কল্পনা চলে যাবার পর থেকে রান্না বান্না করতে আর মন চায় না। ভালোই লাগে না মোটে। রাঁধতো মোহিনী। আমি খেতাম। পাক্কা বিহারী খানা—কখনো বা আটা আর নুন মিশিয়ে একটা ঘেঁাট মতো, কখনো চাল ডাল আলু মিলিয়ে খিচুড়ী। দুটোই গুরুপাক এবং প্রচুর পরিমাণে শর্করা জাতীয় খাদ্যপ্রাণে ভরপুর। অবাক কাণ্ড, খেয়ে কিন্তু আমার একটুও চর্বি হয়নি বা ওজন বাড়ে নি। মাঝে মাঝে পায়রা ধরতো নাগো, কাটতো, রাঁধতো, একটু ঝোল এনে দিতো পাতে, আয়েস করে খেতাম। আবার কখনো কোন জমাদারনী দিলো হয়তো এক টুকরো মাছ—বা একটা কলা। নয়তো একটু চ্যানাচুর, কি ভাজাভুজি। তাতেও মুখের স্বাদ বদলাতো। এখানকার খাওয়া তো বড্ড একঘেয়ে। কারুর কারুর জন্যে বাইরে থেকে খাবার আসারও বন্দোবস্ত ছিলো। তা-ও এমন একটা হাতিঘোড়া কিছু নয়। হয় ভাত, নয় ভুট্টা, নয়তো জোয়ার। সংখ্যায় তিন হলেও কি একঘেয়েমি যায়!

চা এখানে বড় লোকের খাবার। চা জোটাবার সঙ্গতি সবার নেই। আমি যে সকালে ঘুম থেকে উঠে এক কাপ চায়ের প্রয়োজন অনুভব করি, ওরা

তাতে অবাক হয়। আমিও হই। চা তো ভারতেরই অন্যতম প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। ব্যাপক জায়গা জুড়ে চায়ের চাষ হয়। সেই চা কিনা এখানকার মানুষেরই নাগালের বাইরে! খেতে পায় না সবাই। মাঝে মাঝে সবাই মিলে যখন চায়ের বাটি হাতে বসে যেতাম, কেউ কেউ বলতো, বড় খারাপ নেশা ধরিয়ে দিচ্ছি আমি। এখান থেকে বেরোবার পর তো নেশাটাই থাকবে, নেশা সামাল দেবার পয়সা কোথায়।

বাগানে আবার নতুন করে চাষবাস হলো। চাষ করলো খেটেখুটে বন্দীরা, ফসল কিন্তু ভাগাভাগি করে নিলো মেটিনী আর জমাদারনীর দল। আমি ছাড়িনি, মাঝে মাঝে ইচ্ছেমতো দু চারটে ফসল তুলে এনেছি। এতে নাগো খুব অসন্তুষ্ট। বললো, ফসল খাবার ইচ্ছে হলে আমি নিজের ঘরের সামনে জমিতেই চাষ করে নিতে পারি। তখন রসুন বসালাম, টমেটো চারা পুঁতলাম, কটা ধনেও একপাশে ছড়িয়ে দিলাম। ২৫শে ডিসেম্বরের আগে তুলে আনলাম কটা পাকা দেখে টমেটো, কম্বল চাপা দিয়ে রাখলাম, যাতে গায়ের আর কম্বলের গরমে বেশ টুকটুকে লাল হয়। কতদিন যে টমেটো খাইনি! তা পিঠের চাপে গলে টলে সে তো যাচ্ছেতাই অবস্থা। হলো আমার লাল টুকটুকে টমেটো খাওয়া। কটা শালগমও হয়েছিল। তুলে রেখে দিতাম আর শীতের রাত্তিরে ঘুম থেকে উঠে খেতাম। রাত যেন আর ফুরোতে চায় না। আমার তো খিদে পেয়ে যায়। ঐ একটা দুটো চিবিয়ে খেয়ে আবার শুয়ে পড়ি। আগে তো কখনো খাইনি বা খুব একটা পছন্দও করতাম না। এখন আর মন্দ লাগে না। চিবিয়ে বেশ আরাম পাই।

সে যাই হোক বাগানটাই হলো আমার ধ্যান জ্ঞান চিন্তা। কী যে আনন্দ বাগান করতে! সবুজে দুচোখ যেন জুড়িয়ে যায়। কাজের মতো কাজও বটে। শীতকাল চাষবাসের আদর্শ সময়। মাটি খুঁড়তাম, আগাছা পরিষ্কার করতাম, জল দিতাম—সে কতরকমের কাজ। সেই যখন ছোটবেলা ইস্কুলে পড়তাম, তারপর এই এতো বছর পরে আবার এসব করছি। টমেটো যখন পাকলো, সে যা অপরূপ দেখতে! ছোটরা এসে তুলে নিয়ে যেতো পাকা ফল; সবাইকে ভাগ করে দিতো। তৈরী হলো টমেটোর চাটনী। দারুণ! সেই একঘেয়ে মুলো, শালগম আর ফুলকপি—এর মধ্যে চাটনীটা যেন একটা রীতিমতো ব্যতিক্রম। দিনে দুবার করে সবার পাতে পড়তো। মাটি এখানকার এতো উর্বর! ফসল ফলে ইংল্যাণ্ডের চেয়ে ঢের তাড়াতাড়ি। শুধু জলটাই সমস্যা। অর্থাৎ জলের যোগান। কোথায় পাবো এতো জল!

খ্রীষ্টের জন্মদিনে খানিকটা পুডিং বানালাম চাল জলে সেদ্ধ করে তার লেই দিয়ে। জমাদারনীকে অনেক বলে কয়ে বাইরে থেকে কটা মেঠাই আনালাম। ছোটদের ডেকে আনলাম আমার ঘরে, সারবন্দী বসিয়ে সবাইকে খেতে দিলাম। কী আনন্দ সবার! মনে পড়লো ইংল্যাণ্ডের কথা। সেখানে এইদিন কত মেঠাই আর কত উপহারের ছড়াছড়ি। বাচ্চাদের অফুরান খুশী। তবেই তো খ্রীষ্টের জন্মদিন উদ্‌যাপনের সার্থকতা। আর এখানে—হায়রে শিশুর দল, চাল সেদ্ধ পুডিং আর দোকানের কেনা মেঠাই খাইয়ে সন্তুষ্ট করছি তোদের, তাতেই তোরা খুশী। কিন্তু আমি যে হাজার চেষ্টা করেও পারছি না খুশী হতে।

প্রকাশকে দেখছি। ওকে নিয়েই আমার যত চিন্তা। আমাকে ডাকে 'মেরী গুড' বলে। আমার নাম বাদ দিলে এই একটি মাত্র ইংরাজী শব্দ ও জানে। ওর কথা শুনে বাকীরাও আমাকে ঐ নামেই ডাকে। ছেলেটা এতো দুর্বল! একে খোঁড়া মা, তার ওপর জেলে আসার পর থেকে বাবা আর এ-পথ মাড়ায়ও না। প্রথম যখন এসেছিল বিষ্ণী, প্রকাশের বয়েস দু দিন। আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে কিন্তু শরীরটা সারছে না। পেটটা এই এত্তো বড়। বিস্তর দেখেছে শুনেছে ডাক্তার, কিন্তু কোন রোগই নাকি ধরা পড়েনি। অথচ রোজই প্রায় জ্বর হয়। ছোটাছুটি করে সবার সঙ্গে, তেমন খেলাধূলোও করতে পারে না। ছুটলে একটু পরেই হাঁপিয়ে ওঠে, বুকটা ধড়াস ধড়াস করে হাঁপরের মতো।

এদিকে কিন্তু ভীষণ গম্ভীর প্রকৃতির আর মনোযোগী। আমি হয়তো বসে বসে ব্রিটিশ কনসালের তদ্বিরে আনা একখানা বাংলা বই পড়বার চেষ্টা করছি, ও আমার পাশে শান্তশিষ্ট হয়ে বসে রিডার্স ডাইজেস্টের পাতা ওলটাতো শুরু করলো। ভাবভঙ্গী এমন, হঠাৎ করে দেখলে মনে হবে, যেন সত্যিসত্যি পড়ছে। মানুষের ছবিটবি দেখলে নিজেও চেষ্টা করে সেইরকম মুখভঙ্গী করার। রং খুব ভালবাসে। কখনো কখনো ছেঁড়া এক টুকরো কম্বল এনে বলে, দাওনা আমাকে একটা ফুল সেলাই করে। এতো ভাল লাগতো ওকে, মাঝে মাঝে ভাবতাম ওকে ওর মার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে নিই; ওকে মানুষ করি নিজের মতো করে। পরক্ষণেই মনে হতো, নিজেরই যার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, সে আবার অন্যকে নিয়ে কি করবে। ওর মা অবিশ্যি মাঝে মাঝেই বলতো, ওকে তুমি নিয়ে নাও। বলতো নিজের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে। দু বছর বিনা বিচারে জেলখানায় আটক হয়ে আছে, এখনও পুলিস এজাহার দিল না। পাঁচ বছর পর জেল থেকে বেরোবার সময় আমি একই

অবস্থা দেখে এসেছি। পুলিসের এজাহার তখনও মেলেনি। এদিকে প্রকাশ ছ বছরে পা দিলো।

সারা জেলখানায় যেহেতু আমি একমাত্র শিক্ষিতা মহিলা, অযাচিত সম্মান সৌভাগ্য তাই ভালরকমই পেতাম। নতুন বন্দীরা এসে প্রথম প্রথম আমাকেই ভাবতো জেল সুপার, কেউ কেউ জানতে চাইতো আমার রোজগার কতো। বেঙিয়া বলে এক বন্দী অন্য জেল থেকে বদলী হয়ে আমাদের এখানে এসেছিল। একদিন বলে কিনা আমার হাতটা দেখে দাও তো। বেঙিয়ার ধারণা, পুঁথিপত্র যার কাছেই থাকে সে জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী। সুতরাং নিশ্চয় আমিও হাত দেখে ভবিষ্যৎ গণনা করতে পারি। একটি মাত্র প্রশ্নের উত্তর পেতে চায়। ডাকাতদলের একজনকে সে ভালবাসে। জানতে চায়, সে-ও তাকে অনুরূপ ভালবাসে কিনা বা ভবিষ্যতে বাসবে কিনা। ধরা পড়লো তো তারই জন্য। পুলিস দুটো চোরাই শাড়ী তার বাড়িতে দেখতে পায়, জানতে চায় কোত্থেকে পেলো সেই শাড়ী, সে কিছুতেই তার নাম বলে না, ফলে পুলিস তাকেই গ্রেপ্তার করে। বেশিদিন বেঙিয়া আমাদের সঙ্গে থাকে নি। কিছুদিন পরেই তার ধানবাদ জেলে বদলী হওয়ার হুকুম আসে। বদলীর দিন হঠাৎ তুমুল ঝগড়া। দুই প্রতিপক্ষ বেঙিয়া আর বিষ্ণী। কি ব্যাপার—না, বেঙিয়া বিষ্ণীকে দুটো টাকা দিয়েছিল, পুরুষ মহলে নাকি এক কয়েদী আছে, সে ভোজবাজি জানে—টাকা দিয়েছিল ভোজবাজি ফলিয়ে বেঙিয়ার ভালবাসার মানুষকে ফের বেঙিয়ার কাছে ফিরিয়ে দেবে বলে, পারে নি। তাই বেঙিয়া এখন টাকা ফেরৎ চাইছে। বিষ্ণী যত বলে, বাজীর ঘোর এখনো কাটে নি, এখনো সময় আছে, মাঝখান থেকে বেঙিয়া বদলী হয়ে যাচ্ছে এই যা অসুবিধে —কে শোনে কার কথা। তার এক গোঁ, টাকা ফেরৎ চাই-ই চাই। তাই দেওয়া হলো। তবে শান্তি। নিশ্চিন্তে চলে গেল বেঙিয়া।

৭২ এর গোড়ার দিকে এলো এক সাঁওতাল রমণী, কোলে একটি শিশু। শুনলাম খুনের অভিযোগে স্বামী স্ত্রী দুজনেই নাকি ওরা আটক। ঘটনাটা জানলাম আরো কিছুদিন পর। গত বছর ফসল ভালো হয় নি, স্থানীয় এক মহাজনের কাছ থেকে তারা কিছু হাওলাত করতে বাধ্য হয়। গ্রামে মহাজনের জমিজিরেত প্রচুর। প্রত্যেক মাসে হাজির হতো তার মুন্সী, মাসিক শতকরা সাড়ে বারো টাকা হারে গুণে গুণে সুদের টাকা নিয়ে যেতো। একদিন এসেছে এমন সময়, স্বামী তখন কাজে গেছে। এদিকে বাড়িতে টাকাও নেই। বাধ্য হয়ে মেয়েটি বললো, মুন্সী যেন পরে আরেকবার আসে। কিছুতেই নড়বে না হতচ্ছাড়া।

বলে স্থদ চায় না, সহবাস করতে চায়। কেন করবে সে, তার তো ইচ্ছে অনিচ্ছে বলেও একটা ব্যাপার আছে! এদিকে মুন্সীও ছাড়বে না। শেষে জবরদস্তি জাপটে ধরলো। ঠিক তক্ষুনি স্বামীও ফিরে এসেছে। ঐ অবস্থায় দেখতে পেয়ে রাগ আর সামলাতে পারলো না, মুন্সিকে জান দিতে হলো। ব্যস্, তারপরই গ্রেপ্তার।

বাহাত্তরের ফেব্রুয়ারীতে ডেপুটি হাই কমিশন অফিস থেকে কনসাল এলো ফের আমায় সঙ্গে দেখা করতে। চার পাঁচ মাস অন্তর অন্তর একবার করে আসে, আমি তাকে আমার নানান টুকিটাকি জিনিস আনার কথা বলে দিই। আগেরবার বলেছিলাম এমব্রয়ডারী স্থতো আনতে, আনে নি। বললো, স্থতোর ব্যাপারে নাকি তার জ্ঞান খুবই কম। দুটো পেন্সিল এনেছে, তাতে 'মহামান্য সরকারের সম্পত্তি' লেখা ছাপ, আর এনেছে একটা শর্টহ্যাণ্ড লেখার খাতা। এতোদিনে এই প্রথম আমি লেখালেখির জিনিস সঙ্গে রাখার অনুমতি পেলাম। একটা হিন্দী ডিক্সনারীর কথাও বলে দিয়েছিলাম, হিন্দী দৈনিক সংবাদপত্র পড়ার স্থবিধের জন্যে। কলকাতার বইয়ের দোকানেই পাওয়া যায়, সে খুঁজে পেতেও নাকি জোগাড় করতে পারে নি। আসলে বুঝেছিলই ভুল। সে ধরে নিয়েছে, আমি বোধহয় রোমান থেকে লেখা হিন্দী ডিক্সনারীর কথা বলেছি। ইতিমধ্যে হিন্দী লিপি যে আমার রপ্ত হয়ে গেছে, অক্ষর টক্ষর সবই যে আমি চিনি, এটা ভুলেও মাথায় ঢোকে নি। তবে শুধু চিনলেই তো চলবে না, শিখতে হবে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ, তবেই তো ভাষা শেখার সার্থকতা। এমনভাবে শিখবো, যাতে একটা অনামী অখ্যাত স্টেশনের নাম আমি পড়তে পারি। তার মানে বুঝতে পারি—তবেই না শেখা। এতোটা নির্ঘাৎ কনসাল মহোদয়ের মগজে খেলে নি। ক দিনই বা থাকবে এদেশে, কি লাভ এদেশের অন্ধি সন্ধি নিয়ে মাথা ঘামাবার—এমনই একটা নিস্পৃহ ভাব দেখি তাদের সবার মধ্যেই কাজ করে।

এই প্রথমবার কনসালের কাছে একটা অদ্ভুত আব্দার জানালাম। বললাম, আমার বাবা যে টাকা ইংল্যাণ্ড থেকে আমার খরচ খরচা বাবদ নিয়মিত পাঠান, তার থেকে অন্ততঃ এক পাউণ্ডের সমান টাকা সে যেন স্থপারের কাছে আমার নামে জমা দেয়। প্রকাশের কথা ভেবেই কথাটা বলা। ফুল তুলে দিতে বলেছিল আমাকে, তার জন্য এমব্রয়ডারী স্থতো কিনতে লাগবে। এছাড়া আর কি হবে আমার টাকা দিয়ে। টাকা যা দরকার আমি তো রেশন বেচেই উশুল করে নিই। বাবার টাকা নেবো বা অমলেন্দুর বাবা আমার জামা কাপড়ের

জন্য এটা ওটা টুকিটাকির জন্য টাকা খরচ করবেন—ভাবতেও যেন কেমন অসোয়াস্তি লাগে।' এমন নয় যে চাইলে ওরা টাকা দেবেন না। কিন্তু তাতে যদি কর্তৃপক্ষ আপত্তি তোলে। তোলাটাই স্বাভাবিক, কেননা বন্দীদের জন্য বাইরে থেকে টাকা পয়সা পাঠানোর রেওয়াজ নেই। আমার বাবা তো একবার আসতে চেয়েছিলেন। আমি বারণ করেছি। কি হবে অতদূর থেকে এখানে এসে! বরং যে দৃশ্য দেখে যাবেন, তাতে তো ফিরে গিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তা আরো বাড়বে। এতোটুকু সাহায্যও তো করতে পারবেন না। হাজার হাজার মাইল উজিয়ে এসে বড়জোর এক ঘন্টার সাক্ষাৎকার। লাভ কি তাতে। নয় এমন দেখা না-ই বা হলো।

সে বছরই শীতে এক বৃদ্ধাকে ধরাধরি করে দুই জেল-সিপাই তুলে দিয়ে গেল আমাদের ওয়ার্ডে। কোন্ এক ছোট জেল থেকে বদলী হয়ে এসেছে। সেখানে চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই। এখানে এনে ফেললো। যদি বাঁচে তো ভালো, নয় মরবে। রোগটা আমাশা। দীর্ঘদিনের ব্যাধি। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে এখন আর হাঁটতে পারে না, পায়খানার বেগ এলে কাপড় চোপড় নষ্ট করে। যাবে যে কোনক্রমে পায়খানা অব্দি, সে শক্তিটুকুও নেই। এনে যখন ফেললো তখনও তার কাপড় চোপড় নোংরা। কেউ ঘেঁসতে চায় না কাছে। আমিও যে খুব আগ্রহী তা নয়, তবু এটুকু বুঝলাম, কিছু একটা করা দরকার। আমাদের অবহেলায় আমাদেরই একজন সাথী চোখের সামনে মরবে, এটা তো সহ্য করা যায় না। ডাক্তার ওষুধ দিচ্ছে, কিন্তু সঙ্গে তো পরিচর্যাটাও দরকার। শুরু হলো সেবা। একটা পুরনো কলসীতে করে এক হপ্তা যাবৎ আমি একলা রোজ তার নোংরা জামা কাপড় জলে ফুটিয়ে কেচে শুকিয়ে দিতাম। চান করাতাম রোজ, মাথা বোঝাই বহুদিনের অযত্ন লালিত উকুন—দিতাম আচ্ছাসে মোম দিয়ে ঘষে। মোহিনীও এসে আমার সঙ্গে যোগ দিলো। এলো আরো কয়েকজন। বুঝে গেছে যে সবাই, সেবা শুশ্রূষায় মৃত্যুপথ যাত্রীকেও মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনা যায়। দিন পনেরো কাটতে না কাটতে সে ভালোর দিকে। মাটি ঘসটে ঘসটে নিজের চেষ্টায় আসতে পারে, আমার ঘর অব্দি। আমি কানে একটু তেল দিয়ে দিই। নয়তো পিঠটা একটু ডলে দিই কিংবা নোখ টোখ কাটার দরকার হলে কেটে দিই। নোখ কাটতাম বাগানে কুড়িয়ে পাওয়া একটা জং ধরা ব্লেড দিয়ে। এক মাস কাটতে না কাটতে সে পুরোপুরি সুস্থ। দিব্যি ওজন বেড়েছে। চোখে মুখে হাসি যেন উপচে পড়েছে। আমাদের প্রত্যেকের প্রতি ইঞ্চি চেষ্টাই এক্ষেত্রে সফল। এই তো

চেয়েছিলাম আমরা। বদলী হবার দিন অব্দি যেতে বসেই আমাকে ডাকতো। একটু না একটু কিছু না খাইয়ে ছাড়তো না। এ একেবারে রোজকার নিয়ম। আমার নাম দিয়েছিল 'সফেদী'। আমি কিনা খুব ফর্সা, তাই।

ভাবলাম, তাইতো, অসুখ বিসুখ তো নিত্যসঙ্গী, আচ্ছা, যদি আমি দু একটা দরকারী ওষুধের ব্যবহার শিখে নিই! কদিন ধরে বেশ চেষ্টা চরিত্র করলাম। কিন্তু কিসের কি—ডাক্তারী বই কোথায়! এক বছর পর আমার লণ্ডনস্থ বন্ধু রুথ ফষ্টারের প্রচেষ্টায় একখানা বই এসে পৌঁছুলো। কিন্তু লাভ কিছুই হলো না। যেরকম অসুখ এখানে আমার চৌহদ্দির মধ্যে হামেশা হয়, তার যা পরিবেশ এবং অন্যান্য লক্ষণ, এ বইতে সেরকম অসুখের বিবরণ নেই। ফলে সেখানেই থামতে হলো। এরকমভাবে আরো কত যে পরিকল্পনা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি তার আর ইয়ত্তা নেই। লাইব্রেরীতে বই নেই, বাইরের দোকান থেকে বই কেনা চলবে না—তো কিভাবে সফল করবো আমার পরিকল্পনা। আর বারবার ঐ নিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর, লেখালেখি—কতক্ষণই বা ধৈর্য্য থাকে।

'টাইমস্' পেতাম দেরী করে, আসতোও অনিয়মিতভাবে। তবু মনের যা খোরাক ওতেই মেটাতাম। বিশেষ করে দুনিয়ার বাঘা বাঘা খবর তো পড়তে পাই। ভিয়েতনামে তখন জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠিত হয়েছে। ভারী উল্লাস জাগতো মনে। যাক্, এতোদিন পর সত্যের জয় হতে চলেছে। এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কি থাকতে পারে। শুধু টাইমস্ বলে নয়। ভারতের কাগজেও মাঝে মাঝে তাৎপর্য-পূর্ণ খবর পাই। পনেরো মাসে কলকাতায় ১৯৯ জন পুলিসের গুলিতে মারা গেছে। ভাগলপুর জেলের এক ঘটনায় দশজন ছাত্র নিহত এবং ১৬০ জন আহত হয়েছে। যথারীতি এখানেও বুলেট। এদিকে মার্চের নির্বাচনে কংগ্রেসের জয় জয়কার। আমার অবিশ্যি তাতে কিছুই আসে যায় না। একফোঁটা আনন্দও আমি পাই নি। এক জমাদারনী বললো, তার স্বামী কংগ্রেসের হয়ে ভোট দিয়ে পনেরো টাকা পেয়েছে। আর পাশাপাশি আমাদের জেলখানার পাঁচিল মেরামত করছে যে শ্রমিকরা, রোদে পিঠ যাচ্ছে পুড়ে, তাদের মজুরী দিনান্তে দু টাকা মাত্র। কর ফাঁকি রুখতে সেবার কংগ্রেসী বাজেটে উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের দেয় করের হার কমিয়ে দেওয়া হলো। পাশাপাশি কেরোসিনের দাম বাড়লো, কারণ দেখানো হলো বাংলা দেশ থেকে লাখে লাখে উদ্বাস্তুর আগমন। দাম না বাড়ালে ঐ বিপুল ব্যয় সরকার বহন করবে কি করে। অথচ কেরোসিন ভারতের একটি অতি আবশ্যকীয় পণ্য। বহু গ্রামে

বিজলী বাতি নেই। সেখানকার মানুষ কেরোসিন না পেলে অন্ধকারে থাকবে।

অমলেন্দু আর কল্পনা চলে যাবার পর পুরুষ বিভাগের কিছু নকশাল বন্দী আমার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতো। যোগাযোগ বলতে জেলের নিয়ম কানুন বাঁচিয়ে যতটুকু যা সম্ভব। আমাকে নিয়ে বড্ড দুশ্চিন্তা করতো। আমি একলা,—সঙ্গী নেই সাথী নেই, ফলে আবার না মনমরা হয়ে পড়ি। প্রায়ই চোরাগোপ্তা চিঠি পাঠাতো। আমার অগোচরেই জেল সিপাইরা তাদের আমার সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করতো। একদিন তো একখানা চিঠি পেয়ে অবাক, লিখেছে—ভারত এবং ভারতবাসীর জন্য আমার আত্মত্যাগের তুলনা হয় না। জানিনা কতটুকু কি করেছি, তার রেশ গিয়ে পেঁৗছেছে জেলখানার মেয়ে মহলের দেয়াল ডিঙিয়ে ওপারে। তবে এটুকু বুঝি, অনেক কিছু করা দরকার, আরো অনেক কিছু করতে হবে ; যাতে কারুর এতোটুকুও উপকার হয়।

একাত্তরের মাঝামাঝি নকশাল আন্দোলনে ভাঙন ধরলো। ওরা আমার কাগজে এই বিশেষ সংবাদটি কালির দাগ দিয়ে ভরাট করলো না। যথেষ্ট সন্দেহ ছিল গোড়ার দিকে, কিন্তু গোপন চিঠিতে জানলাম, সন্দেহ অমূলক। ৭০ সাল থেকে ক্রমান্বয় বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে পার্টির মধ্যে তুমুল তাত্ত্বিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। আলোচনা করার মতো অনেক কিছুই আছে যে সব ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পেঁৗছুতে যথেষ্ট সময় লাগবে। ইতিমধ্যে পার্টি নানান গ্রুপে বিভক্ত হয়ে দেশের নানান জায়গায় নিজের নিজের মতো কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে।

যে কয়েদী আমার পায়খানা পরিষ্কার করতে আসতো সে বললো আমার সঙ্গে যারা গ্রেপ্তার হয়েছিল তাদের একজনের নাকি যক্ষা হয়েছে। সে-ই আরেকদিন আমার কানে কানে বললো, সে ম্যাজিক জানে, আমি যদি যে কোর্টে আমার মামলা বকেয়া পড়ে আছে তার হাকিমের নাম ঠিকানা দিই, সে আমার জামিনের ব্যবস্থা করবে। কথাটা কয়েকটি মেয়েকে বললাম পরিহাসছলে। শুনে তো ওদের সে কী কাতর অনুনয়-বিনয়! এমন সুযোগ আমি যেন হেলায় না হারাই। ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে এখানে, ভোজবাজিতে বন্দী খালাস হয়ে যায়। একজন নাকি এমনভাবে একবার হাকিমের দিকে তাকিয়েছিল, হাকিম তাকে খুনী জানা সত্বেও খালাস করে দিতে বাধ্য হয়। ভোজ বাজির এমনই মহিমা।

দেয়ালের ওপাশেই পুরুষ মহল, কাজে কর্মে আসতো বলে দু চারজনকে দেখতাম, বাকীরা চোখের আড়ালেই থেকে যেতো। রাত্রে শুনতাম তাদের গান। মাসে অষ্টপ্রহর আসর বসাতো, চলতো একের পর এক কীর্তন। তালে

তালে বাজি বাজতো অ্যালুমিনিয়ামের থালায়। এক একটা গান শেষ হয় আর বাজনার আওয়াজ বাড়ে। টানা চব্বিশ ঘণ্টা এই একই রকম। লিওনী বলতো, 'অচ্ছুৎ' বন্দীরা নাকি গানের সঙ্গে মেয়ে সেজে নাচে। নাচের লোককে এক ওয়ার্ড থেকে দরকার মতো আরেক ওয়ার্ডে আনবার জন্য নাকি জেল-সিপাইকে ঘুষ দিতে হয়। জেলের বাইরেও মেয়ে সেজে যে সব পুরুষ নাচ দেখায়, তারা নাকি সব এই অচ্ছুৎ সম্প্রদায়ের।

কথা বলতে পারতাম না একজনের সঙ্গেও। দু একটা ছুটকো ছাটকা মন্তব্য, ব্যস্ এর বাইরে আর কিছু নয়। ওরা আসতো, কাজ করতো, চলে যেতো। যতক্ষণ না যায়, জমাদারনী চোখে চোখে রাখতো আমাদের। আহারে, কী মায়া লাগতো যে মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে! চোখ কোটরে বসা, গালের হনু দেখা যাচ্ছে, হাড় জিরজিরে দেহ—ওদেরই পালা করে পাঠায় রোজ আরো খাটুনির জন্যে। যারা কর্তৃপক্ষের পেয়ারের লোক, গা গতরে বেশ পুরুষ্টু, তারা বসে বসে বিশ্রাম নেয়। ইচ্ছে হতো ওদের সঙ্গে কথা বলি অনেকক্ষণ, ওদের বাড়ির কথা, পরিবারের কথা, মামলার কথা সব জানি। কিন্তু উপায় কি। জমাদারনী কটমট করে তাকিয়ে আছে যে। ইচ্ছে থাকলেও কি আর উপায় আছে।

লণ্ডন থেকে চিঠি এলো—মা নাকি খুব অসুস্থ। বাবা লিখেছেন, মা'র হার্ট অপারেশন হবে, তাই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। দিনের বেলা হাজার রকমের কাজ, মাকে নিয়ে তেমন একটা ভাববার সময়ও পেতাম না। রাত্রেই যত গোল। চুপচাপ বসে বসে ভাবতাম আর ভাবতাম আর চোখ বুজতেই দেখতাম একের পর এক স্বপ্ন। স্বপ্নে ভারত আর ইংল্যাণ্ড মিলে একাকার হয়ে যেতো। দেখতাম, এসেক্সে আমাদের খাবার ঘরে বাবা মার সঙ্গে গোল হয়ে বসে আছে আমার সহবন্দিনীর দল, বা একটা পার্শেল এসেছে আমার নামে, খুলে দেখি তাতে ইংল্যাণ্ড আর এদেশের খাবার মিলে মিশে গেছে। তবে কি আমার অবচেতন মনও জানে না কোন্‌টা আমার স্বদেশ? হয়তো জানে। বা না-ও জানতে পারে। আমি কিন্তু চাই অসম্ভবকে সম্ভব করতে। দুটো দেশকেই আমি এক সূত্রে মেলাতে চাই!

-বাহাত্তরের মার্চে গোড়ার দিকে অমলেন্দুর বাবা মা ফের আমাকে দেখতে এলেন। এবার আর অফিসঘর অব্দি পৌঁছুবার অনুমতি মিললো না, তারের জালের বাইরে ওঁরা, আমি এপাশে, ভেতরে। কী যে উদ্বেগ দু জোড়া চোখে। দেখছেন, আমার শরীর ভেঙেছে কিনা, ওজন কমেছে কিনা, অর্থাৎ দূর থেকে অনুমান কবার চেষ্টা করছেন। ওঁদের কাছেই শুনলাম অমলেন্দু এবং আরো ষোলো জনকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং বলা যায় না কতদিন ওদের হাজত খাটতে হবে। কেননা আইনগত বিধি নিষেধের ঝামেলা এড়াবার ব্যাপারে কলকাতা কর্তৃপক্ষ বিহার কর্তৃপক্ষের মতোই গা-আলগা। ফলে আমাদের মামলা উঠতে দেরী হবে। ওঁরা আমার জামিনের জন্য আবেদন করতে চান। ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারায় আছে, নারী বন্দীদের জামিন গ্রাহ্য হবে তা সে অভিযেগে যা-ই হোক না কেন। সুতরাং কাগজ পত্রে সই সাবুদ করে দিলাম। এক উকিলকে দিলাম আমার হয়ে আবেদন করবার ওকালতনামা। জানি তো ফল কিছুই হবে না। তবু বললেন দিতে, দিলাম।

কদিন পর সুপার এসে আমাকে বললো, ২৯শে মার্চ জামসেদপুর কোর্টে আমাকে হাজির হতে হবে। দিন কয়েকের মধ্যে বাবার একটা চিঠিও পেলাম, তাতে বাবাও হাজিরার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। লিখেছেন, আমার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ সংক্রান্ত তদন্তের বিবরণ খানা কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি পেশ করেছে, দ্বিতীয়টা তৈরীর পথে। আমি তো অবাক! দ্বিতীয় আরেকটা কিছু আছে নাকি? সুপারকে জিজ্ঞেস করতে সে-ও দেখি আমারই মতো অবাক বনে গেলো। এক কেরাণী বাবু এতোক্ষণ শুনছিল আমাদের কথা-বার্তা। বললো, আমার বিরুদ্ধে দুটো আলাদা আলাদা অভিযোগ। বলে খুঁজে পেতে নথিখানা বের করে দেখালো। মারাত্মক সব অভিযাগ। এটার ব্যাপারে আজ অব্দি আমাকে কেউ ওয়াকিবহাল করার প্রয়োজনটুকুও বোধ করে নি। এতে সরকারের বিরুদ্ধে নানারকম চক্রান্ত করা থেকে শুরু করে যুদ্ধ ঘোষণা অব্দি আছে। এর শাস্তি ফাঁসি। সত্তরের দশই জুন পর্যন্ত

নাকি আমি এই সব কাজে লিপ্ত ছিলাম। মজার ব্যাপার, হিসেব করলে ১০ই জুনে আমার জেল খাটার মেয়াদ দাঁড়ায় দু হপ্তা।

যাই হোক, কদিন পরেই আমাকে আবার অফিস ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। গিয়ে দেখি, সাদা পোশাকের কজন পুলিস-কর্তা। সঙ্গে সুপারও আছে। সুপারই এদের মুখপাত্র। বললো, নকশাল রাজনীতি সম্পর্কে আমার কি ধারণা এবং ছাড়া পেলে আমি আবার ওদের সঙ্গে যোগ দেবো কিনা। ভয়ও একটু দেখালো। বললো অমলেন্দুর তো ফাঁসি হবেই, আর আমার বিরুদ্ধেও অভিযোগ কিছু কম নয়। সঙ্গে আমার মারাত্মক সব অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে। মামলা উঠলে নির্ঘাৎ আমাকে দীর্ঘদিনের হাজতবাসের মেয়াদ ভোগ করতে হবে। সুতরাং লাভ কি ওসব মামলার ঝঞ্ঝাটে যাবার! নকশাল রাজনীতি ছেড়ে দিতে আমি যদি রাজী থাকি এবং এখান থেকে বেরিয়ে সোজা ইংল্যাণ্ডে পাড়ি দেবো বলে প্রতিশ্রুতি দিই, ওরা আমাকে বেকসুর মুক্তি দেবে। জেলে পচার চেয়ে সেটা নিশ্চয়ই ঢের ঢের ভালো।

এতোক্ষণ আমি কোন কথাই বলিনি। চুপচাপ বসে শুধু শুনছিলাম। বললাম, ঠিক কি বলতে চান একটু ভাঙিয়ে বলুন তো। ফলে আবারও সেই পুনরাবৃত্তি। বললাম, ভারত সরকার যদি আমাকে ইংল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেবার ব্যাপারে এতোই আগ্রহী, তাহলে দু বছর আগে পাঠাতে কি দোষ ছিল। এতোদিন এই সব টালবাহানার অর্থ কি। বলে, টালবাহানা নয়, পীড়াপীড়িরও ব্যাপার নেই, আমার ইচ্ছার ওপরই নাকি সব কিছু নির্ভরশীল। আমার ভালো বিবেচনা করেই ওরা এসব চিন্তা ভাবনা করেছেন। অসহ্য। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার সেই একই কথা। ভালো লাগছে না আর। বললাম আমাকে আমার কুঠুরিতে ফিরে যাবার অনুমতি দিন। ফিরে এলাম। সেই শেষ। আর কখনো এ ধরনের অর্থহীন বাক্যালাপের মুখোমুখি হতে হয় নি।

এরই মধ্যে একদিন ২৯শে মার্চ এলো এবং যথারীতি চলেও গেলো। কেউ এলো না আমাকে কোর্টে নিয়ে যেতে। কেউ এ ব্যাপারে একটা কথাও বললো না। এতোটকু অবাক হইনি সে জন্য। হবার আছেটাই বা কি। গোড়া থেকেই না কেমন কেমন লাগছিল গোটা ব্যাপারটা। এমনকি ঐ যে আমার বিরুদ্ধে খানিক বাড়তি অভিযোগের বৃত্তান্ত শুনলাম, তাতেও বুকটা এতোটুকু টললো না। ততদিনে আমি বুঝে নিয়েছি, কাউকে হাজতে আটক রাখবার জন্য এদের ভেবেচিন্তে নানা ধরনের ফন্দি ফিকির আবিষ্কার করতে হয় এবং কাকে কতদিন আটক রাখবে সেটা সম্পূর্ণ সরকারেরই

ইচ্ছাধীন। আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার এখানে বিন্দুমাত্র মূল্যও নেই। অথচ খবরটা কিন্তু বাইরে ইতিমধ্যে অন্যভাবে চাউর হয়ে গেছে। বোনের চিঠি পেলাম। আমার কত ভালবাসার বোন! আমাকে লিখেছে আমি যেন কোর্টে যাওয়ার ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করি। তাহলে মামলার রায় বেরুতে দেরী হবে না। এবং ছাড়া পেতেও সুবিধে হবে। অর্থাৎ যেন দোষটা পুরোপুরি আমারই। যেন আমারই দোষে এই দেরী এই অহেতুক কালহরণ। লিখলাম তার জবাব—সমস্ত কিছু বুঝিয়ে, ঘটন-অঘটন সব বর্ণনা করে। সে চিঠি স্বভাবতঃই জেলখানার অফিস ঘর পেরিয়ে আর বাইরে যেতে পারে নি। সে যে কী দুঃখ! দোষ দেয় ওরা, অথচ পারি না আমি দোষ খণ্ডন করে সব কথা বোঝাতে। পারি না মানে সব কিছু আমার নাগালের বাইরে। যা যা না হয়েছে, তাকে ভুল বুঝে ভুল ব্যাখ্যা করে বেশি বেশি করে বাড়িয়ে লিখেছে আরো ঐ বিদেশ দপ্তরের কর্তারা। দেশে ফিরে সে সব চিঠি পড়ে আমি তো হতবাক। একটা চিঠিতে লিখেছে, আমি নাকি 'একগুঁয়ে, আদৌ আমার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত নই।' আরেকটা চিঠিতে লিখেছে, অমলেন্দুর পরিবারের লোকদের সঙ্গে ঘন ঘন দেখা করতে না দেওয়াটা আমার পক্ষে যৎপরোনাস্তি মঙ্গলের, দিলে নাকি আমার লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। ক্ষতি বৈকি! ওঁরা আমাকে ছাড়াবার জন্যে যে চেষ্টা করেছেন, আমার পোশাক আশাক জুগিয়েছেন—এগুলোকে কি ভুলক্রমেও লাভ বলে ধরা যায়!

গোড়া থেকেই মনটাকে তৈরী করে ফেলেছিলাম। জানতাম ব্রিটিশ হাই-কমিশনের বড় বড় কর্তাদের দিয়ে কাজ কিছু হবে না। সুতরাং ওদের কাছে কিছু আশা করাও ভুল। সেইভাবেই ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতাম। সংযত চিত্তে, কোন আশা-নিরাশার মধ্যে না গিয়ে কেবল মাত্র ওদের প্রশ্নের জবাব ইত্যাদি দেওয়া। কিন্তু তাই বলে কোর্টে যেতে, মামলা তোলার ব্যাপারে বা স্বদেশে ফিরে যাবার প্রশ্নে আমি কখনো কোন দিন কোন আপত্তি করিনি। শুধু একটা কথাই বলতাম, এই অজুহাতে আমার ওপর কোনরকম শর্ত আরোপ করা চলবে না। হাইকমিশন কর্তাদের কাছে আমাকে কোর্টে না নিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়ে আমি বহুবার অভিযোগ করেছি। জবাবে ওরা বলেছে, বিহার সরকারের কাছে দরবার করে আমাকে পনেরো দিন অন্তর অন্তর কোর্টে হাজির করার ব্যাপারে আশ্বাস ওরা আদায় করে নেবে। এর পরেও বলা যায় সব দোষ আমার, আমার নিজের জন্যই আমার এই অশেষ দুর্গতি!

সে বছরই এপ্রিল মাসে ডেপুটি হাইকমিশনের দুজন প্রতিনিধির কাছ

থেকে জানতে পারলাম, আমার মামলা আলাদা ভাবে তোমার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। একসঙ্গে হলে কোনদিনই হয়তো মামলা উঠবে না। কেননা কলকাতায় যাদেরকে নিয়ে গেছে, তাদের আর অদূর ভবিষ্যতে হাজারিবাগ আসার সম্ভাবনা নেই। এ ব্যাপারে আমার মতামত জানতে চাইলে আমি বললাম যে মতামত দেবার আগে আমার অন্যান্য যে কজন সহ-বন্দী এখনও হাজারিবাগে আছে, তাদের সঙ্গে একবার আলোচনা করে নেওয়া দরকার। সেই মর্মে তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের দিন ধার্য হলো। তখন আবার কটা দাঁত নিয়ে বড্ড কষ্ট পাচ্ছি। কর্তৃপক্ষ ওদের সামনেই প্রতিশ্রুতি দিল আমাকে অবিলম্বে কোনো দাঁতের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। চিঠিপত্র যে ডাকে ঠিকমতো পাই না সেটাও জানালাম। কর্তৃপক্ষ প্রতিনিধি দুজনকে বললো, না পাওয়ার কারণ নাকি ডাক বিভাগের গোলমাল। ঠিক হলো ব্রিটিশ কনসাল আমার বাবার জমা দেওয়া টাকা দিয়ে আমাকে খানকতক বই কিনে দেবে। সুপার বললো, বই কেনার ব্যাপারে কোনই বাধা নেই, শুধু পিকিংয়ের ছাপানো কিছু না হলেই হলো। এই সুযোগে আমার বন্ধু রুথ কস্টারের পাঠানো ক খানা বই সুপারের হাতে দেওয়া হলো যাচাই এবং পরীক্ষা করে দেখবার জন্য।

দেখতে দেখতে একটি মাস কাবার। না দেখা হলো আমার সহবন্দীদের সঙ্গে, না পেলাম কোনো দাঁতের ডাক্তারের সাক্ষাৎ। তাবৎ প্রতিশ্রুতির কথা এরা ব্রিটিশ কনসাল চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বলতে গেলে ভুলে গেছে। চিঠিপত্র আরো অনিয়মিত হলো। এক একটা চিঠি লিখি বাইরের আত্মীয় স্বজনকে, ওরা পাঠায় না, পাঠাচ্ছি পাঠাচ্ছি বলে চেপে রেখে দেয়, অহেতুক কালক্ষেপ করে। আর বাইরে থেকে আসা চিঠির মায়া তো কবেই ত্যাগ করে বসে আছি। কখনো কখনো রেজিস্ট্রি চিঠি এসেছে বলে আমাকে ডাক বিভাগের কাগজে সই সাবুদ করিয়ে নিয়ে যেতো, চিঠি আর ওরা দেয় না। চেয়ে চিন্তে বিস্তর দরবার করে হয়তো দশদিন বা পনেরো দিন পর সেখানা আদায় হলো। কী যে রাগে জ্বলতাম! এ রেমন ধরনের আমলা রে বাপু! নড়তে চড়তে সময় লাগে ছ মাস! একটা চিঠি এইটুকু পথ পেরোতে সময় লাগিয়ে দেয় এক পক্ষ। জেলের মজা এতোবড় সংগঠন এ লোকটা চালাবে কিভাবে!

জমাদারনীরা বললো, দেরী তো হবেই, তুমি কি বাছা ঘুষ দাও? অচল বস্তুকে সচল করবার প্রধান রাস্তাই তো ঘুষ। তারাও দেয়। অর্থাৎ না দিয়ে

উপায় নেই। মাইনের কাগজ তুলতে গেলো, কি রাহা খরচ তুলতে গেলো, এমন কি নিজের জমানো টাকা নিজে প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড থেকে ওঠাতে গেলো— সর্বত্রই দেরী কথবার একমাত্র রাস্তা ঘুষ। প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড থেকে টাকা তোলা তো এক মহা ঝকমারী। একজন ছেলের বিয়ে ঠিক করেছে, দরখাস্ত করেছে তারও অনেক আগে, টাকা আর পায় না। মোটে পাঁচশোটি টাকা। শেষে কুড়ি টাকা ঘুষ-মহারাজের পায়ে রাখলো, ব্যস্, টাকা হাজির। এক জেল থেকে আর এক জেলে বদলী হতে চাইলেও ঘুষ দেওয়া অতি আবশ্যকীয় শর্ত। আবার যদি কেউ বদলীর আদেশ রদ করে এখানেই থেকে যেতে চায়, তারও প্রকৃষ্ট রাস্তা ঘুষ। ঘুষ ছাড়া এখানে নাকি সব কিছুই অচল।

এমনকি বন্দীদেরও রেহাই নেই। অফিস-বাবুরা যেন হাতটি বাড়িয়েই আছে। কোথাও কিছু নেই, হুট করে একদিন কিভাবে যেন বদলীর হুজুগ উঠে গেল। নাকি দুশো বন্দীকে অবিলম্বে শ খানেক মাইল দূরে বক্সার জেলে পাঠানো হবে। ভয়ে তো সবার ঘুম বন্ধ। যাদের সম্মতি আছে বা যারা কোনো কারণে এখান থেকে অন্য কোথাও বদলী হতে নারাজ, অমনি ছুটে গেল অফিস ঘরে। ছোট জেলারকে জমানো যে কটা টাকা সব দিয়ে এলো। ব্যস্, এবার আর ঘুমোতে বাধা নেই। আরো কদিন পর দেখা গেলো বদলীর গোটা ব্যাপারটাই ভুয়ো, কারুর নামেই কোথাও বদলীর আদেশ আসে নি। তা আসুক আর না আসুক, টাকা মজুত রাখতেই হবে। অর্থাৎ এটা একটা নিয়মের মতো। বদলী ছাড়াও আরো কত কি প্রয়োজনই না আসতে পারে। সুতরাং দেদার টাকা জমাও। উপোস দাও, নয়তো মালপত্র বেশী বেশী বিক্রী করো, নচেৎ অন্য বন্দী বা অফিস বাবুদের জামা কাপড় সাফ করো তবেই টাকা আসবে। জেলখানায় চার দেয়ালের ঘেরা টোপে এছাড়া আর টাকা জমাবার পথ কি।

সেটা জুন মাসের গোড়ার দিক। আমার দুবছর হাজতবাসের মেয়াদ সবে পূর্ণ হয়েছে। একদিন ছোট জেলার এসে হাজির। বললো, ডেপুটি হাই কমিশনার নাকি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে জানতে চেয়েছে আলাদা মামলার ব্যাপারে আমার সম্মতি আছে কি না। বললাম, সবার জন্যই আমি মামলার আবেদন জানাতে চাই এবং সবার জন্যই মামলা ওঠার আগে জামিনের আবেদন পেশ করতে চাই। এই প্রসঙ্গে ওরা আমার বাবাকে লিখলো, আমি নাকি আলাদা মামলার ব্যাপারে পরিষ্কার ভাবে কিছু বলি নি। ইতিমধ্যে অবিশ্যি অমলেন্দুর বাবা আমার জন্য জামিনের আবেদন পেশ করেছিলেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি।

১০ই জুন ১৯৭২, তারিখটা আমার মনে আছে। দুমাস পরে এই প্রথম সুপারের দেখা পেলাম। বললো, আমার মামলা কাল থেকেই শুরু হবে জামসেদপুর কোর্টে এবং আমাকে যথারীতি হাজিরা দিতে হবে। দুটো লম্বা খাঁকি রঙের ব্যাগও হাজির, আমার বইপত্র টুকিটাকি জিনিস এতে করেই আমি নিয়ে যাবো। পুরো হপ্তার রেশনও আমাকে দিয়ে দেওয়া হলো। কি হবে আমার আর অতো রেশনে—বিকেলে বসে বসে রাশিকৃত চাপাটি ভাজলাম আর সঙ্গে এক ডেকচি আলুর তরকারী। দিলাম সবাইকে ভাগ করে। চলে যাচ্ছি তো, তাই ভালবাসার সামান্য উপহার আর কি। হলো ভোর। সকাল গড়িয়ে দুপুর, তারপর বিকেল, তারপর রাত—কেউ এলো না আমাকে জামসেদপুর নিয়ে যেতে, যেখানকার আমি সেখানেই রইলাম। না নিয়ে যাবার কারণও ভেবে চিন্তে কিছুই অনুমান করতে পারলাম না। মাঝখান থেকে পুরো হপ্তা আমার ভাঁড়ে মা ভবানী। একদানা এমন কিছু নেই, যে ফুটিয়ে খাবো সহ বন্দিনীরা সাতসাতটা দিন পালা করে আমাকে দু বেলা খাইয়ে রাখলো। এদিকে আমি তো নাছোড়বান্দা—না নিয়ে যাওয়ার কারণ কি আমাকে জানাতেই হবে। প্রায় রোজ একবার করে এত্তেলা পাঠাই। শেষে জেলার বললো, মোট সতেরো জনের নামে অভিযোগ, আমি এবং আর কজন ছাড়া বাকীরা সব কলকাতায়, তাদের হাজির করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি, তাই হাকিম মামলা স্থগিত রেখেছে। এদের তরফে নাকি এরই ভিত্তিতে হাজারিবাগের কজনকে আলাদা বিচারের আবেদন জানিয়ে একটা দরখাস্ত করে দেওয়া হয়েছে।

পরের খবর পেতে পেতে সেই আগষ্ট মাস। রোববার বিকেল পাঁচটা নাগাদ ছোট জেলার এসে আমার হাতে কোর্টের একখানা নির্দেশনামা দিয়ে বললো, পরদিন পাটনা কোর্টে আমার মামলার শুনানী শুরু হবে, আমি যেন একজন উকিল ঠিক করে প্রয়োজনীয় ওকালতনামা দিয়ে দিই। পড়ে দেখলাম, সরকারী তরফ থেকে মামলা হাজারিবাগ আদালতে বদলী করার অনুরোধ জানিয়ে এক আবেদন পেশ করা হয়েছে। দুটো কারণে। প্রথমতঃ পাটনায় মামলা উঠলে অভিযুক্তদের নিয়ে রাখতে হবে জামসেদপুরের হাজতে, সেখানে জায়গা কম। দ্বিতীয়তঃ নকশাল ক্রিয়াকলাপ সম্প্রতি এমনই বেড়ে গেছে, অভিযুক্তদের হাজারিবাগ থেকে জামসেদপুর বা পাটনা অব্দি নিয়ে যাওয়া প্রচণ্ড ঝুঁকির কাজ এবং তাতে যে কোন মুহূর্তে যা কিছু ঘটে যেতে পারে। তা না হয় হলো, কিন্তু এদিকে আমি কি করি! এই অল্প সময়ে কি করে জোটাই উকিল, কি করেই বা কলকাতায় খবর পাঠাই? দুরত্বটা যে একটা

প্রধান বাধা। সুতরাং কিছুই করা সম্ভব হলো না। এদিকে আবেদনের ব্যাপারেও নতুন কোন খবর পাওয়া গেলো না। বহুদিন পরে শুনলাম সরকারী তরফের আবেদন নাকি তুলে নেওয়া হয়েছে, কেননা ততদিনে হাজারিবাগ জেলাতেও ছড়িয়ে গেছে নকশাল ক্রিয়াকলাপ এবং সব কিছু বিবেচনা করে মামলার শুনানী অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে।

একাত্তরে গেলো বিধ্বংসী বন্যার তাণ্ডব, বাহাত্তরে যুগপৎ খরা আর লু। ঘুম ভেঙে উঠে সকাল বেলায় রোজ আকাশের দিকে তাকাই, প্রতিটি ইঞ্চি চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জরীপ করি। যদি ছিটেফোঁটা মেঘেরও সন্ধান মেলে। জীবন যেন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। একটু বৃষ্টির জন্যে সে যে কী হা-হুতাশ! আর সমানে মশার দাপট। সন্ধ্যের ঘোর লাগলো কি শুরু হলো তাণ্ডব, শেষ হতে হতে সেই ভোর সকাল। লাল হয়ে ফুলে উঠলো মুখ, ঘুম কম হয় তাই মাথাটা সব সময় ভার হয়ে থাকে। রাত্তিরে মেঝেয় একটা শাড়ি বিছিয়ে শুতাম। সকালে উঠে দেখতাম আমার জামা কাপড় মায় সেই শাড়িটা অব্দি লালে লাল হয়ে গেছে। যেন ছোটখাটো একটা রণক্ষেত্র। এদিকে জলের যোগানও কমে এসেছে। কল থেকে হলদে হলদে ফোঁটা ফোঁটা জল চুইয়ে পড়ে। তাতে কি হয়! বাগানে তো কবে থেকে সব্জীর চাষ বন্ধ। রান্না বান্না করাই বলে দায়! কল খুলে দেখলাম, সোঁ সোঁ একটা আওয়াজ, এক ফোঁটা জলও নেই। সেই ভাবেই রইলো পর পর কটা দিন। চেয়ে চিন্তে ভেতরের পাতকুয়ো থেকে যা-ও বা দু বালতি জল পাওয়া যেতো, তার ভাগীদার মোট চারজন। কি করে চান করবো? কি করেই বা জামা কাপড় ধোবো? কি করেই বা বাসন কোসন ধুয়ে ঐটুকু জলে চার জনের রান্না চাপবে? খবর নিয়ে জানা গেল, পাইপ নাকি এক জায়গায় ফুটো হয়েছে, তাই এই অবস্থা। এদিকে সারাবার নামটি নেই। ঐ যে বললাম দু বালতি জল, তা-ও কি যোগাড় করা কম ঝকমারি। জেল সিপাইদের বলো রে, ওরা পুরুষ মহল থেকে কয়েদী যোগাড় করে আনুক, পাতকুয়ো থেকে তারা জল তুলুক—তবে তো জল। মুশকিলে ফেলার একটা সুযোগ পেয়েছে—আর কি জেল সিপাইরা সহজে পাত্তা দেয়। সাধ্য সাধনা করে, দাদারে বাছারে বাবারে বলে খাতির দেখাবার পর তবে গা গতর নাড়িয়ে ওঠে, যায় কয়েদীর খোঁজ করতে।

আর রোগ পীড়ারও যেন কামাই নেই। বন্দীদের যেন ছেঁকে ধরেছে অসুখ আর বিসুখ। আমার সেলের এক সহবন্দিনীর ম্যালেরিয়া হলো। সেই প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও থরথরিয়ে কাঁপে, যাবতীয় কম্বল টম্বল দিয়ে চাপা দিলেও

শীত আর যায় না। আমার শরীরটাও ভালো মনে হয় না। কেবল বমি হয় আর খেতে ইচ্ছে করে না। ডাক্তারদের বললে বলে, সব মনের ব্যাপার, মনটা তো ভালো নেই, শরীরটাও তাই খারাপ। শারীরিক অসুস্থতাটাকে মোটে ধর্তব্যের মধ্যে ধরে না। শুনতে শুনতে একসময় এমন হলো, আমারও মনে যেন গেঁথে গেলো কথাটা। বসে বসে আমিও ডাক্তারের মতোই ভাবতাম, তাইতো, তবে কি মার অসুখের খবর পেয়েছি তাই আমার অসুখ, নাকি অমলেন্দু কষ্টের মধ্যে আছে তাই ভেবে, না কি এই যে একটা সামগ্রিক অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি এর থেকেই আমার অসুখটা জন্ম নিলো।

এদিকে বাচ্চাদের সবকটারই পেট ছুটেছে। মুরতির তো সমানে বমি আর পায়খানা। মেয়েটার বিয়ের সব ঠিকঠাক। মায়ের যে কী দুশ্চিন্তা! গেলো ডাক্তারখানায়। ওষুধ দেয় যে কয়েদী, সে কি একটা বড়ি দিলো। বলে দিলো, চারভাগের একভাগ খাওয়াতে। মা তো দুশ্চিন্তায় আকুল। ভাবলো বুঝি পুরো বড়ি দিলে ফল আরো ভালো হবে। দিলো। দুদিন অজ্ঞান হয়ে রইলো মেয়ে। দুদিনের দিন বিকেলবেলা, আমি তখন যথারীতি নিত্যকার অসুস্থতা নিয়ে ঘরে শুয়ে আছি—মুরতির মা বাল্‌কো এসে বললো, মুরতি আমাকে ডাকছে। বলেই অঝোরে কান্না—হায় হায়, একি হলো, তার একটু বোকামির জন্য মেয়ে আজ মরতে বসেছে! আমি তো পড়ি কি মরি করে দৌড়। ডরমিটরিতে গিয়ে দেখি মুরতি শুয়ে আছে মেটিনীর বিছানায়, আচ্ছন্ন ভাব, বিবর্ণ মুখ, চোখ কোটরাগত, আমার দিকে একবার মুখ ফেরালো, বোধহয় চিনতে পারলো আমাকে; হাতখানা বাড়িয়ে দিলো আমার দিকে, আমাকে ইশারায় তার পাশে বিছানায় শুতে বললো। চোখ ফেটে জল এলো আমার। জ্ঞান ফিরে নাকি প্রথমেই আমার কথা বলেছে। শুলাম ওর পাশে। দিনের আলো যতক্ষণ না ফুরোয় সেই অব্দি। সন্ধ্যে লাগলেই তো আমাকে নিজের কুঠুরিতে গিয়ে ঢুকতে হবে। এইভাবেই চললো পরপর কটা দিন। ধীরে ধীরে সুস্থ হলো মুরতি। আমাকে বললো বাইরে নিয়ে যেতে। ভালো করে কম্বল জড়িয়ে বাইরে নিয়ে এলাম। সব্জি খেতটা দেখতে চায়। ওটা যে ও আর আমি দুজনে মিলে করেছি। জলের অভাবে সবই তো ইদানীং খা খা, তবু যা একটুখানি সবুজ আমাদের খেতেই আছে.—তাই দেখলো, দেখে যাহোক শান্তি পেলো।

হাজারিবাগ থেকে তিরিশ মাইল দূরে চাতরা সাব-জেল থেকে বদলী হয়ে এলো এক বন্দিনী। কোলে তার কঙ্কালসার একটি শিশু। কোনক্রমে তখনও শ্বাসটুকু টানছে। তবে দেখে মনে হয় তার মেয়াদও বেশিদিন নেই, তৃষ্ণা দ্রুত

ঘনিয়ে আসছে। হাত দুখানা যেন গাছের শুকনো দুটি ডাল, আর্ত দুটি চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর থেকে, একটিও চুল নেই মাথায়,- শুধু পাতলা একটা ফিনফিনে খোলসের মতো, তাই দিয়ে শক্ত করে গোটা মাথাটা মোড়া। কনুইয়ে ঘা, হাঁটুতে ঘা, মায় গোড়ালিতে অব্দি ঘা। সাদাটে ফ্যাকাশে হাত আর পায়ের পাতার রং, যেন রক্তের ছিটে ফোঁটাও তাতে নেই। বগলের নিচে আর পাছার জায়গাটায় ঝুলঝুল ঝুলছে ক'ফালি কোঁচকানো চামড়া। আর দুধ খাওয়ায় তার যা চেষ্টা! এমন ভাবে দু হাতে আঁকড়ে ধরে মায়ের স্তন যেন মনে হয় আশ্রয় খুঁজছে—মায়ের গর্ভের কোটরে। নিরাপদে নিরালায়। কাঁদবারও শক্তি তার নেই। দু মাস ধরে ভুগছে পেটের অসুখে। চাতরায় ডাক্তারী সুযোগ সুবিধার বালাই নেই, শরীর দিন দিন জীর্ণ থেকে জীর্ণতর হচ্ছে। শেষে জেলার যখন ধরেই নিয়েছে আর বেশিদিন বাঁচবে না, ভয়েই হোক বা ঝামেলা থেকে অব্যাহতি পেতেই হোক—সাত তাড়াতাড়ি মাকে বদলী করে পাঠিয়েছে আমাদের এখানে—মরে যদি নয় চোখের আড়ালেই মরুক। বদলীর কারণ হিসেবে অবিশ্যি দেখিয়েছে 'উপযুক্ত চিকিৎসা'। তা চিকিৎসার আর দরকার হলো না। আসার দুদিন পর—ওর মার কোল থেকে সবে ওকে আমি নিয়েছি আমার কোলে, মাকে দু দণ্ড বিশ্রামের সুযোগ করে দেবার জন্যে—আমার কোলের মধ্যেই মরলো। সে দুঃখ আমি কাকে বোঝাবো? আমার জীবনে এই প্রথম দেখলাম আঠেরো মাস বয়েসের একটি বালকের মৃতদেহ। খবর দিয়ে বাইরে থেকে লোক আনা হলো। হরিজন সম্প্রদায়ভুক্ত দুটি মানুষ। এক টুকরো কাপড়ে মুড়ে হাড় জিরজিরে ছেলেটাকে নিয়ে গেলো বাইরে, কোথায় যেন পোড়াবে। আমি স্থির চোখে—বুকটা ছিঁড়ে যাচ্ছে ফেটে যাচ্ছে—একইভাবে অনড় অটল তাকিয়ে রইলাম। অন্যরাও অল্প বিস্তর বিচলিত, তবে আমার মতো এতোটা নয়। অকালমৃত্যু এদেশের নৈমিত্তিক ঘটনা। দেখে দেখে ওদের বুক পাথর হয়ে গেছে।

এই ঘটনার কদিন পরে সুপার এসে আবার উদয় হলেন। সঙ্গে আর একজন স্থানীয় কর্তাব্যক্তি। বললাম, আমাকে জামসেদপুরে বদলী করা হোক, আমি তাহলে আমার মামলা সংক্রান্ত ব্যাপার বৃত্তান্ত সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে পারবো। শুনে সে কি চোটপাট!—খবরদার, কার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় জানিস্ না! এক ঘুষিতে সব কটা দাঁত ভেঙে দেবো। ন-ক-শা-ল! সব কটাকে গুণে গুণে জেলে পচিয়ে মারবো। একেবারে তিতিবিরক্ত করে মারলো!

······আমি তো অবাক। তাহলে কি পুরুষ মহলে কিছু ঘটেছে যার জন্যে মেজাজটা এমন তিরিক্ষে হয়ে আছে? কদিন পরেই মালুম পেলাম। একাত্তরের গুলি চালনার ব্যাপারে বিচার বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্তকারী বিচারক এসেছিল জেলখানায় নকশাল বিভাগ পরিদর্শনে। তখন নাকি শ্লোগান দেওয়া হয়েছে—'রক্তের বদলা রক্ত চাই।' এতেই মাননীয় সুপার মহোদয় একেবারে তেলে বেগুনে জলে উঠেছেন।

গুলি চালনার ঘটনার 'প্রথম বর্ষ স্মরণ দিবসে'র আর কটা দিন বাকী, সুপারের কাছ থেকে নির্দেশ এলো, যে কটা ঝোপঝাড় গাছপালা আছে, সব কেটে ফেলা হোক। তখন যুঁই সবে ফুটতে শুরু করেছে, পেয়ারা গাছে নতুন কুড়ি। নিম গাছটায় নতুন ডাল গজিয়েছে কয়েকটা, সবে ডালপালার একটু একটু মিষ্টি ছায়া পড়তে শুরু করেছে। কিসের কি! সব আবার নির্মূল হলো। পঁচিশে জুলাই পুরুষ বিভাগের নকশাল ওয়ার্ড থেকে সে কী শ্লোগান! ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে চললো। সেদিন বাতাস আবার দক্ষিণ দিক থেকে আমাদের দিকে বইছে। বাতাস বয়ে আনলো তাদের মিলিত কণ্ঠের রেশ। ওরা আগে থেকেই জানিয়ে দিয়েছিল শ্লোগান দেবে, কোনো বাধা নিষেধ মানবে না, বীরের মতো রাখলো নিজেদের চ্যালেঞ্জ। জুলাই মাসেই কাগজে পড়লাম চারু মজুমদারের মৃত্যু সংবাদ। গ্রেপ্তারের পর পুলিস হেফাজতে থাকাকালীন তার মৃত্যু হয়। উনসত্তরে গড়া মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির তিনি ছিলেন প্রথম সাধারণ সম্পাদক। নকশাল আন্দোলনে মুখ্য নেতৃত্বও তাঁর। অনেকেরই ধারণা তাঁকে পুলিস হত্যা করেছে। সব থেকে মজার ব্যাপার, এই প্রসঙ্গে কাগজে যে সব খবর বেরিয়েছে জেল কর্তৃপক্ষ তার একটি লাইনও কালি ঢেলে কালো করে দেয় নি। আমাদের মনোবল ভেঙে দেবার মতো খবর কিনা সব। ফল হলো উল্টো, অন্ততঃ আমার কাছে। বাকী যে সব অংশ ওরা কালো করে দিয়েছে, আমি ধরে নিলাম সেগুলো ভালো খবর এবং স্বভাবতঃই এই খবরের সংখ্যা বেশি কেননা কাগজের বেশির ভাগ অংশই কালো।

সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে এমনই শরীর খারাপ হলো যে বিছানা থেকে উঠতে পর্যন্ত পারি না। এর আগে এতোটা অসুস্থ কখনো হই নি। প্রায় সাড়ে বারো কিলো ওজন কমে গেছে। এদিকে ওয়ার্ডের ডাক্তার কিছুতেই অসুস্থতার কারণ বের করতে পারছে না। রোজ এসে আমাকে বলে যায় পেট পুরে খেতে, অথচ খাবার দেখলেই সারা শরীর মন আমার বিদ্রোহ করে ওঠে।

সেই অবস্থাতেই এক হপ্তা বিছানায় পড়ে রইলাম। অষ্টপ্রহর জ্বর, তখন আরেক ডাক্তারকে খবর দেওয়া হলো। তিনি এসে দেখে শুনে বললেন হেপাটাইটিস অর্থাৎ যকৃতের ব্যারাম। সঙ্গে সঙ্গে কদিনের জন্য বাদশাহী খাতির। মনে তো ভীষণ ভয়, পাছে কিছু একটা অঘটন ঘটে আমার, তাহলে তো ওদের দফাগয়া। আর পাঁচজনের চেয়ে আমার পরিচিতি বেশি, বাইরে পাঁচজন আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে জানতে চায়, অন্য বন্দী হলে ওরা কিছুই জানতো না চেপে যেতো, আমার বেলায় পারে না। হাজার হোক, আমি ভিন্ন দেশী। ফলে একটি মাস আমার রাজার আদর। খাট দেওয়া হয়েছে, সঙ্গে মশারী। খাবার দাবারও রীতিমতো পুষ্টিকর। অবিশ্যি তাতে কিছু আসে যায় না, কেননা খাবার মতো তখন আমার শক্তিটুকুও নেই।

যা কিছু করার করলো আমার সহবন্দিনীরা। যাকে বলে পরিচর্যা। আমাকে হাওয়া দিতো, গা হাত পা টিপে দিতো, আমার জামা কাপড় কাচতো, ঘর পরিষ্কার করতো, গলা ভাত রেঁধে দিতো ইত্যাদি। যারা এর কোনটাতেই ইচ্ছে সত্ত্বেও অংশগ্রহণ করতে পারতো না, এসে রোজ খবর নিয়ে যেতো, আমি কেমন আছি। এরই মধ্যে একজন সান্ত্বনাও দিলো। বললো, তোমার তো বাড়ি অনেক দূরে, নির্ঘাৎ বাড়ির কথা ভেবে ভেবে মন খারাপ করছো। ভাবনার দরকার কি, আমরা তো আছি। আমরাই তোমার মা বোন। তোমার কোন চিন্তা নেই।

যেন একটা অদ্ভুত পরিবর্তন। ওরা যে আমার জন্যে এতো ভাবে, আমাকে এতো ভালবাসে, কই আগে তো বুঝি নি। সত্যিই তো, আমার আর চিন্তা কিসের। ঐ ওদের দেখতে পাচ্ছি, এক একজন আসছে, আমার একেকটি দরকারী কাজ করে দিয়ে চলে যাচ্ছে। দূরে নীল নির্মল আকাশ, দু এক টুকরো সাদা মেঘ, বক উড়ছে পীপুল গাছটার দিকে, ওখানেই যে ওদের বাসা, নীম গাছের গুঁড়িটার নীচে বাচ্চাগুলো খেলা করছে—সব আমি খুব তাড়িয়ে তাড়িয়ে বিছানায় শুয়ে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু বেশি ক্ষণ যে একভাবে তাকিয়ে থাকতে পারি না। শরীর যে ক্লান্ত লাগে। চোখ দুটো তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও বুজিয়ে ফেললাম। অবাক কাণ্ড, আমার শরীরের এই অবস্থার মধ্যেও নাকি একদিন তল্লাসী হয়ে গেছে। সব টেনেটুনে নাড়িয়ে চাড়িয়ে দেখে গেছে আমার কম্বল, আমার মশারী, আমার তোষক এমন কি খবরের কাগজের প্রতিটি ভাঁজ অব্দি। বোধহয় এমনই একটা সুযোগের প্রতীক্ষায় ওরা ছিল। এদিকে আমি যে উঠে দাঁড়াতে অব্দি

পারি না, সেটা বোধহয় ওদের খেয়াল ছিল না। যে নড়াচড়া করতেও প্রায় অক্ষম, তার কাছে গোপন কিছু ওরা আশা করে কিভাবে!

এরই মধ্যে স্কুলের তিন দিদিমণি এলেন গ্রেপ্তার হয়ে, কদিন জেল খেটে গেলেন। শুধু ওরাই নয়, শুনলাম হাজার হাজার শিক্ষক গ্রেপ্তার হয়েছেন এক হরতাল উপলক্ষ্যে। ওঁরা নাকি ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করেছিলেন। এই ধারা জারি হলে পাঁচ জনের বেশি মানুষের কোনো শোভাযাত্রা বা সভা করা নিষিদ্ধ। ওঁরা সকলেই ব্যক্তি মালিকানাধীন স্কুলের শিক্ষক, দাবী করেছিলেন সরকার এই স্কুলগুলি অধিগ্রহণ করুক। তাতে তাঁদের চাকরীর নিরাপত্তা হবে। পেনসন মিলবে, বাড়িভাড়া পাওয়া যাবে। আর যেটা সবচেয়ে জরুরী—নিয়মিত মাইনে—সেটাও সুবিধাজনক হবে। দিদিমণিরা বললেন, কখনও মাসের পর মাস ওঁরা মাইনেই পান না। এদিকে কোন জেলখানাতেই আর জায়গা নেই। সরকারকে তাই হাজারিবাগ থেকে প্রায় বিশ মাইল দূরে ছান্দওয়ারা বলে একটা জায়গায় সাময়িক জেলখানা খুলতে হলো। যতদূর ধারণা, ছান্দওয়ারায় এই হাজত প্রথম চালু করেছিল ব্রিটিশ সরকার। যাই হোক, শুধু ছান্দওয়ারা নয়, এরকম বহু স্থানে পরবর্তীকালে আরো অনেক সাময়িক জেলখানা চালু করতে হয়েছিল। কেননা নানান বিষয়ে গ্রেপ্তারের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। ধর্মঘটীদের মধ্যে গ্রেপ্তার হয়ে জেল খাটতে আমি প্রথম শিক্ষকদেরই দেখলাম। ঘটনার জের অনেকেই সামলাতে পারেন নি। মনোবল ভেঙে গিয়েছিল। শর্তবিহীন সবাই প্রায় কাজে যোগদান করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন। কিন্তু এর পরের অন্যান্য ধর্মঘট আর অতো সহজে ভাঙা যায় নি। অতো তাড়াতাড়িও না।

শুধু সেই সময়ই ধর্মঘটীদের উচ্চ শ্রেণীভুক্ত বন্দী বলে পরিগণিত করতে দেখেছি। তাদের খাবারদাবারও অন্য সকলের চেয়ে ভালো দেওয়া হতো। পোশাক দেওয়া হতো পুরো এক প্রস্থ। ছাড়া পাওয়ার সময় ওরা সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে যেতো। ভারী বিরক্ত লাগতো আমার। অন্য বন্দীরা ছেঁড়া কম্বল পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর ওদের জন্য দামী একপ্রস্থ পোশাক! এদের কি চোখের চামড়া আছে! দিদিমণিরা চলে যাবার পর জামাকাপড়ের দায়িত্বে যে ছোট জেলার, তার সঙ্গে একদিন আমার এই নিয়ে খুব একচোট হয়ে গেলো। একটা ব্লাউজ অব্দি অনেকের নেই। কদিন পরেই তো শীত নামবে, তখন

অবস্থা কি দাঁড়াবে? কাজ হলো। এক দফা সরেজমিনে অবস্থা পর্যবেক্ষণের পরে ঠিক হলো, যাদের শাড়ি ব্লাউজ কিছুই নেই, তাদের একপ্রস্থ করে শাড়ি ব্লাউজ দেওয়া হবে। আর কিছু নয়। বললাম, দিদিমণিদের বেলায় তবে কেন অত উদারতা? ওদের তো শাড়ি জামা ছিলোই, মেয়াদও মাত্র কয়েক দিনের, তবু তেলা মাথায় তেল ঢালার অত ঘটা কিসের? বললো, যারা ছেঁড়া কম্বল পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারা বাড়িতেও এই ভাবেই থাকে, ভীষণ গরীব তারা, জেল খাটাতে এনে শাড়ি জামার বন্যা বইয়ে তাদের বড়লোক করার কোন অর্থ হয় না। আহা, কি যুক্তি! যেহেতু বাইরে ওরা কষ্টে থাকে, শীতের দিনেও একজোড়া চটি কি একটা শাড়ী পায় না, তাই তার সঙ্গে সমতা রেখে জেলখানার নিয়ম অগ্রাহ্য করে তাদের নিম্নতম প্রয়োজনীয় জিনিসকটিও সরবরাহ করা হবে না। এদিকে কংগ্রেস সরকার ভোটে জেতার আগে শ্লোগান দিয়েছিল 'গরিবী হটাও!' চমৎকার!

আসলে কাপড় চোপড় ওরা বিক্রী করে দেয়। ঐ ছোট জেলার আর তার সাকরেদ বিশ্বস্ত কয়েদীর দল। দিয়ে খাতায় লিখে রাখে, কাপড় বন্দীকে দেওয়া হয়েছে। যদি কোন মন্ত্রী আসে জেল পরিদর্শনে, বা কারাবিভাগের আই. জি, তখনই শুধু ওরা বন্দীদের শাড়ী দেয়, ব্লাউজ দেয়। তা-ও সবাইকে নয়। বেছে বেছে যাদেরটা একদম ছিঁড়ে গেছে, যাদের না দিলে নয় তাদের। বাকীদের সাবধান করে দেয়। কেউ যেন ভুলেও অভিযোগ না করে। বলে, এরপর যখন মাল আসবে, সবাই জামা কাপড় পাবে। মাল হয়তো ঠিকই আসে, কিন্তু জামা কাপড় কারো ভাগ্যে জোটে না। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ জেল পরিদর্শন করে জেলখানার সীমানার বাইরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা ওদের প্রতিশ্রুতি বেমালুম ভুলে মেরে দেয়।

রোগের প্রথম ধাকাটা সবে কাটিয়ে উঠেছি, হাই কমিশনের এক কর্তা ব্যক্তি এলো আমার সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে বহু প্রতীক্ষিত একটা কলম আর অপ্রত্যাশিত এক প্রস্তাব—আমি যদি স্বেচ্ছায় স্বদেশে ফিরে যেতে চাই, তবে বিচার ইত্যাদির আর দরকার হবে না এবং ভারত সরকার আমার প্রস্তাব নিশ্চিতভাবে মেনে নেবে। বললাম, আমাকে একমাস সময় দিন। একটু ভেবে দেখি, তারপর জানাবো।

প্রস্তাব লোভনীয় সন্দেহ নেই এবং সেই কারণে আমাকে ভাবিয়েও তুললো। রাজী হলে সরকার নাকি আমার বিরুদ্ধে সব মামলা তুলে নেবে, ওদের বলেছে। তেমন তেমন মনে করলে কালই আমি দেশে রওনা দিতে পারি। আর যদি গররাজি হই, তবে মামলা থাকবে, কবে তার নিষ্পত্তি হবে কেউ জানে না। বিহার সরকারের ভাষায় আমি কিনা 'ভয়ঙ্কর' তাই যে কোনো রকম জামিনের আবেদন তারা অগ্রাহ্য করবে। সর্বোপরি, বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত হলে আমার কম করে বিশ বছরের জেল। কর্তাটি আরো বলে গেলেন, অমলেন্দুর সঙ্গে ফের দেখা করার আশা করাও নাকি বাতুলতা। মুপার বললো, আমার সঙ্গী কতজনের যে ফাঁসি হবে তার তো কোন সীমাসংখ্যা নেই। অর্থাৎ অমলেন্দুরও হতে পারে। সাদা কথায় আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। এতোদিন জেলে কাটাবার পর এটুকু বুঝতে কি আর আমার অসুবিধে হয়। যাবার আগে কর্তাটি শেষ বাণ ছেড়ে গেলেন—বিহার সরকারের মুখ্য সচিব নাকি কথাপ্রসঙ্গে তাকে বলেছে, কলকাতায় যদি আমি এতো সব ঘটনার পরেও বাস করি, তবে আমার জীবন নিয়ে সংশয় অব্দি হতে পারে। সত্তরের সে দিনকাল তো আর নেই, নকশাল পন্থীদের কোনক্রমেই আর আমল দেওয়া হবে না।

অর্থাৎ খুব সূক্ষ্মভাবে আমাকে ঘাবড়ে দেবার চেষ্টা। কিন্তু কেন ঘাবড়াবো আমি! কিসের ভয় আমার! কলকাতার মানুষের কি আমি করেছি যে তারা আমার বিরুদ্ধে যাবে? অতএব নতুন করে ভাবতে বসলাম। আবেগ টাবেগের বালাই নয়, এবার যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ। ওরা যে আমাকে স্বদেশে ফেরৎ পাঠাতে চায়—কেন? এমন তো নয় যে রাতারাতি ভারত সরকারের হৃদয়ের আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে। আসলে আমাকে দেশে ফেরৎ পাঠিয়ে ওরা বিদেশের বাজারে নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে চায়। এদিকে স্বদেশের কারাগারে বছরের পর বছর আটক থাকবে হাজার হাজার বন্দী তাদের বিচার হবে না, মুক্তি হবে না,—সেখানে ভাবমূর্তির কোন বালাই নেই। তারা যে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ! এতোদূর অব্দি ভেবে আমি কিন্তু মোটামুটি ঠিকই করে নিলাম, ওদের প্রস্তাব মেনে নেওয়াটাই আমার পক্ষে সুবিধাজনক। এখানে শুধু শুধু জেলে আটক থাকার কোন

মানে হয় না। কোন লাভও নেই, কোন উদ্দেশ্যও তাতে সিদ্ধি হবে না। কদিন পরে অনুরূপ মর্মে আমাদের এক সহমর্মীর একখানা চিঠিও পেলাম। সে লিখেছে, আমি যেন স্বদেশে ফেরৎ যাবার প্রস্তাব মেনে নিই, অবশ্যই বিনা শর্তাধীনে। চিঠিখানা পেয়ে বড় ভাল লাগলো। তবু যাহোক একটা পরামর্শ তো দিয়েছে। চলে যাবো অথচ ওরা কেউ জানবে না, চলে যাবার পর মনে করবে আমি চোরের মতো পালিয়ে গেলাম ব্যাপারটা ভাবতেও বিশ্রী লাগছিল।

দু হপ্তার মধ্যেই সিদ্ধান্ত পাকা। কলকাতায় চিঠি লিখলাম, ওরা যেন আমার ফেরৎ যাবার ব্যাপার নিয়ে কথাবার্তা চালায়। জেলের অফিসাররা বললো, সবই প্রায় ঠিকঠাক, কদিনের মধ্যেই আমি রওনা দিলাম বলে। শুনে মনের কোণে যেটুকু সন্দেহ ছিলো, তা-ও দূর হলো। মনের মুকুরে ভেসে উঠলো আবার লণ্ডনের সেই চির পরিচিত ছবি। এক দৌড়ে চলে যেতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে। বাবা মাকে দেখবো, আমার আদরের বোনপো বোনঝিদের দেখবো—সে যে কী একটা উদ্দাম আনন্দ! পাশাপাশি অবশ্য দুঃখও আছে। ভারত ছেড়ে যেতে হবে, হয়তো চিরদিনের মতো। এটা আমার কাছে কষ্টের। ঐ তো আকাশটা দেখতে পাচ্ছি। হাজারিবাগের মেঘমুক্ত নীল নির্মল আকাশ। কয়েকটা শকুন পাক খেয়ে খেয়ে উড়ছে, হয়তো মড়ার সন্ধান পেয়েছে। বৃষ্টি হয়ে গেছে একপশলা, ভেজা মাটির অদ্ভুত একটা সুঘ্রাণ উঠছে ঝিম ঝিম করে, আমার সারা দেহে অণু পরমাণুতে সেই ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ছে। আর যে আমি এসব দেখতে পাবো না! সব চলে যাবে ধরা ছোঁয়ার বাইরে! এদেশকে আমি যে প্রাণ দিয়ে হৃদয় দিয়ে ভালবাসবো বলে এসেছিলাম। অমলেন্দুকেও তো আর কখনো দেখতে পাবো না। যোগাযোগ...? সেটা আমাকে মাথা খাটিয়ে বের করতেই হবে। ওর সঙ্গে ওর পরিবারের সবার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে। বরং সব জানিয়ে অমলেন্দুকে একটা চিঠি লেখা যাক। বুঝিয়ে সব ব্যাখ্যা করে বললে ও নিশ্চয় আমাকে বুঝতে পারবে।

আর জেলখানার বাইরে সারা ভারত তখন উত্তাল। আসামে ভাষার প্রশ্নে দাঙ্গা, পাঞ্জাবে ব্যাপক ছাত্র অসন্তোষ, আর খুচরোখাচরা গোলমালের খবর তো দেশের সর্বত্র লেগেই আছে। এক মহিলা এম. এল. এ গ্রেপ্তার হয়ে এলো জেলে। রামগড়ে কি একটা অবস্থান ধর্মঘট হয়েছে, তারই জের। হাজারিবাগ থেকে রামগড় ত্রিশ মাইল দূর। মাত্র কয়েকটা দিন ছিলো আমাদের সঙ্গে, কদিন বেশ ভালোই কাটলো। রামগড় থেকেই নির্বাচনে জিতেছে। এতোদিন জিততেন স্বামী। কিন্তু

স্বামীটি সাম্প্রতিক নির্বাচনে জেতার পর অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে প্রাণ দিয়েছেন। ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি উপনির্বাচনে মনোনয়ন দিয়েছে বিধবা স্ত্রীকে। ফলে একটা আবেগের ব্যাপার ছিলোই। তারই ফলে স্ত্রীর নিশ্চিত জয়। তা এমন একজন বিখ্যাত মহিলা জেলে এসেছে শুনে ভারী ইচ্ছে হলো ওঁর সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে একটু আলাপ আলোচনা করার। বললাম একদিন। বলে কিনা, মার্কস এঙ্গেলস্ লেনিনের নাম জীবনে শোনে নি। প্রসঙ্গ বদলে সরকারের কাজকর্ম নিয়ে প্রশ্ন করলাম। বললো, ইংরেজীর জ্ঞান তো তেমন নেই, বিধানসভায় কি সব হয় না। হয় ঠিক ঠিক বুঝতে পারে না।

সে যাই হোক, বিনা বিচারে আটক বন্দীদের দুরবস্থার কথা তাকে জানালাম, নানান অসুবিধের কথাও বললাম। খুব একটা আগ্রহ দেখালো না, যেন এ ব্যাপারে তার কোন ভূমিকাই নেই। আগ্রহ খুব ইংরেজী রান্না শিখতে বা উল বোনার নকশা তুলতে। কেবলই আমাকে ঐসব জিজ্ঞেস করে। এদিকে তখনই আবার রমজান, মুসলমানদের সারা দিনমান উপোষ দেবার মাস। তা এই 'কম্যুনিস্ট' মহিলাটিও পরম ভক্তিভরে রীতিনীতি সব মানতো, সকাল থেকে সন্ধ্যে অব্দি না খেয়ে থাকতো। এটা যে আদর্শের সঙ্গে খাপ খায় না, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তাও তার নেই।

ইতিমধ্যে আমার এক পুরনো বান্ধবীর চিঠি পেলাম। আইরিশ মার্কস্, আমার শিক্ষক জীবনের বন্ধু, লিখেছে ও আর ওর স্বামী পিটার সম্প্রতি ভারত ভ্রমণে এসেছে এবং আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে আসবে। বসে বসে তো আমি দিন গুনছি। এদিকে নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেল। তাদের আর আসার নাম নেই। শেষে নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছি, এমন সময় হঠাৎ একদিন অফিস ঘরে তলব, গিয়ে দেখি আইরিশ, ভারত সরকারের অনুমতি নিয়ে এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করতে। ওদের ইচ্ছে ছিল একহপ্তা হাজারিবাগে থাকবে আর রোজ একবার করে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে যাবে। সুপার দিল ধমকে। —হবে না ওসব, একবার দেখা করার অনুমতিই মিলতে পারে, বারবার হবে না। হায় হায়, হাজার হাজার মাইল পার হয়ে এসেছিল ওরা আমাকে সঙ্গ দিতে, পারলো না। ভারী অপরাধী লাগলো নিজেকে। ওরা বললো, সে যাকগে, তবু তোমাকে দেখার মনোবাঞ্ছা তো পূর্ণ হলো। হয়েছে। ওদের, আমারও। খুব সুন্দর লাগলো। পুরোপুরি মন খুলে কথা বলতে যদিও পারিনি, কেননা চারপাশে ঘিরে বসেছিল সবসময় স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের কয়েকজন অফিসার, আমাদের প্রতিটি কথা হাতের নোট

বইতে লিখে রাখছিল, তবু বলবো যেটুকু সান্নিধ্য পেলাম সেটুকুই আমার লাভ। সুপারের যেন সবই অপছন্দ। এই যে একটু কথাটথা বলছি, এটাও যেন তার চক্ষুশূল। সেই রকমই মুখ করে বসে আছে। নিজের কর্তৃত্ব ফলাতেও কসুর করলো না। আইরিশকে লিখেছিলাম বাচ্চাদের জন্যে একটা রবারের বল কিনে আনতে, ওরা খেলবে। এনেছেও আইরিশ। আমাকে দিতে যাবে, সুপার বাগড়া তুললো।—উঁহু, কোনক্রমেই ওটি দেওয়া চলবে না। আমার কি বাচ্চাদের সঙ্গে খেলবার অধিকার আছে, না মেলামেশা করবার? তবে কোন্ সুবাদে ওদের বল দেবো, আইরিশের আনা মিষ্টি দেবো? কিছুতেই ও ছুটোর জেনানা মহলে ঢোকার ছাড়পত্র মিললো না।

তবে আমার নিজের ব্যবহারের জন্য ওরা যে সব জিনিস এনেছিলো, সেগুলো আমাকে নিয়ে যেতে দিলো। অসুখ থেকে সেরে ওঠার পর খাওয়া দাওয়ার একটু ইচ্ছে ইদানীং হয়েছে। লোভও বলা যায়। কেননা ইংরেজী কাগজ এলে এখন খবরটবর না দেখে আগে দেখি রান্নার পাতা। দেখি আর মতলব ভাঁজি। আমাকে ওরা যে রেশন দেয় তা দিয়ে কেমন করে কত রকমের রান্না করা যেতে পারে। অবিশ্যি দেখা মানেই যে রান্না করে ফেলা, তা নয়। সম্ভবও নয়। কাগজের হিসেব মিলিযে সুস্বাদু খাবার তৈরী করতে যতটা রসদ দরকার এরা তা দেয় না। তাই আইরিশের আনা ফল মেঠাই আর পনীরের কটা টিন পেয়ে বড্ড আনন্দ হলো।

কিন্তু কতক্ষণ! নিতে গিয়ে তো মনের সঙ্গে সেই পুরনো দ্বন্দ্ব। আইরিশকে এ প্রসঙ্গে পরে লিখেছিলাম, তোমার দেওয়া মিষ্টি অতি চমৎকার। কিন্তু প্রাণ ভরে নিতে পারি নি। বিলাস করতে গেলেই আজকাল যেন কেমন লাগে। বিলাস থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে তাই চটপট ওগুলো বিলি করে দিয়েছি, নিজেও নিয়েছি একটু, কিন্তু অপরাধবোধটা কাটেনি। আমার বিশ্বাস, লণ্ডনে ফিরে গিয়েও এবার থেকে আমি এতোটুকু বিরক্ত না হয়ে খুব সাধারণ খাবার যথেষ্ট সন্তুষ্টচিত্তে খেতে পারবো। লণ্ডনকে বঞ্চনা করছি, এই মনোভাবটা তাতে থাকবে না। আর যদি কখনো চাপাটি আর একটু মুসুর ডাল পাই, তবে মনে হবে আমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ।

আরো কটা জিনিস দিয়ে গেছে আইরিশ, আমার গতানুগতিক জীবন-যাপন থেকে একটু মুখ বদলাবার জন্যে। খানিকটা কাপড়, এমব্রয়ডারী সুতো, ছুঁচ আর ছবি আঁকার সরঞ্জাম। এছাড়াও আর কি কি জিনিস আমার দরকার বারবার জিজ্ঞেস করেছে। আমি বলেছি, আর কিছু চাই না। জিনিস দিয়ে হবেই বা

কি, কদিন পরেই তো আমি দেশে ফিরবো। বললাম, লণ্ডনে পৌঁছে অবশ্যই পুরনো আড্ডায় যাবো, আবার সব বন্ধুরা মিলে বসবো আড্ডা দিতে। কটা দিনই বা আর! ওরা পৌঁছবার কদিনের মধ্যেই আমি পৌঁছে যাবো। হায়, 'কদিন' ফুরোতে যে তিন বছর লাগবে তখন কি জানতাম! তিনবছর পরে দেশে ফেরার খবর পেয়ে আইরিশ আর ওর স্বামী তো লাফাতে লাফাতে এসে হাজির। বললো, কলকাতায় ওদেরও সেবার একদফা থানা দর্শন হয়ে গেছে। হাজারিবাগ থেকে ফিরে ওরা গিয়েছিল কোর্টে অমলেন্দুর সঙ্গে দেখা করতে। তারই জের টেনে পুলিস গিয়ে হোটেল থেকে ওদের থানায় নিয়ে যায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে।

শরৎকালে দল ভারী হলো আমাদের, কটি তরুণী, বেশ প্রাণোচ্ছল দিলখোলা, এসে যোগ দিলো। বলা বাহুল্য সকলেই বন্দী। স্বেচ্ছায় আসার কোন প্রশ্নই আসে না। বিকেলবেলা সবাই মিলে আমরা কবাডি খেলতাম, দড়ি লাফাতাম, লুকোচুরি খেলতাম, আরো কত কি। বিল্‌কিশকে ভালো লাগতো সব চেয়ে বেশি। কী ভীষণ প্রাণচঞ্চল মেয়েটা! উনিশ বছর বয়েস, জাতে মুসলমান, প্রতিবেশী একটি হিন্দু ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। সেই চিরাচরিত প্রেমের পরিণতি, প্রেমপত্র লেখালেখি দিয়ে যার সূত্রপাত। এই অপরাধে জেল। ছেলেটিও বন্দী। বিল্‌কিশের অভিভাবক কাকার পরামর্শে পুলিস দুজনকেই জেল বন্দী করেছে। পেছনে মুসলমান সমাজের সমর্থনও আছে। কাকা বলেছে, দুজনকে ফের এক সঙ্গে দেখতে পেলে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। এই ব্যাপার নিয়ে যে কোন মুহূর্তে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লেগে যেতে পারে—এই ভয়ে হাকিম তাদের কাউকেই জামিন দেয় নি। ফলে এই নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয়—এই জেলখানা।

বিল্‌কিশের স্বামী ছোকরাটির বিরুদ্ধে অপহরণ আর ধর্ষণের অভিযোগ। তা এসব অভিযোগের প্রমাণ হওয়া মুশকিল। বিলকিশকে নিজে স্বীকার করতে হবে যে সত্যিসত্যিই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া ডাক্তারী পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপার আছে। বয়েসটাও একটা মূল বিষয়। আঠারো বছরের কম হলেই যে কোনো মেয়ে নাবালিকা এবং তাকে অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে বিয়ে করতে হয়। বিলকিশ যেহেতু উনিশ, সে সাবালিকা। নিজের মন মতো স্বামী পছন্দ করার অধিকার তার আছে। তাহলে এতো সব ঝঞ্ঝাটের কারণ কি? বিলকিশ বললো, স্কুলের পড়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে নাকি কাকার মতলব ছিল এক খুড়তুতো ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার। বুঝতে পেরে আগে ভাগেই সে ছেলেটির সঙ্গে পালিয়ে যায়। কিসের ভয় আর তাদের?

তারা তো এখন স্বামী স্ত্রী। মেয়েটার মনের দৃঢ়তা দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। এতো ঝড় ঝাপটার মধ্যেও মনটাকে শক্ত করে রেখেছে। কাকা রোজ দেখা করতে এসে এক দফা শাসিয়ে যায়। একদিন ও সরাসরি বলে দিল, কাকার সঙ্গে আর দেখা করবে না। কাকা তখন ধরে করে এক ছোট জেলারকে হাত করলো, তার ওপর ভার দিলো বিলকিশকে নিয়মিত ভয় দেখাবার। কত রকম করেই না বলতো সেই ছোট জেলার। আমাদের মহল্লায় এসে বিলকিশকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে এই বিয়ে যে কত দুঃখের হতে পারে, তাই ইনিয়ে বিনিয়ে বলতো। বলতো, বে-জাতে বিয়ে করেছো, এখন তো টের পাচ্ছো না, পরে পাবে। ওরা হিন্দু। ওরা তোমার হাতে খাবে না, তোমার দেওয়া জলটুকু অব্দি ছোঁবে না। আসলে মন ভেঙে দেবার চেষ্টা আর কি। এইভাবে হতোদ্যম করিয়ে তারপর লিখিয়ে নেবে একটা মিথ্যে বিবৃতি, তারই পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীর হবে দশ বছরের জেল। বিলকিশ ফিরে যাবে আবার কাকার বাড়িতে, প্রাপ্য শাস্তিটুকু পেয়ে আবাধ সহজ সুস্থ জীবন যাপন করবে।

এদিকে ওদের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জেল-কর্মচারীদের মধ্যেও পরিষ্কার দুটো ভাগ। একদল ওদের বন্ধু, আরেক দল শত্রু। অদ্ভুত এই বন্ধুদের চরিত্র। দুই ব্রাহ্মণ জেল সেপাই, ভীষণ অত্যাচার করে বন্দীদের ওপর, খুব দুর্নাম, অথচ এই বিশেষ ব্যাপারটিতে ওদের মতো সহযোগী আর নেই। স্বামী স্ত্রী দুটিকেই সুখে স্বচ্ছন্দে রাখার জন্য কী প্রাণান্ত তাদের চেষ্টা। এর পেছনে মনোভাব আমি যেটুকু অনুমান করতে পেরেছি তা এই রকম। দুজনেই হিন্দু। ওরা মনে করে, বিলকিশের এই বিয়ে মুসলমানদের ওপর এক হাত নেওয়ার মতো। হিন্দুদের এটা একটা জয়। জানি না, নিজের মেয়ে বে-জাতে বিয়ে করলে ওরা এতোটা সদয় হতো কিনা বা মত দিতো কিনা। এক্ষেত্রে যেহেতু ব্যাপারটা সম্পূর্ণত অপরের, তাই সদয় হতে কোন বাধা নেই। আর সাবাশ বটে বিলকিশকে! শত্রু মিত্র কাকা ছোট-জেলার —কোন কিছুকেই ওর যেন ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই। ভালবাসার ব্যাপারে কারুর সঙ্গে এতোটুকু আপোষ সে করবে না, মরে গেলেও না। পাঁচ মাস পরে ছাড়া পেয়ে চলে গেলো স্বামীর সঙ্গে বসবাস করতে। একটাই শর্ত, এবং এটা ওরা মেনেও নিয়েছে—স্বগ্রামে ফিরবে না, অন্য কোথাও গিয়ে থাকবে। অথচ ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ওরা আইন এতোটুকু লঙ্ঘন করেনি, এমনকি কোনো অপরাধও করেনি। তথাপি শাস্তি ভোগ করতে হলো।

মোহিনীও জামিনে খালাস পেয়ে চলে গেলো। আমার ঘরে থাকতে এলো রাজকুমারী আর সোমরি। দুজনেই গন্‌ঝু উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত। রাজকুমারীকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতাম। ঝগড়া ঝাঁটি মোটেই পছন্দ করে না, খুব খাটতে পারে আর ভীষণ সিধেসাধা। ছলচাতুরী কাকে বলে জানে না, বিশ্বাস করে একটা কিছু বললে তার মর্যাদা দেয়। সন্ধ্যেবেলা দরজায় তালা পড়ার পর লোহার গারদ ধরে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবে দেশের কথা, গ্রামের কথা, নিজের পরিবার পরিজনের কথা। একদিনও এর ব্যতিক্রম দেখিনি। সোমরি তখন ডাকতো ওকে, সান্ত্বনা দিতো, খেয়ে নিতে বলতো। রাত্রে মাঝে মাঝে নিজের খেয়ালেই গাইতো গান। কী সুর যে ওর গলায়, কী যে অপূর্ব গায়কি! বহু চেষ্টা করেও আমি ওর ধারে কাছে পৌঁছতে পারি নি। সবই লোকসংগীত। রাতের সেই ঝিমধরা নিরালা পরিবেশ। যেন সুন্দর হয়ে উঠতো ওর গানে। কোন বন্দিনীকে আমি এতো সুন্দর গান গাইতে শুনিনি।

সোমরি বিধবা। বছর পঁয়ত্রিশ বয়েস। আচার আচরণে নম্র, শান্ত। পনেরো বছরের একটি ছেলে আছে। সেও জেলে। ভারী স্নেহপরায়ণ মন। আমাকে ডাকতো খুকী বলে। আমার রান্না করে দিতো, স্নান করার সময় পিঠ ঘসে দিতো। শীতকালে রাত্তির বেলা নিজের কম্বলের বেশির ভাগটাই তুলে দিতো আমার গায়ে। আর ভীষণ ভীতু। পোকামাকড় দেখলে ভয় পায়, ভূতে ভয় পায়। এমনকি মজা করে একটা কিছু বললেও মজাটা বুঝতে পারে না, কথাটা বিশ্বাস করে নেয়। আর কী ছেলেমানুষীতে যে পেয়ে বসেছিল আমাকে সেই কটা মাস। খুব ওর পেছনে লাগতাম। আমার চিরুনীটা হয়তো লুকিয়ে রাখলাম ওর বিছানায় বা বললাম খবরদার, পায়খানায় যেও না, ভূত আছে, ও অমনি ভয়ে নাক মুখ কুঁচকে জড়সড় হয়ে বসে রইলো, ঘণ্টার পর ঘণ্টা পায়খানার দিকে তাকালোও না। হাসতে হাসতে তো আমার পেটে খিল ধরার দাখিল। ওর কিন্তু রাগধাপ কিছু নেই। তাকিয়ে রইলো আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে। সে এক অদ্ভুত ভঙ্গি। নাকে সোনার একটা নথ, নেমে এসেছে ওপরের পাটির দাঁত অব্দি। ঠিক নথ বরাবর একটা দাঁত নেই। ফলে সে জায়গাটা ফাঁকা। জিজ্ঞেস করেছিলাম একদিন, দাঁতটা পড়লো কি করে। বলে, রাত্তির বেলা দিশী মদ গিলে মাথায় এক বস্তা চাল নিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিল, পা টলে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। সেই থেকে দাঁতটা উধাও।

ভারতের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ কৃষকের মতো ওরও বাস এমন এক গ্রামে যেখানে বৃষ্টিই সেচের একমাত্র প্রধান উপায়। প্রধান কৃষিদ্রব্য ধান, ভুট্টা এবং যব। চাষীর কাজ শুধু বীজ বা চারা মাটিতে রোপণ করা। এর পরের যাবতীয় ঘটন-অঘটন সব ঈশ্বরের হাতে। এই তিনটি শস্য এবং কিছু জংলা পাতা বা ফলমূল ছাড়া দুনিয়ায় আর যে কোনো খাদ্য আছে বা থাকতে পারে, এটুকুও সোম্‌রি জানে না। হ্যাঁ, ফুলও চেনে। তবে কিনা আলু পেঁয়াজ সে জেলে আসার আগে কখনো খায় নি। কলা নারকেল প্রভৃতি কিছু কিছু বহুল প্রচারিত শব্দ এখানে আসার আগে তার কানে পৌঁছয় নি। তা বলে বুদ্ধি কিন্তু কিছু কম নয়। বেশ চালাক চতুর। বোঝে অনেক কিছু। সরকারী অফিসার বা আমলাদের মোটেই সুনজরে দেখে না। ওরা তো মাঝে মাঝে যায় ওর গাঁয়ে, ছোকরাদের জবরদস্তি সৈন্যদলে ভর্তি করিয়ে নেয়। কি লাভ! ছোঁড়াগুলো বড়লোকদের জন্যে যুদ্ধ করে পটাপট মরে যায়। এটা কি ভাল? কখনো কখনো আবার আরেকদল গিয়ে বলতো, যেন বেশি ছেলে মেয়ে না হয়। কেউ গিয়ে জমিটমি দেবে বলেও প্রতিশ্রুতি দিতো। আজ অব্দি কোন প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি। আর সরকার? সে তো একটা অচেনা মানুষ। সে কেবল ফরমান পাঠায়। বলে, জঙ্গল থেকে জ্বালানী কাঠ কুড়িয়ে আনতে পারবে না। পুকুরে মাছ ধরতে পারবে না। যে জমিতে চাল বোনো সেই জমিতে এবার থেকে তুলো বুনবে—এইসব।

ভারত ছাড়া মাত্র দুটো দেশের নাম জানে সোমরি—একটা পাকিস্তান, আর একটা চীন। শুধু ও নয়, বন্দীদের মধ্যে অনেকেই। এছাড়া পৃথিবীতে অন্য কোন দেশের অস্তিত্বের কথা জানে না। শুনেছে, চীনারা নাকি বুড়ো হলে মানুষকে কেটেকুটে খেয়ে ফেলে আর সাপ খায় আর ধরে ধরে হনুমান খায়। দুটি প্রাণীই সাক্ষাৎ ভগবানের অংশবিশেষ। সুতরাং চীনাদের পাপের আর শেষ নেই। বাধ্য হয়ে চীনের গল্প বলতে হলো। বললাম সেখানকার লড়াইয়ের কথা, পুরনো সমাজটাকে পালটে নতুন সমাজ গড়ার কথা। চীন নিয়ে যা অপপ্রচার শুরু হয়েছে! ভারত সীমান্তে প্রথম দিন ঢুকবার সময়ই আমি স্টেশনে স্টেশনে বইয়ের দোকানে দেখেছি থরে থরে সাজানো বই, সব মিথ্যে অপপ্রচারে বোঝাই। সোমরি চীন সম্বন্ধে যে সব শোনা কথা আমাকে বললো, কে বলতে পারে সেগুলো ঐ সব বই থেকে মুখে মুখে ঘুরতে ঘুরতে ওর কানে এসে পৌঁছয় নি।

শুধু রাজনীতি নয়, আরো নানান গল্প হতো আমাদের। একদিন বললো, জঙ্গলে কাঠ কুড়োতে গিয়ে কিভাবে ওর এক ভায়ে বাঘের হাতে প্রাণ দেয়।

শুনতে শুনতে গায়ের লোম দস্তুর মতো খাড়া হয়ে ওঠে। বিহারের বহু জেলায় এখনো নানান হিংস্র জন্তু আছে। এদের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয় সেখানকার মানুষদের। আমরা বুঝবো কি করে সে কত কষ্টের জীবন! আমরা তো ধরেই নিই সবাই আমাদেরই মতো সুখে শান্তিতে বাস করে।

শুনলাম মহুয়া কুড়োবার কথা। গোটা এপ্রিল মাস জুড়ে চলে এই সংগ্রহ-পর্ব। সকাল থেকে সন্ধ্যে সারা গাঁয়ের ছেলে বুড়ো মেয়ে সারা এলাকা ঘুরে ঘুরে গাছের নীচ থেকে ঝরে পড়া মহুয়া ফুল কুড়োয়। তারপর রোদ্দুরে শুকিয়ে যত্ন করে রেখে দেয়। জুলাই মাস অব্দি এই ফুলই তাদের প্রধান খাদ্য। জলে ফুটিয়ে নয়তো শুকনো ভাজা করে দুবেলা এই দিয়ে পেট ভরায়। জুলাইয়ে ভুট্টা পাকে, ততদিনে সঞ্চয়ও শেষ। এপ্রিলের সেই একটা মাস ধরে কী যে খাটুনি! স্নান করার সময়টুকু অব্দি হয় না। স্নান করতে হলে যে যেতে হবে সেই অনেক দূর, কাছাকাছি তো জল নেই, অতোখানি গিয়ে আবার ফিরে আসতে সময় নষ্ট হবে না! এই সময়টা প্রত্যেক বছর সোমরির মাথায় উকুন হতো। হবেই তো, পুরো একটা মাস ধরে চান নেই, কাপড় ধোয়া নেই, উকুনের আর দোষ কি, তারা তো এই সব সুযোগেরই প্রতীক্ষায় থাকে।

এক সুদ-খোর মহাজনের দোকান চালাতো সোমরি। অর্থাৎ দেখাশোনা করা। মাইনে বলে কিছু পেতো না। কাজের বিনিময়ে পেতো নিজের পেট ভাতা খাবার আর কালে ভদ্রে নিজের আর ছেলের জন্যে একটু আধটু জামাকাপড়। জেলে এসেছে, সে নাকি এক ডাকাত দলকে খাবার যুগিয়েছিল। দলটাকে ধরবার জন্যে পুলিসকে কি কম দুর্ভোগ পোয়াতে হয়েছে! সারা এলাকা জুড়েই ওদের রাজত্ব। বাজারের পথে ব্যাপারীকে ধরে টাকা পয়সা জিনিসপত্র সব ছিনিয়ে নিল, বা বাড়িতে হয়তো কেউ নেই, এই সুযোগে বাড়ি চড়াও হয়ে সব ডাকাতি করে নিয়ে এলো। লুকোতো গিয়ে জঙ্গলে। বেশির ভাগ জঙ্গল থেকেই ধরা পড়েছে। সঙ্গে তিন ডাকাতের তিন বৌ। বৌ তিনটি আমাদের সঙ্গে কিছুদিন কাটিয়ে গেছে। পাহাড়িয়া সম্প্রদায়ের সবাই। পাহাড়েই থাকে। সমভূমিতে নেমে আসে চাষ-বাসের সময়। অনেকটা যাযাবরদের মতো জীবন। এক জায়গায় বেশিদিন বসবাস করে না। বৌ তিনটিকে দেখে মনে হতো ভারী নম্র। ভারী শান্ত প্রকৃতির। ওরাই নাকি লুঠতরাজের সময় সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। কি করে হয় কে জানে।

আমাদের সেলের উলটোদিকে একটা কুড়ে ঘর, তারই চালে বাসা বেঁধে থাকতো একজোড়া পায়রা। কত যে বাচ্চা ওদের, তার যেন আর ইয়ত্তা নেই। অবাক

হয়ে যেতাম ওদের জন্ম দেবার বহর দেখে। দশ দিন বয়েস হলেই অমনি বাচ্চা-গুলোকে ধরে আনতো বন্দীরা, কেটে কুটে রান্না করে খেতো। দশ দিনের বাচ্চায় মাংসের দারুণ স্বাদ। এদিকে যাবতীয় পায়রার মাংসের আইনগত অধিকারী মেটিনী। অন্ততঃ সে সেরকমই ভাবে। তাহলে উপায়! কি করে ওকে ফাঁকি দেওয়া যায়। রাস্তা বেরুলো। বাচ্চা হয়েছে মেটিনী টের পাবার আগেই আমরা বাচ্চা হাপিস করতে শুরু করলাম। সব জমিয়ে রাখা হতো শনিবারের জন্যে। মেটিনীর চোখে ধুলো দিয়ে শনিবার চলতো আমাদের গোপন ভোজ। তালাবন্দীর একটু আগে। তখন তো আর নজরদারী তেমন নেই—একজন দাঁড়াতাম আড়াল করে, বাকী দুজন লুকিয়ে উনুনটা সেলের ভেতর নিয়ে আসতো, রেখে দিতো পায়খানার সিঁড়ির ধাপে, যাতে বাইরে থেকে কারুর নজরে না পড়ে, ইতিমধ্যে বড় জমাদার তার গিন্‌তি শেষ করে তালা বন্ধ করে চলে যেতো, অমনি উনুন নামিয়ে এনে শুরু হতো রান্না। পায়রা না থাকলে চাল, ডাল আলু দিয়ে বানাতাম খিচুড়ী, মাঝে মধ্যে—জমাদারনীকে ধরে বাজার থেকে আনা দু-একটা তরিতরকারীও দিতাম। সে এক মহাভোজ। খাওয়ার পরে শুয়েই মনটা টনটন করে উঠতো। মনে পড়তো অমলেন্দুর কথা। ওকে হয়তো একলাই কাটাতে হচ্ছে। হয়তো সঙ্গী সাথী কাউকে পায় নি। কেমন ভাবে কাটছে ওর দিন! আমাকে তো কিছুই ও জানাবে না। জানালে আমি যে দুঃখ পাবো। ও চায় না। ওর কথা ভেবে আমাকে দুঃখ দিতে। চায় আমি যেন 'সুখে' থাকি।

বাহাত্তরের ডিসেম্বরে এলো একদল সরকারী কর্মচারী। বেশির ভাগই মানসিক হাসপাতালের নার্স বা অন্যান্য হাসপাতালের কর্মী। বেতন বৃদ্ধি, বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা, বাড়িভাড়া ভাতা বৃদ্ধি প্রভৃতি দাবী নিয়ে বিক্ষোভ আন্দোলন করছিল। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে পুলিস সবাইকে জেলে পাঠায়।

তা নতুন বন্দী এলেই আমরা সমস্যায় পড়ি। কিভাবে কি চোখে ওদের দেখবো। সংখ্যাটা যে বড্ড বেশি। একদিক থেকে দেখলে, এলো ওরা, নতুন কিছু মানুষ—আমরা একটু নতুনত্বের স্বাদ পেলাম, ওরাও নতুন কিছু আমাদের দিয়ে গেল। এটা ভালো দিক, সুন্দর দিক। কিন্তু কষ্টের দিকটাও যে আছে। এই এলো এতোগুলো মানুষ, জলের ব্যবস্থা খারাপ, পায়খানা প্রয়োজনের

তুলনায় অপ্রতুল—কি করে সবাই মিলে রয়ে সয়ে থাকবো? সংখ্যায় এখন আমরা মোট আশি জন। আশি জনের জন্যে একটাই জলের কল, কে কতটুকু ছিনিয়ে নিয়ে আসতে পারি তাই নিয়ে যেন দস্তুরমতো একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। আমার পাশের সেলে থাকে এখন চৌত্রিশ জন। এক মুহূর্তের জন্যও নিরালা নির্জন বলে কিছু নেই। হৈ চৈ নয় কথা নয় হুটোপাটি লেগেই আছে। আমার তো লেখাপড়া সব বন্ধ। ডেকে ডেকে নতুনদের সঙ্গে নানারকম গল্প করি, খোঁজ খবর নিই। ওরা সবাই একই ইউনিয়নের সদস্য, তাই খানিকটা জঙ্গীও বটে। অষ্টপ্রহর এটা ওটা দাবীতে বড় জমাদারকে একেবারে নাজেহাল করে তুলতো। দাবী জানায় বা কথাবার্তা বলে খুব দৃঢ়তার সঙ্গে। ভয়ডরের বালাই নেই। এটা বন্দীদের কাছে একটা শিক্ষা। তারাও দৃঢ় ভাবে সাহস নিয়ে হালে কথাবার্তা বলা শুরু করেছে। খাবার নিয়ে অভিযোগ করে বেশ দাপটের সঙ্গে। রান্না তরকারী আসছে তখন শুধু বেগুন পাতা সেদ্ধ। একটা মস্ত টিনের ড্রামে করে উনুনে চাপিয়ে দেয়, নামায় রং একেবারে কালচে হয়ে যাবার পর। দু একটা মোটাসোটা পোকাও মাঝে মধ্যে পাতে পড়ে। সেদ্ধ হয়ে গিয়ে ফুলে ফেঁপে বেশ জুতসই চেহারা হয়। ফলে কেউই বলতে গেলে তরকারী ছোঁয় না। শুধু ভাত বা চাপাটি খায়। জেনেশুনে কে আর অমন পোকার তরকারী খেতে বসে।

হাসপাতালে ঝাড়ুদারীর কাজ বা দাইয়ের কাজ, এমন কি মানসিক হাসপাতালে ধাত্রীর কাজও সাধারণের চোখে ছোট কাজ বলে বিবেচিত হয়। এবং ছোট কাজ করার একমাত্র অধিকারী হরিজন বা খ্রীষ্টান। এরা সকলেই তাই। শুধু একজন বাদে। সে হিন্দু, ভক্ত সম্প্রদায়ের নারী। কিভাবে যে সে এমন একটা কাজ জোটালো সেটাই আশ্চর্য। দেখতাম তার অদ্ভুত অদ্ভুত আচরণ। ঈশ্বরে একান্ত বিশ্বাসী এবং নিজেকে সে দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন বলে মনে করতো। কারুর ছোঁয়া সে খাবে না। অ-হিন্দু বা হরিজনদের হাতে তো নয়ই। যখন রান্নায় বসতো, কাছে কেউ ঘেঁষতো না। দূরে বসে দেখতো। এমন কি জল নিতে যাবার সময়ও হাজারো নিয়ম নিষেধ। সবাইকে সরে যেতে হবে। কলের কাছাকাছি কারুর থাকা চলবে না। থাকলেই জল 'ছোঁয়া' হয়ে গেল। সোমরির কাপড়ে নাকি একদিন সকালবেলা কলসীটা ছোঁয়া হয়ে গেছে, অমনি এক কলসী জল গবগব করে ফেলে দিলো! রান্না করে সে আলাদা বসে খেতো, থালী মগ ধুয়ে রেখে দিতো আলাদা। বাপরে বাপ, অচ্ছুৎদের সঙ্গে যদি সব মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়!

ভারতের মতো ধর্মনিরপেক্ষ একটা রাষ্ট্রে জাতপাত নিয়ে কি জুলুমই না চলছে। অবাক হয়ে শুধু সব দেখতাম। জাত নিয়ে যে এতো ঝামেলা আগে কি বুঝেছি। তখন তো জানতাম, ইতিহাসে যেমন বলা আছে, হিন্দুদের মধ্যে চারটি মাত্র শ্রেণী। শুনলাম, সব মিলিয়ে নাকি এই চারটের মোট আড়াই হাজার ভাগ। প্রতিটি বিভাগে বিয়ে থা হয় সেই বিভাগেরই ছেলেমেয়ের সঙ্গে। প্রতিটি বিভাগেরই নিজস্ব কঠোর সব রীতিনীতি আছে। যার সঙ্গে অন্য কোন বিভাগের রীতিনীতির মিল নেই। রাজকুমারী বললো, তার নাকি নিজের জাত এবং ব্রাহ্মণের হাতে ছাড়া অন্য কারুর হাতে রান্না-ভাত খাওয়ায় নিয়ম নেই। শুকনো খাবার হলে অবিশ্যি কিছু যায় আসে না। সেটা যে কেউ রান্না করতে পারে এবং তার খেতেও কোন বাধা নেই।

এক হিন্দু জমাদারনীকে দেখি এমনই কিছু অদ্ভুত নিয়ম মানতে। বহুদিন হলো চাকরী করছে, তবু এখনো কোন নিয়মটাই ত্যাগ করতে পারে নি। মাছ মাংস ডিম যে খায় তার বিছানায় সে শোবে না, এমনকি যে উনুনে ঐ সব রান্না হয় সেখানে সে তার নিরামিষ রান্না রাঁধবে না। শনিবার শনিবার পায়রা রাঁধার আগে খোঁজ নিতাম, সে ত্রিসীমানায় আছে কি না। টের পেলেই হয়তো চিৎকার চেঁচামেচি করে কি না কি কাণ্ড বাঁধিয়ে বসবে। কারুর জামাকাপড় সে ছোঁবে না, নিজের কম্বল ভাঁজ করে আলগা ভাবে এক ধারে সরিয়ে রাখবে, যাতে কারুর ছোঁয়ায় আবার না 'অচ্ছুৎ' হয়ে যায়। এদিকে মেয়ে মহলে না থেকেও উপায় নেই। সন্ধ্যেবেলা বড় জমাদার গেট বন্ধ করে যায় আর খোলে সেই ভোর ছটায়। আমাদের দেখভাল করার জন্যে যে জমাদারনীকে সেই সময়টুকু আমাদের সঙ্গে বন্দী হয়ে থাকতেই হবে।

নতুন কোন বন্দী এলেই সবাই ঘিরে ধরে তাকে প্রথম প্রশ্ন করে— কি জাত? জবাব মেলার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক হয়ে গেলো সব। অর্থাৎ তার প্রতি কিরকম আচরণ হবে বা কে তার সঙ্গে মিশবে কি মিশবে না। আগে থেকে সব কিছু একটা ধরে নেবার ব্যাপার থাকে। কোন্ জাতের লোক কিরকম কি করবে না করবে সব যেন আগে থেকে মুখস্থ। সেই আমাদের ইংরেজী প্রবাদটার মতো। স্কটল্যাণ্ডের মানুষ মানেই হীনমন্য আর আয়ারল্যাণ্ড কারুর দেশ হলেই সে কুঁড়ে।

জাত পাত নিয়ে আমার কোন বালাই নেই। সবার সঙ্গে মিশি, খোলা মন নিয়ে কথা বলি। ওরাও বেশ আনন্দ পায়, আমার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মানিয়েও নেয়। দু' একবার অবিশ্যি জেল কর্মচারী দু একজন বিশুদ্ধ হিন্দুর সঙ্গে এই নিয়ে একটু

কথাকথি হয়েছে। যেমন বড় জমাদার। ব্রিটেন সম্বন্ধে সে একটা কথাই জানে। ওখানকার লোকেরা গোস্ত খায়। আমার দিকে মাঝে মাঝেই তাকিয়ে জিভ দিয়ে একটা চুক চুক শব্দ করতো আর বলতো, তোমরা বাপু বড্ড খারাপ জাত, খুব খারাপ। সে যে আমাকে পছন্দ করে না তাতে আমার ভালোই লাগতো। অন্ততঃ বাইরের কেউ দেখা করতে এলে মিষ্টি এটা ওটা যা খাবার দিয়ে যেতো, তা পুরো-পুরিই পেতাম। জাত মার যাবার ভয়ে লোভ সংবরণ করে হাতটা অন্ততঃ গুটিয়ে রাখতো। একবার এক কাণ্ড। ব্রিটিশ হাই কমিশন থেকে একজন দেখা করতে এসে আমার জন্য এক টিন গোস্ত আর এক টিন সুরুয়া দিয়ে গেল। নিয়ম হলো স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের এক পুলিস আগে সব দেখে শুনে পরখ করে তারপর ভেতরে আনতে দেবে। সে আবার কট্টর হিন্দু। ফলে টিনদুটো ছুঁলোই না এবং আমার অমন প্রিয় গোস্ত ভেতরে আসার অনুমতিও পেলো না।

যে কোন কারণেই হোক, সমাজের উন্নতি যারা চায় না, জাতপাতের কড়াকড়ি তারাই জিইয়ে রাখে। জমাদারনী একদিন এরই একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলো। তাদের গাঁয়ে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা নাকি সবাইকে হুঁশিয়ারি দিয়েছে কেউ যেন ভুলেও তার ছেলেকে পাড়ার ইস্কুলে না পাঠায়। সেখানকার কয়েকজন শিক্ষক নাকি খ্রীষ্টান এবং হরিজন। বলে দিয়েছে যদি পাঠায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সে জাতচ্যুত হবে এবং হাজার চেষ্টা করলেও সেই জাতে আর উঠতে পারবে না।

খ্রীস্টমাস আমার সে বছর ভালোই কাটলো। হাসপাতাল কর্মীদের অনেকেই খ্রীষ্টান। নাচে গানে হৈ হট্টগোলে সকাল থেকে সন্ধ্যে অব্দি মুখর করে রাখলো আমার ঘরের সামনের উঠোনটুকু। দুদিন পর আমার হপ্তার রেশনের মধ্যে দেখি ছোট্ট একটা চিরকুট, আমাকে 'প্রিয় ভগিনী আমার' সম্বোধন করে লিখেছে আমাকে যে কোন রকম সাহায্য করতে সে প্রস্তুত। কে লিখেছে বুঝলাম। পুরুষ বিভাগের এক ছোকরা কয়েদী। আমাদের এ মহলে মাঝে মাঝে এটা ওটা কাজ নিয়ে আসে। আলাপ পরিচয় হয়েছিল। খ্রীস্টমাসের দিন ওকে আমি মেঠাই খাইয়েছি। আন্তরিকতায় নাড়া লেগেছে মনে। তাই প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে চিরকুট লিখেছে। যদি ধরা পড়তো, প্রচণ্ড ধোলাই তো খেতোই, উপরন্তু ডাণ্ডা শিকলি এবং একক নির্বাসন। যা হোক, সেই থেকে চিরকুট দেয়া নেয়া পর্ব শুরু হলো। দুজনেই দুজনকে লিখি। চললো বেশ কয়েক মাস। ইতিমধ্যে একটা বড় দুঃখ ও পেলো। ওর বাচ্চা মেয়েটা মারা গেছে। এদিকে ছাড়া পাওয়ার সংবাদও এলো। ছাড়বার মালিক ছোট জেলার বললো পঁচিশ টাকা দিতে হবে, সে ই নাকি বহু কষ্টে এক

মাসের হাজতবাস ওর মকুব করিয়ে দিয়েছে। তারই মূল্য পঁচিশ টাকা। অনাদায়ে আরো এক মাস জেল। এদিকে মেয়ে মারা যাবার পর বাড়িতে যাবার জন্য মন ওর উদগ্রীব। ছিলো টাকা। ছাড়া পেলো। নতুন করে আবার আরেকটা ধাক্কা খেলাম। একটা ভাই পেয়েছিলাম মনের মতো, আদরের ভাই—সে-ও আমাকে একলা ফেলে চলে গেলো।

বড় সাহস ওর। সব বিপদ তুচ্ছ করে বিশাল বন্দীদের খবরাখবর আমায় এনে দিতো, যোগাযোগও যা কিছু হতো, ওরই মাধ্যমে। অসীম চ্যাটার্জীর সঙ্গেও যোগাযোগ ও-ই করিয়া দেয়। অসীম তখন নির্জন বন্দী, ডাণ্ডা শিকলি বাঁধা সাক্ষী বলতে দুই জেল সিপাই আর এক বড় জমাদার। অষ্টপ্রহর এরা ওকে নজরে রাখে। এমনকি একটা পেন্সিল আর এক দিসতে কাগজও দেয় নি। এদিকে মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের জেলে কেন একটা রেডিও দেওয়া হলো না, এই নিয়ে ভারত সরকারের মাথাব্যথার অন্ত নেই। জোর প্রচার চলছে কাগজে কাগজে। পাশাপাশি অসীমের অবস্থাটা চিন্তা করুন। বিচার হলো না, রায় বেরুলো না, আগে থেকেই তাকে ধরে নেওয়া হলো দোষী এবং সেইভাবে তাকে নির্জন কারাবাসে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ডাণ্ডাশিকলের বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখে দিলো দিনের পর দিন। একে প্রহসন ছাড়া আর কি বলবো।

হাসপাতাল কর্মীরা ধর্মঘট তুলে নিয়েছে, তাই ছাড়া পেলো সবাই। কয়েকজনের চাকরি গেলো। কারণ সরকারী নির্দেশ মেনে তারা কাজে যোগদান করেনি। যারা যোগ দিয়েছে কেউ ধর্মঘটের কদিনের জন্য মাইনে পেলো না। অর্থাৎ সাদা কথায় এমন একটা জোর লড়াই করেও লাভের ঘরে শূন্য। এদিকে সরকারেরও নাজেহাল অবস্থা। একের পর এক ধর্মঘটের জের চলেছে তো চলেছেই, খুচরো ঝঞ্ঝাটেরও কামাই নেই। জেলখানার জীবন একেবারে ঝালাপালা। রোজই নিত্য নতুন বন্দীর আগমন। জেল কর্তৃপক্ষ প্রাণপণ চেষ্টা করছে তাদের বেকায়দায় ফেলার। তারাও সজাগ। প্রতিটি বন্দীই জঙ্গী, জেলে এসে সবাই এককাট্টা, প্রত্যেকে তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন এবং সর্বোপরি ভয়ডর কারুর মনে আছে বলে মনে হয় না। অধিকার আদায়ের জন্য তারা দরকার হলে মরণপণ লড়তে পারে। ফলে নতুন চেহারা নিয়েছে জেলখানা। কি যে করবে এদের নিয়ে ভেবে ভেবে কর্তৃপক্ষের মাথায় চুল ছেঁড়ার দায়। এদিকে আটক করেছে সরকারের নির্দেশে। সরকার বলেছে কোনরকম অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা না দিতে। এরাও ছাড়ার পাত্র নয়। নিজেদের পাওনাটুকু যে কোন প্রকারে

মিটিয়ে নেবেই। ফলে সোজা রাস্তাটাই বেছে নিয়েছে জেল অফিসাররা। ভুলেও কেউ আর এদিকে মাড়ায় না। কে জানে এলে যদি দুশমনদের মুখোমুখি পড়ে নতুন কোনো ঝঞ্ঝাট সৃষ্টি হয়।

বরং এই ভালো। আমরাও এরকমই চাই। হোক অসুবিধা, কদিন নয় স্নান না করেই কাটানো যাক, তবু এ অনেক শান্তির। ওদের জঙ্গী মনোভাব আমাদের নতুন একটা শিক্ষা দিচ্ছে। ভারতীয় জনগণের লড়াকু মনোভাবের সাক্ষর রাখছে ওদের জঙ্গী আচরণে। দ্বিতীয়তঃ জেল কর্তাদের অন্ততঃ কিছু দিনের জন্যে তো আমাদের ওপর থেকে নজরের কড়াকড়ি কমাতে পেরেছে। কদিন বেশ একটু আরাম করছি। এটাই বা কম কিসের।

হাসপাতাল কর্মীরা চলে যাবার কদিন পরেই মস্ত একটা নাড়া পেলাম। একদিন সকালে পুরনো বন্দিনীদের কজন বললো, আগের দিন রাত্রে তারা ডরমিটরিতে বসে আলোচনা করেছে। বছরের পর বছর কেটে গেলো—কই, তাদের তো বিচার শুরু হলো না। কতদিন আর জেলে থাকতে হবে, তাও কারুর জানা নেই। সহ্যের সীমা পেছিয়ে গেছে, এখন তারা মরীয়া। ঠিক করেছে সেদিন থেকেই অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন ধর্মঘট শুরু করবে। মূল দাবী দুটো। মামলা সত্বর চালু করা, জেলখানার খাবার এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার আশু উন্নয়ন। খুব ভালো লাগলো শুনে। সাবাস দিলাম। সাহস দিলাম। বললাম, লড়াইয়ে যেন সবাই এককাট্টা হয়ে থাকে, সিপাইয়ের শাসানি দেখে যেন ভয় পেয়ে ধর্মঘট তুলে না নেয়। তাহলে কিন্তু লাভের চেয়ে লোকসানই বেশি। বললাম, আমিও আছি তোমাদের সঙ্গে, আমিও অনশন করবো।

সকাল থেকেই শুরু হয়ে গেলো। মেটিনী ছাড়া কেউই ছোলা নিলো না, গুড় নিলো না। সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলো। বড় জমাদার তখন ছুটিতে। এলো তার সহকারী, ছোট জমাদার। রোগাটে চেহারা, মুখের রেখা কঠিন। ঢুকেই বলে—আরে, ঐ নকশালীটা ওদের সঙ্গে এখানে কি করছে? ওরই মন্ত্রণা সব। আগে ওকে সেলে বন্দী করো। আমি তো চুপ। টুঁ শব্দটি নয়। এক বন্দিনীকে ইশারা করলাম দাবীর কথাগুলো বলতে। শুরু সবে করেছি কি করে নি, জমাদার থামিয়ে দিয়ে আবারও আমাকে কয়েদ করার আদেশ দিলো। যে মেয়েটা কথা বলতে শুরু করেছিল, তাকেও কয়েদ করা হলো। তারপর সে কি গালাগালি আর হুমকি। —তোরা বেশরম, অকৃতজ্ঞ, তোদের হাজার অন্যায় সত্ত্বেও সরকার তোদের খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে। আর তোরা কিনা তারই বিরুদ্ধে অপবাদ করিস্?

সাহস হয় কেমন করে? জিভে একটু আটকায় না? শুনে সব্বাই একে একে রাজা। বাটি পেতে একের পর এক ছোলা নিলো, গুড় নিলো। বললো, ধর্মঘট আর করবে না। খাওয়ার সময় আরেক দফা শাসিয়ে গেল জমাদার—খবরদার, নকশালীটার সঙ্গে কেউ একদম মিশবি না। তালা খুলে দিতে বলে গেলো আমার। কিন্তু নির্দেশ হলো. কেউ যেন আমার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ না পায়।

সন্ধেবেলা আবারও সে এসেছে আমাদের গুণতি করে তালাবন্ধ করতে, তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে বিলকিশ আমার হাত ধরে বললো, চলো দিদি, আমরা বাগানে একটু ঘুরে আসি। এদিকে রাজকুমারী আর সোমরি জমাদারণীকে জানিয়ে দিয়েছে ওরা আর তার বিছানা পেতে দিতে পারবে না। জমাদারণী নাকি ছোট জমাদারের নির্দেশ মতো সারাদিনমান ওদের দুজনকে আমার কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। এটা তারই বদলা। ওকে নাকি বলেও দিয়েছে, ওর সঙ্গে আর ওরা কথা বলবে না। বললাম, কি দরকার এ সব ছেলেমানুষী করার। জমাদারণী তো তার যা কাজ তাই করেছে। বললাম বটে মুখে, কিন্তু মনে মনে খুব আনন্দ হলো। লেখাপড়া শেখেনি, তবু কেমন আমলাগিরিকে কলা দেখাচ্ছে। একে সাহস ছাড়া বলবো কি।

তার মানে নকশাল ভূতের ভীতি এখনো সরকারের ঘাড় থেকে নামে নি, যদিও কাগজে কলমে লিখছে সব নাকি নিশ্চিহ্ন করে দিতে পেরেছে। এদিকে নানান সূত্র থেকে খবর পাই নকশাল অস্তিত্ব আগের মতোই বর্তমান। স্বরাষ্ট্র দফতর সরকারকে বলেছে, উগ্রপন্থীদের ওপর তারা সর্ববিধ সতর্ক নজর রাখছে। অথচ উত্তরবঙ্গ থেকে এই সেদিনও রাইফেল ছিনতাইয়ের খবর পেলাম। খবর পেলাম বর্ধমানের কাঁকসা জেলায় নাকি পুলিসের জরুরী ক্যাম্প বসেছে এবং গ্রামটিকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। কাঁকসার আদিবাসী মানুষেরা সমস্ত জমিদারদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এতোদিনের দাসসুলভ অত্যাচারের বদলা নিতে শুরু করেছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায় পুলিসের উদ্দেশ্যে এক বাণীতে বলেছেন, তারা যেন গ্রামবাসীদের সঙ্গে বন্ধুসুলভ আচরণের মাধ্যমে তাদের মন জয় করার চেষ্টা করে। যথারীতি তাতে সাড়া মেলেনি। সত্তর একাত্তরের পুলিসী সন্ত্রাস প্রত্যক্ষ করেছে যে গ্রামের মানুষ, পুলিসের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে তারা একান্তই নারাজ। সাতষট্টি থেকে উনসত্তরের সেই বিপ্লবী জোয়ারের তেজটা যদিও বর্তমানে নেই এবং তা ফিরিয়ে আনা যদিও সময় সাপেক্ষ, তবু সব যে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তা নয়। ঢেউ আছে, ঢেউ চলছে।

পাশাপাশি চলছে সরকারের দমন পীড়নের নীতি। ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওরা

সর্বশক্তি নিয়ে। চালু হয়েছে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইন, যার সংক্ষিপ্ত নাম মিসা। এছাড়া আরো নানান নামের দমন মূলক আইন তো আছেই। কলকাতায় স্টেটস্‌-ম্যান লিখেছে, শুধু নাকি পশ্চিমবঙ্গেই তিন মাসে মিসায় আটক হয়েছে সাতশো পঁচাত্তর জন। তিয়াত্তর সালের শুরুতে তো অন্ধ্রে দাঙ্গাই শুরু হয়ে গেল। কাগজেই পড়লাম, অন্ধ্রের জনতা স্টেশন পুড়িয়ে, ডাকঘর পুড়িয়ে, সৈন্যদলকে আক্রমণ করে, সি. আর পি-র সঙ্গে লড়াই করে সাংঘাতিক কাণ্ড বাঁধিয়ে তুলেছে। আরো সি. আর. পি পাঠানো হচ্ছে তাদের দমন করার জন্য। সারা দেশটা যেন তপ্ত তরলের মতো টগবগ করে ফুটছে, ফুঁসছে।

দেশে ফিরে যাবার কথা ততদিনে প্রায় বিস্মরণের পর্যায়েই পৌঁছে গেছে, হঠাৎ কলকাতা ডেপুটি হাই কমিশন অফিসের এক সেক্রেটারী এসে হাজির। বললো, সর্বান্তঃকরণে তারা তাদের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং কাজও ঠিক ঠিক ভাবেই এগোচ্ছে। শুধু সরকারী গাড়ির চাকাটা একটু ঢিমেতালে চলে তো; এই যা অসুবিধে। তবে চিন্তা নেই, শিগগীরই একটা খবর আসবে। আর হ্যাঁ, ফেরবার টিকিটের খরচ আমি যোগাতে পারবো তো? কি করে পারবো! আমার টাকা পয়সা যে সব পুলিসের হেফাজতে। সে কি আর ওরা দেবে? এদিকে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবকে বলতে বড় লজ্জা লাগে। ঢের ঢের বিরক্ত করেছি এতোদিন, আর কি বলতে মন চায়! তবু পাছে টাকা পয়সার অভাবে যাওয়া পিছিয়ে যায়, তাই আমার বন্ধু রুথকে একটা চিঠি লিখলাম। বছর দুই পর লণ্ডনে ফিরে শুনলাম রুথের অভিজ্ঞতা। চিঠি পাওয়া মাত্র তো তড়িঘড়ি টাকা যোগাড় করে ও তৈরী; এমনকি খালি পায়ে ফিরবো আমি তাই একজোড়া চটি অব্দি কিনে ফেলেছে—এদিকে বিদেশ দপ্তর থেকে তেমন সাড়া নেই। দেখা করলেই বলে, টাকা পয়সা নিয়ে তৈরী থাকুন, খবর এলেই খবর দেবো। কিন্তু খবর কি অতো সহজে আসে!

এদিকে সেক্রেটারী চলে যাবার পর ক'মাস আর কোন সাড়া শব্দ নেই। সব চুপচাপ। আমিও চাইছি ব্যাপারটা প্রাণপণে ভুলে যেতে। কিন্তু পারি না। মাঝে মধ্যে আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধবদের চিঠি এসে মনটা বড় উতলা করে দেয়। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখেও মাঝে মাঝে চমকে উঠি। আর অমনি রাগ হয়। সব রাগ গিয়ে পড়ে হাইকমিশন বাবুদের ওপর। দেখা করতে এসে ফেরার কথা পাড়লেই চিড়বিড়িয়ে উঠি। সহ্য হয় না যেন ওদের। সবাইকে মাতিয়ে তুলে দুশ্চিন্তায় ফেলে বাবুরা এখন চুপচাপ। বাবা মা বন্ধু বান্ধব কে না ভাবছে আমার

ফেরা নিয়ে! অপারেশনের পর অসুস্থ আমার মা—তারও এক একটা চিঠি পড়ে কান্নায় আমার চোখ ভারী হয়ে আসে। একবার আর থাকতে না পেরে নিজেই লিখলাম হাই কমিশন অফিসে। কতদূর কি এগোলো খোঁজ নিয়ে আমাকে জানাতে। নির্ঘাৎ সে চিঠি তাদের হাতে পৌঁছয় নি, কেননা ভালো মন্দ কোন জবাবই পেলাম না।

তিয়াত্তরের ফেব্রুয়ারীতে জামিনে খালাস দুজন বন্দী আবার জেলে ফিরে এলো। দু বছর আগে খালাস পেয়ে চলে গেছে। আবার এলো দু বছর পর। দুজনকেই চিনি—বুধনী আর ওর শাশুড়ি। বুধনীর স্বামীও জেলে। তার জামিন-টামিন হয় নি। বুধনীও পারে নি এক বছরের মধ্যে এসে একবার তার সঙ্গে দেখা করতে। আসবে কি করে। আসতে যে পয়সা লাগে, খরচ হয়। জেলেও তো ফেরত এলো একই কারণে। কোর্টে মামলার তারিখ পড়েছিল, ওরা ছ টাকা খরচ করে কোর্টে হাজিরা দিতে আসতে পারে নি। ইতিমধ্যে মামলার খরচ চালাবার জন্যে জমি বেচেছে, বাড়ির যাবতীয় জিনিসপত্র বেচেছে, এমনকি গয়নাগাঁটি যেটুকু ছিলো তা-ও বিক্রী করে দিয়েছে। তবু মেটে নি মামলা। বাড়িতে বিনা লাইসেন্সে অস্ত্র রাখার অভিযোগ। তাই জেল, তাই জামিন, তাই মামলা, তাই ফের জেল। সহায় সম্বল হারিয়ে গত একটা বছর গতর খেটে পেট চালিয়েছে। আবার হাজত খাটতে এলো। কে জানে কতদিন আবার থাকতে হবে।

দেখতে দেখতে হিন্দুদের হোলি উৎসব এগিয়ে এলো। অর্থাৎ মার্চ মাস। ফেরার ব্যাপারে কোন সাড়া শব্দ নেই। ছটা মাস পার হয়ে গেলো। ইচ্ছে হলো, থাক হাই কমিশন থেকে কেউ দেখা করতে এলে আমি আর দেখা করতে যাবো না, তুলে নেবো আমার স্বদেশে ফিরে যাবার দরখাস্ত। কিন্তু তাতে লাভের চেয়ে লোকসানই বেশি। এটাকেই ওরা বিকৃত করে বাজারে ছাড়বে, আমার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সবাইকে ভুল বোঝাবে। এ সুযোগ ওদের হাতে করে তুলে দেওয়া অর্থহীন।

এই সব নিয়েই সাত পাঁচ চিন্তায় আছি। এমন সময় এপ্রিল মাসে বোকা বানাবার ঠিক আগের দিন অর্থাৎ একত্রিশে মার্চ খবর এলো, পরদিন সকালেই আমাকে জামসেদপুর জেলে বদলী করা হবে।

রাত্রে চাল ভেজালো রাজকুমারী—তিলে তিলে তার এতোদিনের সঞ্চয়, বিনিময়ে পাবে একটু তামাক তাই এতোদিন জমা করে রেখেছিলো, আজ নির্দ্বিধায় তার মায়া ত্যাগ করলো। পরদিন ভোর সকালে উঠে বাটলো সেই চাল, তাই দিয়ে বানালো সরুচাকলী—আমি যে খুব ভালবাসি খেতে। নাগোর পর নতুন মেটিনী এসেছে বাল্‌কো, সে বানালো ময়দার হালুয়া। ডর্মিটরিতে কম্বল বিছিয়ে বসলাম আমরা গোল হয়ে, সবাই মিলে মিশে খেলাম। মায়া তো, তিন তিনটে বছর এক সাথে ওঠা বসা কত গল্প কত সুখ দুঃখের অংশীদারী—মন কি বিদায় দিতে বা নিতে চায়! সার বেঁধে এলো সবাই ফটক অব্দি আমাকে এগিয়ে দিতে, চোখে আমার জল, ওদেরও চোখ ভরা কান্না—জানিনা হয়তো এই শেষ দেখা। সব পেছনে ফেলে আমি অফিস ঘরের দিকে এগিয়ে চললাম।

মনের দুঃখটুকু নিয়ে একটু যে বিলাপ করবো, তারও কি উপায় আছে। দয়া মায়ার কি এতোটুকু স্থান আছে অফিসঘরের ঐ মানুষগুলোর মনে! পেঁছবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো ওদের কাজ। আমার খাঁকি রঙের ঝোলা কটা আঁতিপাতি করে খুঁজলো, সব ঢেলে ফেললো মেঝের ওপর—আমার চিঠি, আমার জামাটামা, মায় আমার মাসিকের সময়কার দরকারী কাপড়—সব। আড়াল বলে কিছু আর নেই যেন। সবাই সব কিছু দেখতে পাচ্ছে। নতুন অনেক যাত্রী এসেছে তো, আর কিছু স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের পুলিশ—সব আমার বদলী উপলক্ষ্যে। এতোদিন বলতে গেলে খোলামেলাতেই সবার চোখের সামনে ছিলাম, কখনো মনে হয় নি এতো আদুর ভাব। আজ যেন তাই লাগলো। পাটনা থেকে দুটি মেয়ে পুলিসও এসেছে। আমাকে নিয়ে গেলো বাথরুমে, কাপড় ছাড়িয়ে আদুর গা করে সায়াটায়া সব ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলো। পাছে কোন গোপন বা অন্যায় কিছু আমি আবার এই সুযোগে পাচার করে না নিয়ে যাই। একজন তো শাড়ির পাড় দুটো অব্দি আঙুল দিয়ে টিপে টিপে পরখ করলো। আমাকে বললো, কত্তা একটা ভালো শাড়ীও তোমাকে কিনে দেয় নি? কিছু বললাম না আমি! ভালো শাড়ীই ছিলো এতোদিন। আসার আগে এক বন্দিনীর সঙ্গে বদলা বদলি করে তারপরে এসেছি। আমার শাড়ীটা যে তার খুব ভাল লাগতো।

তিনখানা গোট পুলিসের গাড়ি চলবে আমাদের আগে পিছে। তিন গাড়িতে মোট সতেরো জন সশস্ত্র যাত্রী, দুটি মেয়ে পুলিস আর বিস্তর স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের সেপাই। এক জমাদারনীও আছে। আমাদের গাড়িটা থাকবে মাঝখানে। সে যা রোমাঞ্চ আমার! কতদিন পরে আবার দেখছি খোলা আকাশ, উদার প্রকৃতি আর মানুষ হাঁটে, এক প্রান্তের সঙ্গে আরেক প্রান্ত জুড়ে দেয়—এমনই একটা খোলা মেলা রাস্তা। এখানে পাঁচিল নেই যে চোখ বারেবারে ধাক্কা খাবে, আটকে যাবে। গাড়ি চলছে। একটু পরে শুনি সামনের জীপে কে যেন একজন গান গাইছে। মন্দ লাগছে না। গল্প করছে বাকী সবাই। আমার গাড়ির চালক পথের ধারে এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে কটা পেঁপে কিনলো, ভাগাভাগি করে সবাই মিলে খেলাম। গল্প জুড়ে দিলো আমার সঙ্গেও। অমলেন্দুর কথা, আমার নিজের কথা, ইংল্যাণ্ডে আমার আত্মীয় স্বজনের কথা, মায় রাজনীতি অব্দি। অবাক ব্যাপার—আগেও আমি অন্য কয়েকটি ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি—এদের কিন্তু নকশালদের প্রতি দরদ আছে। দরদ নিয়েই তাদের কথা শোনে, তাদের তুচ্ছ জ্ঞান করে না।

জামসেদপুরে পেঁছিতে পেঁছিতে রাত। না হবার তো কোন কারণ নেই, প্রায় একশো ত্রিশ মাইল দূর হাজারিবাগ থেকে। জেলার অপেক্ষায় ছিলো কখন আমি আসি। ছোট্ট অফিস ঘর। ঢোকামাত্র আমার নাম ধাম লিখে নিলো, ঝোলাগুলো বললো রেখে যেতে, পরীক্ষা করে পর দিন পাঠিয়ে দেবে। জমাদারের পেছন পেছন চললাম নিজের ঘরের দিকে। ঘর না বলে কুঠরি বলাই সঙ্গত। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে হাজারিবাগের ঘরখানার ঠিক অর্ধেক। চারপাশে ঘেরা উঠোন। উঠোনের চারদিকে ঘোরানো পাঁচিল। আট ফুটের মতো উঁচু। বাইরের দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এমনকি মেয়ে মহলের অন্য কারো সঙ্গে যোগাযোগেরও কোন উপায় নেই। বড় ক্লান্তি তো তখন। অতোখানি রাস্তা টানা জীপে আসার যন্ত্রণা। শরীর আর যেন বয় না। অমনি জমাদার চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুমে চোখ আসছে জড়িয়ে। এরই মাঝে এক বৃদ্ধা জমাদারণী এলো আমার তালা পরখ করতে, দুটো একটা কথা বলে চলে গেলো। আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমোবার আগে মনে ভাসছিল জেলারের একটু আগে বলা একটা কথা—আপনার মামলা দুদিন্ পরেই শুরু হবে।

ঘুম ভাঙলো, তখনও ভোরের আলো পুরো ফোটেনি। আকাশে আলোর একটা আভা। ঘড়ি টড়ি তো নেই, আকাশ দেখেই এতোদিন ভোর কি রাত গভীর এসব বুঝবার কৌশল আয়ত্ত করেছি। কম্বল গুটিয়ে একধারে সরিয়ে

রাখলাম। এখুনি আসবে জমাদার আমার তালা খুলে দিতে। বসে আছি তো বসে আছি ঠায়, সে আর আসে না। আলোও দেখি আর বাড়ে না, রাতটা যেন অবাক কাণ্ড থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। তখন তো বুঝিনি, পরে সত্যি ভোর হতে টের পেলাম। ওটা ইস্পাত কারখানার চুল্লীর আভা। সারা রাত শহরের যে কোনো প্রান্ত থেকে ঐ আভা দেখতে পাওয়া যায় এবং আনকোরা মানুষ ওটাকেই ভোরের আভা বলে ভুল করে।

জামসেদপুর আর হাজারিবাগ যেন আকাশ পাতাল তফাৎ। সে শহরে শহরই বলুন, কি এই জেল। বড় নিরিবিলি নিরালা হাজারিবাগ। শীতটাও বড় মিঠে। তাই তো অতো খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক আর অবসর প্রাপ্ত হোমরাচোমরা সরকারী অফিসের কর্তাব্যক্তিদের ভিড়। আর এটা তো পুরোদস্তুর শহর। বা বলা যায় ভারতের প্রাচীনতম শিল্প শহর। এই শতকেরই প্রথম দিকে টাটা পরিবার ইস্পাত কারখানার ভিত গাড়ে। ভারতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পপতিদের মধ্যে অন্যতম এই টাটা। ইস্পাত কারখানা স্থাপন হওয়ার পর আরো অনেক কারখানা এখানে গড়ে উঠেছে। সবই কিন্তু আদিবাসী এলাকায়। মাটি তো খনিজ সম্পদে বোঝাই। তামা, ইউরেনিয়াম আরো কত কি-ই না আছে। লোভে লোভে এসেছে বিদেশী পুঁজি আর দেশী পুঁজির যতসব হকদার। আদিবাসী মানুষ দুই পুঁজির তাড়নায় ক্রমশ শুধু পিছু হটছে। হটতে হটতে এখন তাদের বাস জঙ্গলে। গড়ে উঠেছে বিশাল শহর। খাস নাম জামসেদপুর, তবে সবাই বলে টাটা। এখানে সব কিছুই টাটার। এমনকি আমি যেখানে আছি এই জেলখানাটাও।

কিন্তু ছোট খুব। আর তেমনই ভিড়। একশো সাঁইত্রিশ জন স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে, সেখানে বন্দীর সংখ্যা তখন প্রায় সাতশো। সে যে কী করুণ অবস্থা! একমাত্র আমিই আছি বলতে গেলে রাজার হালে। কাজের লোকও কম। অর্থাৎ বন্দীর তুলনায়। ফলে কাজকর্ম যৎপরোনাস্তি বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। হাজারিবাগ জেলের চেয়েও বেশি। প্রথম দিন ঘুম থেকে উঠে দেওয়ালের দরজাটা দিয়ে একবার ওধারে তাকিয়েছিলাম। ওরই নাম জেনানা মহল। চৌকোটে খাঁচার মতো একটা একতলা বাড়ি, একটাই টানা ঘর, সবাই সেখানে থাকে। হাজারিবাগে তবু একটু খোলা মেলা লাগতো। নেই একটা গাছ, নেই কোন কিছু। শুধু চার পাশে ঘেরা উঁচু দেয়াল। তাতে চোখ আটকে যায়। তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এই যেমন আমার এই কুঠুরি। দেয়ালে নতুন কলি ফেরানো। একটা হালের

কল আছে, এমনকি জল ভরার একটা ছোট্ট চৌবাচ্চাও। বন্দীর চোখে একে বিলাস ছাড়া কি বলা যায়। পরে অবিশ্যি শুনেছি, এই বিলাসের ভাগ সবার ভাগ্যে জোটে না। পুরুষ মহলে কল মোটে দুটো। তাই দিয়ে সামলাতে হয় প্রায় কয়েকশো বন্দীকে।

মেয়েদের অবস্থাই বা ভালো বলি কি করে। বন্দীর সংখ্যা কখনোই ত্রিশের কম নয়। যখন দু বছর পর আমি ছাড়া পাই, তখন মোট সংখ্যা ছাপ্পান্ন, তার মধ্যে চুয়াল্লিশ মেয়ে আর বাকী শিশু। খাঁচার মতো ঘরটা লম্বায় চওড়ায় মাত্র পনেরো ফুট। তারই মধ্যে একধারে শৌচাগার। ভিড়ে সর্বদা ঠাসাঠাসি, তিল ধারণের স্থান নেই। রাত্রে ঘুমোতে হয় এক কাত হয়ে। তাতে জায়গা কিছু কম লাগে। পাশ ফিরে কাত বদল করতে পারে না কেউ তাই। এ ব্যাপারে শিশু, বৃদ্ধা, জোয়ান, প্রৌঢ়া, সুস্থ, অসুস্থ, উন্মাদ ভেদাভেদ নেই। পরার উপায় থাকলে তো। পায়খানা বা পেচ্ছাপের দরকার হলে বলতে গেলে প্রায় ঘুমন্ত মানুষগুলোর গায়ের ওপর দিয়ে গিয়ে সেরে আসতে হয়। কোন উপায় নেই। এমনকি শৌচাগারের পাশে যারা শোয়, তারা যে একটু সরে জায়গা করে দেবে, তারও উপায় নেই। শৌচাগার থেকে সোজা একটা নর্দমা বেরিয়ে গেছে উঠোনের মাঝখান দিয়ে। ঢাকা নেই, তাই দুর্গন্ধে সর্বদা দশ দিক মাতোয়ারা করে রাখে।

আর সে যে কী গরম, আমি বোঝাতে পারবো না। কি দিন কি রাত দুই-ই সমান। গরমের দিনে তাপমাত্রা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। সূর্য উঠলো তো কোথাও আর এতোটুকু ছায়া নেই। ফাঁকা তো পুরো উঠোনটা। ভীষণ তাপ। সবাই গিয়ে ঢোকে ঘরে। মায় বাচ্চা কটা অব্দি। সে তো ঠাসাঠাসি ভিড়। আর পেচ্ছাপ পায়খানার সেই দুর্গন্ধ। তারই মধ্যে কেউ শুয়ে পড়লো আতুর হয়ে, কেউ বা দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসলো। কলের জল তো এদিকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়তে সুরু করেছে। আছে একটা চৌবাচ্চা তা আবার ফুটো। কাপড়ের ছিপটি দিয়ে আটকে রেখে দেয়, যদি কোন কারণে ছিপটি খুলে গেলো তো ভোগাস্তির এক শেষ। সে যা দুঃসহ অবস্থা, নেই একটু শাস্তিতে বসবার জায়গা, নেই একটা আলাদা বালতি জল ধরে রাখবার, না ধুতে পারছে বাসন কোসন, না পারছে মন ভুষ্টি করে দুটো খেতে, বিশ্রামের জায়গা নেই, নেই একটু গা এলিয়ে শোবার জায়গা, শুধু থিকথিক করছে মাছি আর চটচট করছে আঠালো ঘাম—খুব টানের জায়গা তো, দরদরিয়ে কখনো ঘাম বেরোয় না—কিভাবে যে এর মধ্যে বন্দীরা বেঁচে থাকে, সেটাই আশ্চর্য।

তিয়াত্তর সালের তেসরা এপ্রিল মঙ্গলবার আমার প্রথম কোর্টে হাজির হবার কথা। দু তারিখ বিকেলে সাদা পোশাকের এক পুলিস অফিসার এলো। আমি চিনতে পারলাম। গ্রেপ্তার হবার পর এই মহামান্য পুলিসটি গিয়েছিল আঁমাকে জেরা করতে। নকশাল মামলা দেখাশোনার ভার এখন এরই ওপর। প্রথমে তো খুবই মিষ্টি মিষ্টি কথা—ইস্, বড্ড রোগা হয়ে গেছেন আপনি! আগে কী সুন্দর স্বাস্থ্য ছিল! একটু পরেই বেরিয়ে পড়লো আসল রূপ। বললো, মামলা তো উঠছে। তবে এসব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে অর্থাৎ যেটা চল্‌তি নিয়ম তা হলো স্বীকারোক্তি এবং ক্ষমা প্রার্থনা। তাহলে আর কোন ঝামেলারই কারণ নেই। সব মামলা তুলে নেওয়া হবে এবং আমিও নিশ্চিন্তে স্বদেশাভিমুখে রওনা হতে পারবো। বললাম, আর যদি আমি কিছু স্বীকার না করি বা ক্ষমা না চাই, তাহলে? বললো, দেখুন, রাষ্ট্রদ্রোহিতা কত বড় অপরাধ সে তো আপনিও বোঝেন। কমপক্ষে বিশ বছর হাজতবাস। জেনেশুনে কেউ কি আর এই ভুল করে! বললাম, ভুল নয়, এ হলো নীতির প্রশ্ন। আমি আমার নীতি থেকে একচুলও সরবো না। আপনারা আপনাদের যা খুশী তাই করুন।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে এই সব কথাই ভাবছিলাম। জানিনা পরিণতি কি হবে। পুলিস অভিযোগ দায়ের করেছে মোট একান্ন জনের বিরুদ্ধে। তার মধ্যে আমি আছি, কল্পনা আছে, অমলেন্দুও আছে। সবাই আমরা হাজতে বিচার কবে শুরু হবে সেই অপেক্ষাতে আছি। এদিকে সরকার আমার মামলা আলাদাভাবে করার ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছে। এবং এক্ষেত্রে চতুরভাবে তারা আমার ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাবার ইচ্ছেটাকে কাজে লাগিয়ে কাজ হাঁসিল করতে চায়। আমাকে দিয়ে নাকি স্বীকারোক্তি লিখিয়ে নেবে। তাতে আমার সুবিধে হবে ঠিকই কিন্তু বাকী যারা—তারা বিপাকে পড়বে। একই জায়গা থেকে ধরা পড়েছে যে সবাই। তাছাড়া সঠিকভাবে এই 'স্বীকারোক্তি' ব্যাপারটা কি, কতদূর তার পরিব্যাপ্তি—কিছুই এখন পর্যন্ত আমি জানি না। শুধু এইটুকু জানি, এ ধরনের কোন স্বীকারোক্তি দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিছুতেই ওরা আমাকে রাজী করাতে পারবে না। তাছাড়াও প্রশ্ন আছে। যদি ওরা আমার বিচার শুরু করতে পারে, তো বাকী সবার বিচার শুরু করতে অসুবিধা কি? কয়েকজনকে কলকাতায় বদলী করা হয়েছে। কল্পনা তাদের মধ্যে একজন। শুনেছি আরো কত কি নাকি অভিযোগ পশ্চিমবঙ্গ পুলিস ওদের বিরুদ্ধে হাজির করেছে। হাজারীবাগে এখনও আছে বাকী পঁয়ত্রিশ জন। তারা সবাই হাজতে বসে পচবে আর মাঝখান থেকে আমি স্বীকারোক্তি লিখে

বিচারের প্রহসন মিটিয়ে মুক্ত হস্তে স্বদেশে ফিরে যাবো, এটা কি আদৌ কোন বিবেকবান ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব? ঠিক করলাম কাল হাকিমকে বলবো, আমার সহ বন্দী যে কজন হাজারীবাগে আছে, তাদেরও যেন জামসেদপুরে এনে আমার সঙ্গে বিচার শুরু করা হয়। না হলে দরকার নেই এই প্রহসনের।

সকালে যথারীতি সেই পুরনো দৃশ্য। সেই বন্দুকের আগায় বেয়নেট কাঁধে সান্ত্রী, লোহার গারদে চাবির সেই ট্যাংটাং শব্দ। আমি ফের পুলিসের গাড়িতে. চারপাশে সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে সেই সশস্ত্র প্রহরা, হাজত ঘরের সামনে এসে গাড়ি যথারীতি থামলো। আমাকে সঙ্গে করে একজন নিয়ে তুলে দিলো কাঠগড়ায়।

কিছু বলার আর সুযোগ হলো না। চোখ তুলে হাতের লেখা থামিয়ে হাকিম আমাকে একবার দেখলেন। আমার সঙ্গী পুলিস অফিসারটিকে হাত নেড়ে কাছে ডেকে কি যেন বললেন, সে দিনের মতো বিচার শেষ, দশ মিনিটের মধ্যে আমি আবার জেলখানায় আমার কুঠুরীতে ফিরে এলাম। প্রহসন ছাড়া একে কিই বা বলা যায়। তিন বছর পর এই আমার প্রথম 'কোর্ট হাজিরা'। মাত্র কয়েকটি মুহূর্তে তার আয়ু শেষ। এমনকি পরে কবে আবার হাজিরা দিতে যেতে হবে সেটাও আমাকে জানাবার এরা প্রয়োজন বোধ করলো না। জেলারকে জিজ্ঞেস করে জানলাম সতেরোই এপ্রিল। এর আগে অবিশ্যি একদিন অমলেন্দুর বোন একজন উকিলকে সঙ্গে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে গেলো। উকিলকে কলকাতা থেকে আমার মামলা লড়বার জন্যে নিযুক্ত করা হয়েছে। বোন বললো, আমার নাকি ইংল্যাণ্ড ফিরে যাবার দিনক্ষণও প্রায় ঠিক। সরকার নাকি এ ব্যাপারে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছেন। পাছে হুট করে কারুর কিছু জানবার আগেই প্লেনে গিয়ে উঠে বসি, তাই শেষবারের মতো ওরা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। আমি বললাম চিন্তার কোন কারণ নেই। এসব কথা আমিও অনেক দিন ধরে শুনছি। এতো তড়িঘড়ি কিছু হবে না। নিশ্চিন্তে তারা বাড়ি ফিরে সবাইকে এই কথা জানিয়ে দিতে পারে।

ইতিমধ্যে অমলেন্দুর আর একখানা চিঠি পেলুম। আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে লিখেছে। এর আগে নাকি পাঁচ ছখানা চিঠি লিখেছে। আমি পাইনি অর্থাৎ আমাকে দেবার প্রয়োজন এরা বোধ করে নি। তখন কর্তৃপক্ষের কাছে কেন দেয় নি আমাকে চিঠি এবং এতো রাখঢাক গোপনের কারণ কি—কি আমাকে জানতে দেওয়া হবে, কতটুকু দেওয়া হবে না, এইসব জানতে চেয়ে এক চিঠি লিখলাম। যথারীতি জবাব এলো না। বন্দীদের কোন চিঠিরই জবাব ওরা দেয়

না। আমি জানি, আমার চিঠির কি গতি হয়েছে। সবচেয়ে উঁচু গম্বুজটার নীচে একটা ঘর আছে। যাবতীয় নোংরা ছেঁড়া বাজে কাগজ সেখানে ডাই করা হয়। আমার চিঠিরও স্থান হয়েছে সেই কুঠুরীতে। হাজারিবাগ জেলের কথা মনে পড়ছে। একবার বড় জমাদার কাগজে মুড়ে আমাকে খানিকটা মরিচ এনে দিয়েছিল। খুলে দেখি আমারই হাতের লেখা একখানা আবেদন। এক সহবন্দিনীর ব্যক্তিগত অসুবিধের কথা জানিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে লিখেছিলাম। তার তো কোন সুরাহাই হয় নি। উলটে সেই কাগজ দিয়ে এখন মরিচ মুড়ে বিলি করা হচ্ছে।

তা সত্তেরোই এপ্রিল আমাকে আর কোর্টঘরে ঢুকতে হলো না। গাড়িতেই বসে রইলাম। একটু পরে হাকিম বেরিয়ে এসে আমাকে এক নজর দেখে চলে গেলেন। আমার পক্ষের উকিল সেদিন হাজির। বললাম, যেন একখানা আবেদন করে আমার সহবন্দীদের হাজারিবাগ থেকে এখানে এনে একই সঙ্গে বিচারের ব্যবস্থা করতে বলে। হাকিম বললেন, পনেরো দিনের মধ্যে রায় তিনি দেবেন। ততদিনে সরকার পক্ষের উকিলের পরামর্শে ফাটকের মধ্যেই একটা স্থায়ী কোর্টঘর বানাবার কাজ চলছে। এর পর থেকে সেখানে বসেই শুনানী এবং মামলার বিচার হবে। ঘর তৈরী শেষ হতে লাগলো তিনমাস। হাজারিবাগ থেকে বন্দীদের আনতেও প্রয়োজনাতিরিক্ত সময় লাগলো। ফলে পনেরো দিনের মধ্যে রায়দান আর হলো না। তিনমাসের জন্য সবকিছু স্থগিত থাকতে বাধ্য হলো।

বীণার সঙ্গে আমার পরিচয় জামসেদপুর জেলে আসার প্রথম দিনটিতে। এসেছিল চুপিচুপি মেটিনীর চোখ বাঁচিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে। সেই থেকেই ঘনিষ্ঠতা। কত যে গল্প বলতো আমাকে। ভারতের কৃষকের প্রকৃত পরিচয় বীণার কাছ থেকেই বলতে গেলে প্রথম আমি জানতে পারি। শ্রদ্ধায় মন আমার ভরে যেতো। ভূমিহীন কৃষক পরিবারে জন্ম, আমারই সমবয়েসী, সেই ছোটবেলা থেকে গতর খাটছে জমিদারের ক্ষেতে। বিয়ে হয়েছিল। বাবা পুরো পনের টাকা দিতে পারেন নি বলে শাশুড়ী আর স্বামী অত্যাচার করতো। অনেক দিন মুখ বুজে সহ্য করেছে। শেষে যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে, কোলের মেয়েকে নিয়ে ফিরে এসেছে বাপের বাড়িতে। সাকিন মেদিনীপুর। সন ১৯৭০। মেদিনীপুর তখন লাল ঘাঁটি এলাকা। নকশাল পন্থীরা মেদিনীপুরকে তখন দ্বিতীয় মুক্তাঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

১৯৭১ সালের শেষ দিকে বীণা ধরা পড়ে। পুলিসের অভিযোগ সে নকশাল পন্থী। গ্রেপ্তারের পর পুরো এক হপ্তা রেখেছিল থানা লকআপে। সমানে

চলেছে জেরা আর পুলিসের মার। জেলে আসার দিন নাকি সে বেহুঁশ, সারা গায়ে ক্ষত চিহ্ন আর রক্তের দাগ। একটু সুস্থ হবার পর আবার তাকে জেল থেকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। এবং সেখানে ফের জেরা আর মার। আমাকে দেখিয়েছে। সারা গায়ে এখনও অসংখ্য আধ শুকনো ক্ষত চিহ্ন। মারের চোটে কান দুটো নষ্ট হয়ে গেছে। হঠাৎ হঠাৎ মাথা ঘুরে যায়। ভীষণ মাথা ধরে আর মাঝে মাঝে জ্বর হয়। তবু তাগদ বটে মেয়েটার। সব নীরবে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেছে এবং এখনও করছে। আর মনে পুলিস জাতটার ওপর শুধু ঘেন্না আর ঘেন্না। জানো, থানা লকাপে থাকার সময় আমাকে মাসিকের তিনদিন এক টুকরো ন্যাকড়া অব্দি দেয় নি। আমি চেয়েছি, তবুও। এমনই অপদার্থ। অবস্থাটা বলতে গেলে জেলেও প্রায় একই রকম। জামসেদপুরে দেখেছি তবু ছেঁড়া-খোড়া পোকায় কাটা নোংরা তেলচিটে এক আধটুকরো কানি চাইতে হতো না। গারদ গলিয়ে ফি-মাসে ফেলে দিয়ে যেতো। জামসেদপুরে এসবের বালাই নেই। মেয়েরা শাড়ীর আঁচল ছিঁড়ে কানি বানায়। যখন আঁচলও দিনের পর দিন ব্যবহারে পচে পতপত করে, তখন কম্বল ফালি করে ছিঁড়ে নেয়। সে মাসের কাজ চুকে গেলে ফেলে দেবার উপায় নেই। ধুয়ে শুকিয়ে সেটাই রেখে দেওয়া হয় পরের মাসের জন্য। এবং এটাই নিয়ম।

জামসেদপুরে যাবার প্রথম কদিনের মধ্যেই খবর পেলাম বীণার বাবা মারা গেছেন। দেখে নি বীণা তাঁকে অনেকদিন। পরিবারের কাউকেই দেখে নি। কেউ আসে না দেখা করতে। কি করে আসবে? আসতে যেতে দশ টাকা যে ভাড়া। সঙ্গে জেলখানার ফটকে ঘুষটুষের ব্যাপারও আছে। কিভাবে জোটাবে অতোগুলো টাকা? তো দেখতাম মাঝে মাঝে চুপচাপ হয়ে যেতো, কি যেন ভাবতো বসে একলা একলা। হয়তো আকাশের চেহারা পালটেছে, কি রোদের তেজ কদিন সমানে প্রচণ্ড—গালে হাত দিয়ে বীণা বসে যেতো ভাবতে। সেই ওর দেশ গাঁয়ের কথা, মাঠের ফসলের কথা। এমন যদি চলে তাহলে ফসল যে সব নষ্ট হয়ে যাবে। কি হবে তখন ওর পরিবারের! কিভাবে তারা ক্ষুধার দু মুঠো চাল জোটাবে! শুধু ভাবনা আর ভাবনা। জিজ্ঞেস করলে বলতো, মাঠের ফসল খারাপ হওয়া মানেই কাজ বন্ধ। কে আর ডাকবে তখন কাজ করতে। কেনই বা ডাকবে। তখন মহাজনের কাছ থেকে ঋণ কর্জ নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। একসেরে একসের সুদ। টাকায় টাকা। সব জানে, বোঝে। কিন্তু উপায় কি। না খেয়ে মরা তো যায় না। আর, কদিন ওর সঙ্গে মিশে কি যে

হাল হলো আমার! এতোদিন মেঘলা দেখলে বা শীত গ্রীষ্ম বর্ষা এলে তবু যাহোক একটু ভাল লাগতো। জেলখানায় একঘেঁয়েমির মধ্যে এই যা একটু পরিবর্তনের আভাস পেতাম। এখন আর পাই না। বৃষ্টি বেশি হলে এখন বীণার মতো আমারও মন কাঁদে। তাইতো, ফসল যে সব নষ্ট হয়ে গেল,—এখন উপায়! প্রকৃতির খামখেয়ালীতে যে হাজার হাজার গরীব মানুষ না খেয়ে মরবে, মহাজনের কাছ থেকে দুগুণ সুদে ঋণ কর্জ নেবে। এ তো রীতিমতো অভিশাপ।

আর কথা বলতো যখন আমার সঙ্গে, মেটিনীকে সব সময় এড়িয়ে এড়িয়ে চলতো। পাছে দেখে ফেলে! ভীষণ যে কুটিল! বলবো কি, এই প্রথম আমারই মতো আরেকজন বন্দিনীকে আমি অন্তর থেকে ঘেন্না করতে শুরু করলাম। সহ্য করতে পারতাম না একদম। সিল্কের শাড়ী পরে দু হাতে সোনার বালা নাড়িয়ে পেট পিঠের চর্বির ভাঁজ দেখিয়ে পাছা দুলিযে সামনে দিযে যখন হেঁটে যেতো মনে হতো ডাইনী একটা, বেশ্যা বাড়ির দালালনী। আর সত্যি সত্যিই তাই। অন্যদের কাছে শুনলাম, ওর নাকি মেয়ে চালান দেবারই ব্যবসা ছিলো, তাতেই নাকি বিস্তর পয়সা কামিয়েছে। গ্রাম থেকে ভুলিয়ে ভালিয়ে এনে সরল নিষ্পাপ মেয়েদের তুলে দিতো জোতদার বা ব্যবসাদারের হাতে, নয়তো কোন বেশ্যালয়ে, এইভাবেই নাকি বেশ চলতো। শুধু ও নয়, এই পাপ কাজে ওর চার মেয়েও সঙ্গী। তারা জামিনে খালাস হয়ে বাইরে আছে। শুধু ও জেলখানায। সে নাকি বিরাট এক চক্র। মেয়ে চারটে ঘুরে ঘুরে দূর গাঁয়ের যুবতী মেয়েদের সঙ্গে দোস্তী করে, তাদের টাকার প্রলোভন দেখায়, ভালো ঘর-বরের লোভ দেখায়, নিয়ে আসে শহরে। এরকম তিনটি নিষ্পাপ মেয়ে আপাততঃ চাইবাসা জেলে আছে। এদেরই ওরা ফুসলিয়ে নিয়ে এসেছিল। পরে ধরা পড়ে যায়। জেলে রেখে দিয়েছে মামলা উঠলে এজাহার নেবে বলে। দু-বছর পর আমি যখন ভারত থেকে চলে আসি তখনও ওরা জেলে, এদিকে মেটিনী কবে জামিনে ছাড়া পেয়ে চলে গেছে। তার বিরুদ্ধে নাকি কোন অভিযোগই প্রমাণ হতে পারে নি। হওয়া সম্ভবও নয়। জামসেদপুর জেল থেকে যখনই কোন বন্দী চাইবাসায় বদলী হতো, ও তার মারফৎ সেই মেয়ে তিনটিকে বলে পাঠাতো,—খবরদার, মুখ খুলছিস কি মৃত্যু! মৃত্যুভয়ে তাই মুখ বুজে তারা বিনা অপরাধে এখনও জেল খাটছে।

ঘেন্না, শুধু ঘেন্না। যত দেখতাম ওকে, ঘেন্নায় আমার সারা হৃদয় রি রি করতো। বন্দীদের সঙ্গে যে কী কুৎসিৎ আচরণটাই করতো! এমনকি হাজারিবাগের মতো কুখ্যাত জেলেও দেখেছি, নতুন মেয়ে বন্দী এলে তাকে তল্লাসী করতো মেটিনী, তার

দামী জিনিসপত্র জেল অফিসে জমা রাখতো, এমনি যা দৈনন্দিন নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী, সেগুলো মহলে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মালিকের হাতে ফিরিয়ে দিতো। আর এখানে দেখি এই শয়তানীর অদ্ভুত কায়দা। নতুন বন্দী এলে তার যা কিছু, মায় বিড়িটা অব্দি সে হাতিয়ে নেবে, ফেরত দেবে না কোন কিছু, এমনকি জমাও রাখবে না। এইভাবে কত গয়না যে আত্মসাৎ করেছে। ঐ যে ওর হাতে ঐ সোনার বালা—ওটাও হয় ভয় দেখিয়ে নয়তো কাউকে কিছু পাইয়ে দেবার লোভ দেখিয়ে হাতানো। দুটোর কোনটাতেই যখন কাজ না হয়, তখন করে চুরি। হ্যাঁ, চুরি। সব ও নেবে। বাইরে বিক্রী হতে পারে এমন সব কিছু—সে যদি সামান্য একটা ছুঁচও হয়, সে বাদ দেবে না। ঠিক কায়দা করে হাতিয়ে নেবে। মেয়ে মহলে ঘোরে, হাতে থাকে লোহার একটা ডাণ্ডা। আর সে কী গালাগালি-র চোট! মারেও। চুরি করে। রেশন নিয়ে বিক্রী করে দেয়। আর খেয়ালখুশী মতো যার তার নামে তাল পেলেই জমাদারের কানে সাতকাহন করে লাগায়। ফলে মার। জমাদার এসে নাম ধরে ডেকে আচ্ছা মতো পিটিয়ে যায়। আসার পর দু তিনবার এই ঘটনা দেখে আর সহ্য করতে পারলুম না। একদিন সুপারকে মেয়েদের গায়ে হাত তোলার ব্যাপার নিয়ে প্রতিবাদ জানালাম। ফল হলো। সুপার সব জমাদারকে বলে দিলো কেউ যেন মেয়েদের গায়ে আর হাত না তোলে।

শুরু থেকেই দেখেছি, এই যে বীণা আর আমি বসে বসে দু একঘণ্টা করে গল্প-গুজব করে কাটাই, এটা তার মোটেই পছন্দ নয়। বীণাকে নাকি এইজন্যে খুব গালাগালিও দেয়। অবিশ্যি আমার চোখের আড়ালে। একদিন আর থাকতে না পেরে বললাম, আমাদের ব্যাপারে ও যেন নাক না গলায়, তাতে ফল ভালো হবে না। ওমা, বলবো কি, সেদিনই শুনি, জমাদারকে মিথ্যে করে বলছে, আমি নাকি ওকে মেরেছি। জমাদার আবার সেই কথা আরো সাজিয়ে গুজিয়ে জেলারের কানে তুললো। তা আমার তো একটেরে ঘর; মেয়েদের মহল দূরে, দুয়ের মধ্যে ছোট্ট একটা লোহার ফটকের বাধা। আসার পরে বলে কয়ে সেই ফটকের ভারী তালাটা খোলাতে পেরেছিলাম। তো জেলারের কানে ওঠার পরে সেই তালার বুকে ফের চাবি ঘুরলো, ফটক বন্ধ হলো। কী মুশকিল ভাবুন তো। আবার একা থাকতে হবে আমাকে। কি করা যায়। ভেবে ভেবে একটা মতলব বের করলাম। সুপারকে বললাম, দেখুন মশায়, আমার পক্ষে ঐ সব ঘর দোর সাফ করা, উঠোন ঝাঁট দেওয়া সম্ভব নয়। আমাকে একজন কাজের লোক দিন। ফল হলো। মোদ্দা যুক্তিটা তো দারুণ দিয়েছি। খণ্ডন করে সাধ্য কি! 'লেখাপড়া জানা'

বন্দিনী, তদুপরি বিদেশী—কাজ সে নিজের হাতে করবে কিভাবে। লেখাপড়া আর হাতের কাজ দুটো কি একসঙ্গে হওয়া সম্ভব! তাই সারাক্ষণের 'ঝি' দিলো আমাকে। অর্থাৎ বীণা। তা বাপু ঝি বলো আর যাই বলো, আমার উদ্দেশ্য তো সফল বীণাকে তো পেলাম। মনে মনে নিজেই নিজেকে খুব একচোট সাবাস দিলাম, তারিফ করলাম। বেশ চালাক হয়ে উঠেছি আমি। বা বলা যেতে পারে ধূর্ত। এই ধূর্ততা আমি আগে জানতাম না। অর্থাৎ জেলে আসার আগে। বরং অন্য কাউকে এমন করতে দেখলে বেশ অবাক হতাম। এখন আর হই না। পরিবেশ দিয়েছে সব পালটে। এও এক ধরনের বাঁচার লড়াই। শুধু আমি নই বলতে গেলে প্রতিটি বন্দীই দিনের পর দিন জেলখানায় থাকতে থাকতে এমন অনেক চালাকী রপ্ত করে ফেলেছে।

তা এখন আছি বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে। আমি আর বীণা। নিরিবিলিও খুব। এখন তো আর মেটিনী কিছু বলতে পারবে না। বীণাকে আমি পড়াতে শুরু করলাম। বাংলা জানি সামান্যই। তাতে অসুবিধে নেই। কটা চক কিনিয়ে আনা গেলো। তাই দিয়ে মেঝের ওপর লিখে লিখে শুরু হলো মাষ্টারীর কাজ। বলবো কি, আশ্চর্য ক্ষমতা মেয়েটার। চটপট যা শেখাই সব শিখে নেয়। এদিকে আমার তো নাম-কা-ওয়াস্তে জ্ঞান। সব অক্ষর ঠিকমতো লিখতেও জানি না। শুধু আওয়াজটুকু কেমন হয় জানি। শোনবার তাগিদে নিজেকেও শিখতে হলো। আর অদ্ভুত সেই নিয়ম ছাড়া শিক্ষা। তবু তারই দাপটে কয়েক মাসের মধ্যে বীণা লিখতে শিখলো। মায়ের কাছে নিজের হাতে লিখে পাঠালো চিঠি। যতদূর ধারণা, সে চিঠি গন্তব্যে পৌঁছতে পারে নি। দোষ বীণার নয়। বন্দীদের চিঠির এই দশাই হয়। চিঠি লেখে, অফিসে জমা দেয়, অফিসের খাতায় ডাক খরচ দেখানো হয়। সে পয়সা যায় বাবুদের পকেটে। মাঝখান থেকে চিঠির স্থান হয় ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে।

তা বীণাও আমাকে শেখালো অনেক কিছু। গ্রামের মানুষ কেমন ভাবে দিন কাটায়, কি খায়, কি পরে, শুধু এইটুকুই নয়, শোনালো কেমন করে ছাই দিয়ে ঘষে চকচকে করে বাসন মাজতে পারা যায়, কি করে পেতলের সেজবাতিটা ঘষে ঘষে ঝকঝকে করা যায়, কিংবা কি করে প্রায় বলতে গেলে বিনা সাবানে একটা পুরো কাপড় কেচে পরিষ্কার করে ফেলা যায়, ইত্যাদি। সন্ধ্যে হলে ওর ছুটি। তখন আর আমার সঙ্গে নয়, ওকে রাখা হতো বাকী মেয়েদের সঙ্গে। ভালোই হতো। ওর মাধ্যমে বাকীদের দৈনন্দিন খবরাখবর পেতাম। আর নিজস্ব

পড়াশুনোরও খানিকটা সুযোগ পেতাম।

হাজারিবাগে থাকতে শুনেছি জামসেদপুর জেলে সত্তর সালের দাঙ্গার কথা। বন্দীরা তিনটি মূল বিষয়কে ভিত্তি করে বিদ্রোহ করেছিল। প্রথমতঃ অত্যধিক ভিড়, তারা বলেছিল ভিড় কমাতে হবে; দ্বিতীয়তঃ পানীয় জলের অভাব, তাদের দাবী ছিলো জলসরবরাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে, তৃতীয়তঃ চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই বলতে গেলে ছিলো না, তারা বলেছিল অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রতিটি বিষয়েই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেই বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল। বাস্তবিক কিছুই হয় নি। মাঝখান থেকে নেতাদের বদলী করা হলো অন্য জেলে। অবস্থা আগের মতোই বহাল রইলো। পুরুষ মহলে নাকি শতখানেক বন্দীকে মেয়েদের ঘরের মতো ছোট একটা ঘরে থাকতে হয়। আর নাকি ভীষণ ছোঁয়াচে ব্যাধির উপদ্রব। প্রায় প্রতিদিনই খবর পাই একজন না একজন কেউ মারা গেছে। ব্যতিক্রমও আছে। সেটা ঘুষ দিয়ে গস্ত করতে হয়। জমাদারকে হাত করতে পারলেই হলো। বা নিদেন পক্ষে মেটকে। তার আর ঘুমের ব্যাপারে চিন্তা নেই, খাবারও পাবে অঢেল। শুধু কটা নগদ টাকার দরকার। আর একটু খাতির। টাকাই জুটিয়ে দেবে খাতির। সবার কি আর সেই সামর্থ্য আছে। কিংবা এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মতো তাগদ? রেশন তো কমতে কমতে যৎসামান্যে এসে দাঁড়িয়েছে। তাই খেয়ে কি আর প্রতিবাদ করার মতো তাগদ থাকে! মাঝখান থেকে আখের গুছিয়ে নিচ্ছে জেলখানায় খাবার যোগান দেয় যে ঠিকাদার সে আর জেলখানার অনুগত সেবক জমাদার আর মেটেদের দল। ওরাই কিনা ঠিকাদারের কাছ থেকে সব বুঝে সুঝে নেয়। খাদ্য দ্রব্যের মান কিরকম তা বিচারের ভারও ওদেরই হাতে। এসব নিয়ে প্রতিবাদ করবে এমন বুকের পাটা কার! এক ধরনের প্রতিবাদ আমি হাজারিবাগ আর জামসেদপুর দুটো জেলেই দেখেছি। প্রতিবাদ করে গিয়ে উঠতো গাছে বা মহলের ছাদে। বলতো, না মিটলে নামবে না। তখনকার মতো মিটিয়ে নেবার প্রতিশ্রুতিও পাওয়া যেতো। কিন্তু দুদিন কাটতে না কাটতে আবার যে কে সেই। ফের কি আর সেই জন্যে লাফ দিয়ে গিয়ে গাছে ওঠা যায়!

জামসেদপুরে হাজারিবাগের মতো নিজের রান্না নিজে ফুটিয়ে নেবার কোন ব্যবস্থা নেই। এমন কি আমি হেন বিদেশিনী—আমার জন্যেও নেই। সবাই যা খায়, আমিও তাই খাই। শুধু বাড়তি হিসেবে আমার প্রাপ্য চা। এটা নিজেকেই করে নিতে হয়। তাই একটা ছোট স্টোভও আমাকে দেওয়া হয়েছে। আমার

কুঠুরির সামনে দেয়ালের ওপরটায় জেলখানার পাকশালা। ভোর তিনটের সময় মাঝে মাঝে এক একদিন মস্ত বড় বড় ড্রাম গড়িয়ে নিয়ে যাবার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যেতো। কল থেকে জল ভরে গড়িয়ে গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেই ভোর থেকেই শুরু হতো রান্না। কেননা ছোট রান্নাঘর, একসঙ্গে অতোগুলো মানুষের খাবার তৈরী করার ব্যবস্থা তো নেই। হিসেব মতো, ঠিক ঠিক ভাবে যে কজন থাকতে পারে, মাত্র তাদের প্রয়োজন মেটাবার মতন করেই তৈরী। সেই রকমই বাসন কোসন, ডেকচি হাঁড়ি ড্রাম ইত্যাদি। ভোর থেকেই তাই তোড়জোড় শুরু হতো। চলতো সেই দুপুর অব্দি। সাড়ে চারটে নাগাদ নামতো প্রথম বারের ভাত। আধোয়া চালের উৎকট গন্ধে ম ম করতো বাতাস। তারপর দেখতাম সেই এক ড্রাম ভাত রান্নাঘরের বারান্দায় কতকগুলো চটের বস্তা বিছিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হতো। ঢাকাঢাকা নেই। মাছি বসছে দেদার, ধুলো উড়ছে এন্তার, পাখি এসে ঠুকরে তুলে নিয়ে যাচ্ছে—কিসের কি। এগুলো কি মানুষ খাবে যে যত্ন। খাবে তো বন্দীরা। বন্দীরা কি মানুষ! এগারোটা নাগাদ একপেট ক্ষিধে নিয়ে সবাই সেই ভাত চেটেপুটে খেতো।

আর আমার তো সে যেন যায় যায় অবস্থা। আধ সেদ্ধ ভাত আর আধ ভাজা আটার চাপাটি খেয়ে হজমের দরজা সব বন্ধ। তার ওপর জামসেদপুরের সেই অসম্ভব অসহ্য তাপ। আর যায় কোথায়। শুরু হলো একই সাথে লু লাগা জ্বর আর আমাশা। পৌঁছবার হপ্তা দুয়ের মধ্যে আমি যাকে বলে শয্যাশায়ী। সে মাসে গরম তো সবার ভুগে। দরদর করে সারা দিন রাত শুধু ঘামছি তো ঘামছিই। ভয়ে স্নান কর্যার সময় চুল ধুতাম না। ধুলে সে কি আর শুকোবে! ঘাড়ের কাছে খোঁপা মতো বেঁধে রেখে দিতাম। তাতে আবার ঘাড়ে ঘা হলো। আর সে কী ঘামাচি! সদা সর্বদা চুলকোচ্ছে তো চুলকোচ্ছে। চুলকোবার যেন আর কমতি নেই। দুদণ্ড যে বসে থাকবো কি একটু পড়াশুনো করবো। তার কি জো আছে! মাথাটা একটু পরেই ভারী ভারী ঠেকতে শুরু করে, চোখ ঝাঁ ঝাঁ করে। মনে হয় যেন আকাশ পাতাল সব ঘুরছে, আর আমি যেন একটু একটু করে মাটির নীচে তলিয়ে যাচ্ছি। আবার হয়তো কখনো টান টান হয়ে শুয়ে রয়েছি, উঠে আর দাঁড়াতে ইচ্ছে করে না। উঠতে যেন ভীষণ আলস্যি। গরমের তাপে আমার গা হাত পায়ের শিরাগুলো ফুলে এক একটা এই এত্তোখানি করে মোটা। মনে হয়, রক্ত চলাচল যেন সব বন্ধ হয়ে গেছে। আর হাঁটুতে, কনুইয়ের ভাঁজে সে কী টনটনানি বেদনা। আমার কুঠুরিতে উঠবার দু ধাপ সিঁড়ি

ভাঙতে যেন কান্না পায়। রাত্তিরে বলতে গেলে উদোম হয়ে আদুর গায়ে মেঝের উপর শুয়ে থাকি, আর ভাবি, পুরুষ মহলে নকশাল বন্দীরা লোহার ডাণ্ডাবেরী পরে কী নির্যাতনের মধ্যেই না আছে। মেয়ে মহলেই বা সুখ কোথায়! ঐ তো ঐ টুকুনি ঘর। সেখানে অতোগুলো মানুষ, সঙ্গে কটা বাচ্চা—পারে এইভাবে মানুষ বেঁচে থাকতে? সে তুলনায় বলতে গেলে একলা ঘরে আমি তো পরম সুখে আছি।

পুরুষ মহলে দুজন নকশাল বন্দীর শুনলাম গুটি বসন্ত হয়েছে। ছোঁয়াচ লেগে আরো কজনের হলো। অবাক কাণ্ড,—দেয়াল পেরিয়ে এপারেই মেয়ে মহল, আমরা কিন্তু সবাই রোগের হাত থেকে অব্যাহতি পেলাম। তবে খোস হলো খুব। প্রায় সকলেরই। সে যা চুলকোনি! চুলকোনির জ্বালায় মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে মাঝে মাঝে উঠে বসতাম। দুহাতের দশ নোখ দিয়ে শুধু আঁচড় আর আঁচড়। শেষে তাতেও যখন শান্তি হয় না, তখন চিরুণী দিয়ে ঘষতে শুরু করতাম। ঘষতে ঘষতে দেখতাম চোখের সামনে রাত পুইয়ে ভোর হলো, পাখি ডাকলো। আমি হয়তো তখনও সমানে চুলকোচ্ছি কি আঁচড়'চ্ছি। ডাক্তারকে বলাতে দুটো করে সাদা রঙের নাম না জানা বড়ি মিললো। কোন কাজ হলো না। মোটমাট জামসেদপুরে সে জ্বালা আর কমানো গেলো না। শীতকালে হাজারিবাগে বদলী হয়ে ডাক্তারকে দেখাতে সে দিলো কি একটা মলম। তাই লাগিয়ে কদিন পরে শান্তি পেলাম। বাকীরা তো আর আমার মতো ভাগ্যি ক'রে আসে নি। তারা যে তিমিরে সেই তিমিরে। হাজারিবাগে ফেরার আগে অব্দি দেখে এসেছি, চুলকোনি থেকে সবার গায়ে বিষাক্ত ঘা হয়েছে। সে বড় করুণ অবস্থা। একদিন অফিস ঘরে এক বন্দিনীকে দেখলাম, দু পা ফুলে ঢোল, তাতে দাগড়া দাগড়া ঘা। আহারে বেচারী, হাঁটতে অব্দি কষ্ট হচ্ছে! জেলার বললো, আর বলবেন না, কোন লাভ নেই এদের চিকিৎসা করে। এরা সাতনোংরা। হাজার বলাতেও একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার চেষ্টা করবে না। কি করে করবে? গাদা গুচ্ছের বন্দী এনে ঢুকিয়েছো বাপু তোমরা এই এতোটুকু ঘরে, দাওনা একফালি সাবান কি একটু বাড়তি জল, কাপড় অব্দি একখানার বেশি দুখানা দিতে তোমাদের আপত্তি;—সাধ থাকলেও পরিষ্কার থাকার কি এদের সাধ্য থাকে।

জুন মাসের মাঝামাঝি নাগাদ আমার সঙ্গে বাকী যাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাদের হাজারিবাগ থেকে জামসেদপুরে আনা হলো। কদিন পর তিয়াত্তরের উনিশে জুন আমরা তখন চান করছি, হঠাৎ শুনি ওধার থেকে হৈ চৈ

চিৎকার—মার ডালো! আউর মারো—মারো শালেকো। ....সঙ্গে বেড়ি ঘষটে ছুটবার আওয়াজ। আর দুপদুপ শব্দ। কিছুই তো বুঝতে পারছি না এদিক থেকে। ভয়ে সিঁটিয়ে সবাই দাঁড়িয়ে আছি আর কান পেতে বুঝবার চেষ্টা করছি প্রতিটি শব্দের অর্থ। তুমুল সোরগোল, আর আর্ত চিৎকার। ঠিক আমারই কুঠুরির ওপাশটায়। চিৎকারটা হঠাৎই স্তব্ধ হলো। কিন্তু সোরগোল চললো। টানা প্রায় মিনিট দশেক। পিটুনির আওয়াজও পেলাম। আর একটি বালক কণ্ঠের করুণ আর্তনাদ—একটু জল, জ....ল! আরেকজন কাতরে উঠলো—উঃ, মাগো! বীণা আর আমি নিশ্চুপ নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে আছি। কারো মুখে কোনো কথা নেই। কেন এই আর্তনাদ? কিসের চিৎকার? বাকী মেয়েরাও এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে আমার আর তাদের অংশের বন্ধ লোহার ফটকটার সামনে। সঠিক কিভাবে কি ঘটেছে না বুঝলেও এটুকু আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি, আক্রমণের লক্ষ্য নকশাল বন্দীরা। আর্ত চিৎকারও তাদের। এরই মধ্যে নকশাল পন্থী দু একটা শ্লোগান আমাদের কানে এসেছে। সব শান্ত হবার পর হঠাৎ সজোরে পাগলা ঘন্টি বেজে উঠলো। এটা নিয়মের পর্যায়ে পড়ে। ঘন্টি না বাজালে কর্তৃপক্ষ কিভাবে বলবে যে তারা লাঠি চালাতে বা প্রতি আক্রমণ করতে বাধ্য হয়েছিল। শুধু শুধু কি আর তারা কিছু করে!

কিছুই বুঝতে পারছি না, ভেতরে এক অদম্য ঝড়—আমি আর বীণা পাগলের মতো পায়চারী করতে লাগলাম। এছাড়া আর কি-ই বা করতে পারি। ইচ্ছে করে ছুটে যেতে। ঐ পাঁচিলের বাধা ডিঙিয়ে সব ভেঙে চুরমার করে গিয়ে দেখতে বাস্তবিক কি ওখানে ঘটছে। কিন্তু কোন উপায় নেই। বন্দী আমি। বন্দী বীণা। আমাদের হাত পা নিয়মের নিগড়ে বাঁধা। আমাদের ইচ্ছে থাকলেও নিয়মের বাইরে কিছু করার উপায় নেই।

একটু একটু করে অবিশ্যি সবই কানে এলো। ছ জন বন্দীকে জমাদার আর মেটেরা মিলে বেধড়ক মেরেছে। আম গাছের নীচে একজন এখনও পড়ে আছে অজ্ঞান অবস্থায়। পুরুষ মহলের আদালতে গিয়েছিল মেয়েরা। বেলা দুটো নাগাদ হাজিরার কাজ সেরে ফিরে এলো। বললো, দেখে মনে হলো, ছেলেটা বেঁচে নেই।

একটা কিছু করা উচিত। অন্ততঃ একটা প্রতিবাদ। হাত আমার নিশপিশ করছে। সারা মন জুড়ে বিদ্রোহ। কিন্তু কিভাবে করবো? আমার যে হাত পা বাঁধা! ঘেন্নায় রি রি করছে সারা শরীর। ঘেন্না ঐ বড় জমাদারকে। ঘটনার

সূত্রপাত নাকি ও-ই করে! নাঃ, আর ওর সঙ্গে ওদের কারো সঙ্গে ভালো ব্যবহার না। না বুঝে এতোদিন ওদের সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতাম, সুখ দুঃখের খবরাখবর নিতাম। কিন্তু যে শয়তান নির্দ্বিধায় অসহায় বন্দীকে অত্যাচার করতে পারে, সামান্য কারণে তাকে বেধড়ক পেটাতে পারে—কিসের মিষ্টি কথা তার সঙ্গে! ওকে বোঝাতে হবে, ওর এই আচরণের জন্যে আমি ওকে ঘেন্না করি, মনে করি ও আমাদের শত্রু। তাই হলো। সেদিন বিকেলে যখন এসেছে আমার কুঠুরীতে তালা দিতে, আমি ওর দিকে ফিরেও তাকালাম না। কথা বলা তো দূরের কথা, ও যে জলজ্যান্ত দাড়িয়ে আছে আমার সামনে যেন গ্রাহ্যের মধ্যেও নিলাম না। সমানে পায়চারী করছি তখন এধার থেকে ওধার আর গাইছি গান। ওরা যেসব গান পছন্দ করে না—আমার গলায় যত জোর আছে সবটুকু জোর দিয়ে।

পরদিন হাজতের মধ্যেই হাকিমের এজলাসে আমাদের হাজিরার কথা। আর সবাই বাদ রইলো, নিয়ে গেলো শুধু আমাকে। কারণ জানতে চাইলাম, কর্তৃপক্ষ কি একটা অদ্ভুত অজুহাত দিলো। আসলে যে ছজনকে মেরেছে, তারা আমারই সহবন্দী। জানতে তো আর কারো বাকা নেই। জেল অফিসেরই এক দরদী কর্মচারী আমাদের পক্ষের উকিলকে সব বলে দিয়েছে। উকিল বলেছে আমাদের সঙ্গে দেখা করবে। জেল কর্তৃপক্ষ কিছুতেই দেখা করতে দেবে না। তখন সাংবাদিকদের সে সব বলেছে। কাগজে বেরিয়েছে ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ। সে যাই হোক, অফিস ঘরে হাকিমের এজলাসে আমাকে তো হাজির করা হলো। আমি প্রতিবাদ জানালাম। সব ঘটনা তুলে ধরে বললাম প্রতিবিধান করতে। হাকিম চুপ। লিখতে লিখতে সব শুনলো। শুধু একবার বললো, আচ্ছা, দেখা যাবে। বলে আবার লেখায় মন দিলো।

হাকিমের কাছ থেকে ফিরে আসার পরই ঘটনা কেমন ভাবে ঘটেছে হুবহু সব জানতে পারলাম। বিহারে জেলে তো চা দেবার নিয়ম নেই। হাজারিবাগে তবু নিজের খরচে চা বানিয়ে খাবার রেওয়াজ ছিলো। জামসেদপুরে তা-ও মানা। এদিকে নেশার জিনিস। পারে কি চুপচাপ মুখ বুজে থাকতে। চা চিনি যোগাড় করেছে। দরকার একটু আগুন। সন্ধ্যেবেলা কুপি জেলে দিয়ে যায় প্রতি ঘরে, সেরকমই একটা কুপিতে একজন নাকি চা করা যায় কিনা পরখ করছিল। ডিউটি জমাদার দেখে ফেলে। খবর চলে যায় জেলারের কানে। পরদিন সকালে একদল জমাদার আর কয়েদী আসে জেলারের হুকুম মতো এই দুর্জনদের শাস্তি দিতে। হাতে তো সবার বেড়ি, সেই অবস্থাতেই টানতে টানতে নিয়ে আসে

ওয়ার্ডের সামনের উঠোনে, সবার চোখের সামনে বেধড়ক পেটায়। ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো যাকে বলে আর কি। সবার সামনে পিটিয়ে বুঝিয়ে দিলো, খবরদার, এমন দুষ্কর্ম তোমরা কখনো কোরো না। ফলে তোমাদেরও কপালে এই শাস্তি তোলা রইলো। ঐ যে ছেলেটি গাছের নীচে পড়ে ছিলো, ও মরে নি। বেহুঁশ তখন। একটা হাত ভাঙা। আগেই মেরে ভেঙে দিয়েছে। মার যে একটু ঠেকাবে তারও উপায় নেই। আরেকজনের একটা চোখ প্রায় জখম হয়েছে। এই অবস্থায় হাকিমের সামনে হাজির করা অসম্ভব। তাই অজুহাত দিয়ে কর্তৃপক্ষ এড়িয়ে গেছে।

এই মারের ঘটনার কদিন পরে আমার ধরলো এক নতুন রোগ—মাথা ধরা। আর সহ্য হচ্ছে না এই পরিবেশ! ধৈর্যের সীমা যেন ছাড়িয়ে গেছে। পারি না ভালো করে তাকাতে বড় জমাদারের দিকে। স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের পুলিস আসে আমাকে জেরা করতে, আদ্দেক কথার উত্তর দিই না। আমার সব কাগজ বই জেলার নিয়ে গেছে তার বাড়িতে, ছেলেকে দেবে বলে। আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে কেউ হয়তো কিছু দিয়ে গেলো, সেটা অফিস ঘর ফেরত আমার কাছে আর এসে পৌঁছোয় না। শুনেছি সে সবও নাকি জেলার নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। সব মিলে এক অদম্য ঘেন্নায় আমার বুক যেন খাক হয়ে জ্বলে যায়। কদিন ধরে এমনই হাল হয়েছে, একটু চা করে খাবো, তার জন্যে স্টোভ জ্বালানো দরকার, সেইজন্যে দরকার দেশলাই কাঠি, সেটা চাইলে ওরা কেউ এসে দিয়ে যায়, তো আমি আর চাই না। চাইতেও যেন ঘেন্না। কাগজও চেয়ে নিয়ে আর পড়ি না। কি হবে কাগজে! কি-ই বা হবে কদিন চা না খেলে! যাদের ঘেন্না করি, তাদের কাছে কি আর কোন কিছু চাইতে মন চায়?

৩০শে জুন প্রায় তিন বছর জেল খাটবার পর সবাইকে আবার দেখতে পেলাম। সেই পঁয়ত্রিশ জন। কল্পনা আর অমলেন্দু শুধু নেই; তাছাড়া এক সাথে বন্দী হয়েছিলাম আমরা যে কজন, সবাই আবার এই এতোদিন পর এক হলাম। সে যা বিশ্রী অবস্থা আমার তখন শরীরের। ঘামে জবজব করছে শাড়ীখানা, গায়ের সাথে লেপটে বসে আছে, ভোর ছটা বাজে তখন, জমাদারের পেছন পেছন পুরুষ মহলের মধ্যে দিয়ে নতুন বানানো কোর্টঘরে গিয়ে হাজির হলাম। তা বানিয়েছেও বটে ঘরখানা। মাঝখানে সিলিং অব্দি উঁচু মোটা তারের জালের বেড়া। একপাশে দাঁড়াবো আমরা, আরেক পাশে হাকিম এবং অন্যান্য জুরীর দল। মাথার ওপর একটা পাখা আছে বটে। যখন ঘরে ঢোকালো আমাকে, কেউ নেই, ফাঁকা।

আসতে আসতে দেখেছি আমার পরিচিতদের। আম গাছের নীচে দু সারে সবাই দাঁড়িয়ে আছে। কজন পেটোয়া কয়েদী খুলে দিচ্ছে তাদের হাত পায়ের বেড়ি। কোর্টে নাকি হাতে পায়ে বেড়ি অবস্থায় হাকিমের সামনে বন্দীকে হাজির করার নিয়ম নেই। খুলে খুলে টাল দিয়ে রাখছে গাছের গোড়ায়। কোর্টঘর থেকে বেরিয়ে এলে আবার পরিয়ে দেবে। একেকবারে দুজন দুজনেরটা খুলছে, আর সেই দুজন এসে ঢুকছে কোর্টঘরে। আমি তো সবাইকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি। বেশির ভাগেরই বয়েস কুড়ির নীচে। কেউ কেউ ঢোকবার আগে ঘুরপথে একটু এপাশ ওপাশ ঘুরে, তারপর এলো। এমনভাবে মুক্ত পায়ে মুক্ত হাতে তো দীর্ঘকাল হাঁটার অভ্যেস নেই। তাই কেমন লাগে, সেটাই হয়তো পরখ করে এলো। আমাকে দেখে পরিচিতির হাসি হাসলো দু চারজন। হাজারিবাগ জেলে যারা আমার সঙ্গে গোপন যোগাযোগ রাখতো, তারা নিজেদের পরিচয় দিলো। নাম বললো। এই আমি প্রথম নামে তাদের চিনতে পারলাম। সেই ছেলেটিকে দেখলাম, থানা লকআপে হি হি করে যে কাঁপছিল, ভীষণ জ্বর তখন তার বেশ হাসি খুশী লাগছিল সবাইকে। তবে ভেতরে ভেতরে যেন একটা আতঙ্ক। আতঙ্কটাকে হাসি দিয়ে জোর করে ওরা আড়াল রাখতে চাইছে। বিচার শেষ হবার পর যখন সবাই বেরিয়ে এসেছি, ওদের হাতে পায়ে যখন বেড়ি লাগানো হচ্ছে, জমাদারকে বললাম, এই ফাঁকে ওরা কোথায় থাকে একচমক চোখ বুলিয়ে যাই। রাজী হলো। এলাম স্বচক্ষে সব দেখে। নিজের ঘরে বসে সেদিন ডায়রীতে লিখলাম—'বড় দুঃসহ অবস্থার মধ্যে আছে পুরুষ বন্দীরা। সামনে ছোট্ট একটুখানি উঠোন, তার চাতালটা বাঁধানো। এক কোণে জলের কল আর একধার দিয়ে সারি সারি খুপরি ঘর। বড় নিরানন্দ নির্জন সেই পরিবেশ। আর সৌন্দর্য হীন। এক একটা ঘরে চার থেকে পাঁচজন বন্দীকে হাতে পায়ে বেড়ি পরে চব্বিশ ঘণ্টা কাটাতে হয়। দিনের বেলাও সে ঘরে আলো ঢোকে না। পড়ার দরকার হলে ঘসটাতে ঘসটাতে এসে বসে গারদের সামনে, তবে অক্ষরগুলো মোটামুটি বুঝতে পারা যায়। একটি ঘরে এক সম্পূর্ণ উন্মাদ বন্দীকে এদের সঙ্গে রাখা হয়েছে। তবু খুশী থাকার চেষ্টা করে এরা, হাসে, গান করে, কথা বলে। সে সব আগামী আশার দিনের কথা, আলোর দিনের কথা। বাইরে থেকে হঠাৎ দেখলে মনে হবে তারা ভালোই আছে, সুখে আছে। কিন্তু বুকের গভীরে জমাট বাঁধা দুঃখ। তার হদিশ আমি পেয়েছি। ঐ ঝকমকে এক জোড়া চোখ, চোখের কোলে কালো কালো ছোপ। সারা মুখ জুড়ে উজ্জল অপরূপ হাসি, হাসতে হাসতে মুখটা হয়তো

কখনো কুঁচকে গেলো। অষ্টপ্রহর বেড়ি পরে থাকার জন্য হাত পা স্বাভাবিক ভাবে নাড়তে পারে না। এমনকি, বেড়ি খুলে দেবার পরও না। এটাই তাদের সত্যি-কারের রূপ। এটাকে গোপন রাখার লুকিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা তাঁরা করে যাচ্ছে। রোগা হয়ে গেছে সবাই। সবারই ভেতরে কিছু না কিছু অসুখ। সে অসুখ কি কেউ জানে না। জানবার জন্যে কারুর বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা আছে বলেও মনে হয় না।

প্রতিশ্রুতি

মামলা আর এগোয় না। আঠেরো মাসে বছর তো এদের। সুযোগ পেলেই থমকে যাবে। অবশেষে পুলিস চার্জশীট দিলো। সেই সংক্রান্ত বিশাল এক তাবড়া কাগজ পাঠিয়ে দিলো আমার আছে। সব লেখা আছে তাতে। কেমন করে আমি গ্রেপ্তার হলাম, কি করছিলাম—সব। এককথায়, দারুণ এক চমকদার উপন্যাস যাকে বলে। আমাকে নাকি ওরা জঙ্গলের মধ্যে ঘুর ঘুর করতে দেখে। সঙ্গে তো যথারীতি কিছু বে আইনী পত্র পত্রিকা, তদুপরি একটা প্লাষ্টিকের বোতল. তাতে ভর্তি এক ধরনের অ্যাসিড। ঐ সব নিয়ে মস্ত একদল লোকের সঙ্গে এই আমিই নাকি গিয়ে একটা থানায় এক ফাঁকে কিছু বোমা মেরে আসি! তখনই তো সেই প্লাষ্টিকের বোতলটা দেখে ওরা বুঝতে পারে ওটা পিকরিক অ্যাসিডে বোঝাই। পিকরিক অ্যাসিড কি আর কোন ভালো সৎ কাজের জন্যে সঙ্গে করে কেউ বয়ে বেড়ায়! তাই তো সন্দেহ হয় ওদের, আমি মানুষটা সুবিধের নই, নির্ঘাৎ আমার কোন বদ মতলব আছে। এবং এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে তারা আমাকে গ্রেপ্তার করে।

ভেবে দেখুন অবস্থাটা! এই পিকরিক অ্যাসিড বস্তুটির নাম আমি জীবনে শুনিনি। কিন্তু সে কথা শুনছে কে! হাকিম কি আর আমার কথা বিশ্বাস করবে? পুলিসের দেওয়া বিবৃতিই সঠিক এবং ধ্রুব সত্য বলে মেনে নেবে। হালচাল তো সেরকমই দেখছি। তাছাড়া কুড়ি বছর জেলবন্দী থাকার হুমকিটাও সত্যি বলতে কি মাঝে মাঝে সঙ্গত কারণেই মন বিচলিত করে তোলে।

আর অবাক কাণ্ড, এই সংকট মুহূর্তে এমন একজনের কাছে থেকে একখানা চিঠি পেলাম, আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। এক অল্পবয়েসী জমাদার। কি বলবো, এতো আন্তরিকতা যে কোন জেল-জমাদারের থাকতে পারে, এর আগে কোনদিন বুঝতে পারি নি। লিখলো, যদিও সে নিজে সরকারী চাকুরে, তবু গোটা প্রশাসন ব্যবস্থা যে দুর্নীতি আর অবিচারের ডিপো, এটা স্বীকার করতে তার বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নেই। এমত অবস্থায়, তার আশংকা, শুনানী হয়তো সঠিক ভাবে না-ও হতে পারে। আমাকে অনুরোধ করেছে, আমি যেন পাটনা বা কলকাতার কোন নামকরা ব্যারিষ্টার দিয়ে আমার এবং সেই সঙ্গে আমাদের সকলের মামলা পরিচালনার ব্যবস্থা করি। আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে তার চিঠির জবাব দিতে গিয়ে লিখলাম, ভাই, অতো টাকা তো আমার নেই যে ব্যারিষ্টার ভাড়া করে আনবো সুদূর কলকাতা থেকে। তাছাড়া যোগা-যোগের সময়টাও খুবই সংক্ষিপ্ত। দেখা যাক না, জল কতদূর গড়ায়।

আসলে মনে মনে আমার কিন্তু ঘোরতর সন্দেহ, ব্যারিস্টার এলেও কিছু করতে পারবে কি না। সম্ভব নয়। কেননা এদের ধরনধারণই আলাদা। মামলায় কি রায় দেবে বা কি পরিণতি হবে আগে থেকেই ওরা ঠিক করে রেখেছে। এ অবস্থায় গোটা ব্যাপারটাই তো একটা প্রহসন। মিথ্যে-মিথ্যি কেন তবে আর ব্যারিস্টার এনে ঝঞ্ঝাট বাড়াই।

তবু হাজিরার দিন এলে নিয়ম করে কোর্ট ঘরে যাই। একটি দিনও কামাই যায় না। গেলে অন্তত পুরুষ মহলে সবার দেখা তো পাবো। কথা হবে। বাংলায়। আমার বাংলা বলার চর্চা হবে। এটুকুই লাভ। কথার তো আর শেষ নেই। ভারতীয় রাজনীতি কোন্ দিকে মোড় নিচ্ছে, দেশ কিভাবে এগোচ্ছে, জামসেদপুর আর হাজারিবাগের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যাপারে অমিল আর কোন্ কোন্ ব্যাপারে মিল—এরকমই নানান ব্যাপার আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু। সব চেয়ে চমৎকার লাগে আমার ছেলেগুলোকে দেখে। দেখি, আর অবাক হই। শ্রদ্ধায় আমার মাথা নীচু হয়ে আসে। কী বিবেচনা বোধ, কী নম্র আর কী মধুর ওদের ব্যবহার! সহ বন্দীদের জন্য কত দরদ। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে লড়াইয়ের প্রশ্নে কিন্তু প্রচণ্ড এক রোখা। দেখা হলেই আমার শরীর কেমন আছে জিজ্ঞেস করে। কোন অসুবিধে হচ্ছে কিনা, সাহায্যের কোন প্রয়োজন আছে কি না এসবও জানতে চায়। এ যেন সেই আমার কলকাতায় আসার প্রথম দিককার অভিজ্ঞতার মতো। কত যুবকের সঙ্গে কথা বলেছি, সবার চোখে সে এক আশ্চর্য দীপ্তি।

আত্ম বলিদানের সম্বন্ধে সে কী অদম্য তেজ আর আগ্রহ! এতোটুকু কিন্তু খাদ নেই সেই আগ্রহে। ভারতের অগণিত মানুষের স্বার্থে তারা সব কিছু করতে পারে। ওদের সঙ্গে কথা বলে এখনও আমি সেই একই সুর শুনতে পাই।

এটা সত্যি, নকশাল সন্দেহে এ পর্যন্ত কয়েক হাজার যুবক হয় নিহত না হয় গ্রেপ্তার হয়েছে। এমনকি আমরা নিজেরাও জেলে। কবে ছাড়া পাবো তার কোন ঠিক নেই। তবু একটা জিনিস এদের মুখোমুখি হলে বারে বারে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারি। ভারতের ভবিষ্যৎ ভারতের মুক্তি এদেরই মতো সৎ সজ্জন কিছু মানুষের হাতে। মানুষের মতো মানুষ বলতে এরাই। এরা জাতপাত মানে না, কুসংস্কারের এরা ধার ধারে না। এদের আত্মার আত্মীয় গরীব দুঃখী কোটি কোটি মানুষ। তারাই তো দেশের ভবিষ্যৎ। সুন্দরভাবে মিশে যেতে পারে এরা তাদের সঙ্গে। মুক্তি এরা আনবে না তো আনবে কে?

কনসাল অফিস থেকে কর্তারা মাঝে মাঝেই আসে। বিস্তর কাঠখড় পোড়ায়, যাতে মামলা তাড়াতাড়ি শেষ হয়। কিন্তু কিসের কি। মামলা কি তাদের মতে চলে? এদিকে আমার আত্মীয় বন্ধুর দলও বড় চঞ্চল হয়ে পড়েছে। আর কত দেরী মামলা শেষ হতে? জামসেদপুরে আমাকে নিয়ে গেল জেলে, অন্ততঃ এই আশাটুকু করেছিল, এবার যাহোক একটা হেস্তনেস্ত হবে। মাঝে এই মর্মে মা বাবার লেখা একখানা চিঠিও পেলাম। কিন্তু কি জবাব দেবো তাঁদের? কি করে প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করে বোঝাবো? এদিকে বাজারে যেন খবর ওড়ে মুড়ি মুড়কির মতো। একদিন সকালে আমার উকিল বললো, লণ্ডনের কাগজে বেরিয়েছে, আমার নাকি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়ে গেছে। ভাবুন দেখি, খবর পড়ে আমার বাবা মার কি মনের অবস্থা। বললাম, আপনি এক্ষুনি চিঠি লিখে আমার বাড়িতে জানিয়ে দিন, ব্যাপারটা সত্যি নয়, মামলা এখনও শেষ হয় নি। জানি না লিখেছিলো কিনা। বা লিখলেও সে চিঠি দেশের ছাড়পত্র পেয়ে বাইরে যেতে পেরেছিলো কিনা। বাইরে অবিশ্যি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, এরকম কোন চিঠি তাঁরা পাননি।

এদিকে হাই কমিশন অফিসের লোকজন তো অদ্ভুত এক সূত্র আবিষ্কার করে বসে আছে। ঐ যে আমি একলা আমার বিচারে রাজী হই নি, বলেছি বাকী সবার সঙ্গে আমার বিচার হোক; এটাই নাকি যত নষ্টের মূল কারণ। গোড়ায় যা যা বলছিলাম, এ নাকি তার একেবারে উলটো। আর তাইতেই তো যত বিপত্তি। তা বিপত্তি করবো না তো কি। ওরা বলে, তুমি দেশে ফিরে যাবে

বলে কথা দাও, তোমার বিরুদ্ধে সব মামলা তুলে নেবো। এই মর্মেই আমাকে আলাদা ভাবে জামসেদপুরে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে আমাকে 'স্বীকারোক্তি' দিতে হবে। দিতে হয় দেবো, কিন্তু তার আগে সবাইকে জামসেদপুর নিয়ে এসো, এক সাথে বিচার হোক! হতে তো আর কোন আপত্তির কারণ থাকতে পারে না। একসাথে গ্রেপ্তার হয়েছি, একসাথেই বিচার করতে হবে। এই তো মাত্র আমার দাবী। ওরা হাই কমিশনকে বললো, দেখেছেন, কি বিশ্রী ব্যাপার! সবাইকে নিয়ে উনি ওখানেও আবার ঘোঁট পাকাতে চাইছেন। আমরা বলেছিলাম না, ওকে কায়দা করা শক্ত। এখন মিলিয়ে নিন! ভাবখানা এমন, যেন আমার জন্যেই যত দেরী, আমার জন্যই যেন ওদের সব পণ্ড। এসব না করলেই যেন আমাকে আগ বাড়িয়ে ছেড়ে দিতো। ফলে সবার যাবতীয় চেষ্টা বানচাল করে মামলা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যথারীতি চলতে লাগলো। ওরাও আর 'স্বীকারোক্তি' নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ করলো না।

আমার বন্ধু আইরিস মার্কন্ আবার দেখা করতে এলে আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলাম। সব বুঝিয়ে বললাম তাকে। কেন দেরী, কোথায় আটকাচ্ছে, কি কি অসুবিধে সব। দেশে ফিরে আইরিস সবাইকে বুঝিয়ে বললো। তবে তো শাস্তি। তবে তো বুঝলো সবাই এ মামলার নিস্পত্তি অদূর ভবিষ্যতে হবার সম্ভাবনা নেই। তখনই না গতর নেড়ে সবাই নড়ে চড়ে বসলো। সুরু হলো সংবাদ পত্রের মাধ্যমে প্রচার। শুধু আমার ব্যাপারই নয়, প্রসঙ্গক্রমে ভারতের যাবতীয় বন্দীর ভবিষ্যতের প্রশ্ন নিয়ে ওরা লিখতে শুরু করলো। কোন যে বাধা তাতে আসেনি তা নয়। কিন্তু ওরা স্পষ্টভাবে আমাকে জানালো, যত বাধা বিপত্তিই আসুক, আমরা হাল ছাড়ছি না। এর একটা হেস্তনেস্ত না হওয়া অব্দি লেগে থাকবো। মনে তবু যাহোক একটু জোর পেলাম। কাজ হোক কি না হোক, চেষ্টাটা তো ভালো। এদিকে অমলেন্দুর বাবাও বসে নেই। ইন্দিরা গান্ধীর কাছে চিঠি লিখেছেন। জবাব এসেছে। বলেছেন, উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জানি না সে ব্যবস্থা কি। তবে তার পর আর এ ব্যাপারে কোন চিঠি প্রধান মন্ত্রীর দপ্তর থেকে আসে নি।

তা লণ্ডনে যে এতো হৈ চৈ এতো সোরগোল, এর সবই যে আমার বা আমাদের ভালোর জন্যে, এটা ভাবলে কিন্তু ভুল হবে। মনগড়া কাহিনীও প্রচুর আছে। একটা দৈনিকে বেরুলো মস্ত বড় এক লেখা, যে সাংবাদিক লিখেছে, সে নাকি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে সব জেনে গিয়েছে। হাজার চেষ্টা করেও আমি

তাকে মেলাতে পারলুম না। বাস্তবিক, তার সঙ্গে আমার কখনো দেখাই হয় নি। 'গার্ডিয়ানে'র ওয়াল্টার সোয়ার্জের নাম শুধু মনে আছে। বেচারী জামসেদপুর অব্দি এসেছিল আমার সাক্ষাৎকার নেবে বলে। কিন্তু অনুমতি মেলে নি। তাই হতাশ হয়ে ফিরে গেছে। তবু বলবো, ফিরে গিয়ে যা লিখেছিল, মোটামুটি আমার প্রকৃত অবস্থার প্রতিচ্ছবি। এমনকি কেন আমি সবার সঙ্গে আমার বিচারের দাবী জানিয়েছি সে ব্যাপারেও মোটামুটি আমারই চিন্তার অনুকূলে কিছু নিজস্ব মতামতও রেখেছিল। এছাড়া বাকী কজন সাংবাদিকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। সবারই নজর আমার ব্যক্তি জীবনের দিকে। তাই নিয়েই একের পর এক প্রশ্ন। জবাব শুনে ত একজনকে তো যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হতেও দেখলাম। এক সাংবাদিককে আমি আমার ছবি তুলতে দিই নি। সে ফিরে গিয়ে লিখলো এক কুৎসিৎ বিবরণী। তাতে আছে, আমি নাকি জেলখানার আতঙ্ক, সবার মনে নাকি ত্রাসের সঞ্চার করে সারা জেলখানা আমি দাপিয়ে বেড়াই। তা প্রতিটি কাজেরই তো ভালো মন্দ দুটো দিক আছে। একদল যেমন পড়ে ছ্যা ছ্যা করলো আমাকে, আরেকদল—তাদের মধ্যে পড়েন এখানকারই জনৈক আমেরিকান ধর্মযাজক—খবর পড়ে অনুমতি আদায় করে বলতে গেলে ছুটতে ছুটতেই এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর ধারণা, ধর্মান্তরিত হয়েছি বলেই না আমার ঘাড়ে শয়তান ভর করেছে। অতএব সেই শয়তানকে ছাড়াতে হবে। স্বধর্মে আমার মতি ফিরিয়ে আনতে হবে। সে যে কী মিষ্টি ব্যবহার কি বলবো। আমাকে এক গাদা ফল দিয়ে গেলেন, আর মিষ্টি, আর নানারকম খাবার, সঙ্গে বেশ কিছু বই। স্বধর্মের ছত্রছায়ায় আমাকে আবার ফিরিয়ে আনবেন বলে তিনি নানান লাইব্রেরী থেকে চেয়ে চিন্তে বইগুলো সংগ্রহ করে এনেছেন। ব্যস, আমার তো পোয়াবারো।

ঠিক শান্ত পুকুরের জলে একটা ঢিল ছুঁড়ে মারার মতো। কদিন চললো এই সব নিয়ে খুব হৈ চৈ। কদিন পরে সব শান্ত। ফিরে এলো একটু একটু করে আবার গতানুগতিক জীবন। দর্শনার্থীদের ভিড় এখন আর নেই। না কোন বাইরের শুভানুধ্যায়ীর। আমি আবার বন্দীদের সঙ্গে মিশি। আবার কথা বলি আগের মতো। বেশির ভাগই তো বিনা বিচারে বন্দী। সবারই কোন না কোনদিন চূড়ান্ত বিচার হবে, এই আশা। কবে হবে কেউ সঠিক করে বলতে পারে না। মাঝে মাঝে দেখি লরিতে বোঝাই করে সবাইকে নিয়ে যায় স্থানীয় আদালতে। সেখানে মস্ত একটা বারান্দা আছে। বসিয়ে রাখে চৌপর দিন। জমাদারণী লাঠি হাতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে পাহারা দেয়। পুরুষদের, অবে, দেওয়া হয়

এজলাসের লক আপে। ছোট ঘর, তাতে পাশ ফিরে দাঁড়াবার উপায়টুকু অব্দি নেই। আর যা গুমোট গরম! কেউ না কেউ রোজই তো শুনি অজ্ঞান হয়। পালটা ব্যবস্থাও আছে। পাহারার পুলিসকে তিন টাকা ঘুষ দিয়ে যে কেউ দু ঘণ্টার জন্য মুক্তি পেতে পারে। দু ঘণ্টা ঘুরে ফিরে আবার এসে ঢুকবে লক আপে। পাঁচ টাকা দিলে তো টানা চার ঘণ্টা খালাস। এরই মধ্যে আত্মীয় স্বজন যদি বন্দীর সঙ্গে কথা বলার আব্দার জানায়, তবে তাকে দিতে হয় নগদ দুটি টাকা। আরো কিছু দিলে বাড়ি থেকে তৈরী করে আনা খাবার অব্দি তাকে দিতে পারে। এই আত্মীয় স্বজন এমন কি বন্দী ব্যক্তিটি স্বয়ং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দিনমজুর। তার আয় বড় জোর তিন থেকে চার টাকা। বলতে গেলে, একটু সুযোগ সুবিধের জন্যে পুরো মজুরির টাকাটাই এনে তুলে দিতে হয় আইনের প্রতিভূর হাতে।

মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির সুবন্দোবস্তও আছে। দুটি শর্ত। প্রথমতঃ অভিযোগ গুরুতর হওয়া চলবে না, দ্বিতীয়তঃ নগদ কুড়িটি টাকা সঙ্গে থাকা চাই। পেশকারকে দিতে হবে টাকা। অমনি সেদিনই মামলা উঠবে, শুনানী হবে, দরকার নেই অবশ্য শুনানীর, নিজেকে অপরাধী বলে মেনে নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাতে শাস্তির হুকুম সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাবে। অহেতুক তো আর বিনা বিচারে জেল খাটতে হবে না। আর অভিযোগ মারাত্মক হলে চাই আরো বিস্তর অর্থ। এক বন্দিনীকে জানি। মেয়ে ফুঁসলে আনার দায়ে অভিযুক্ত। দু হাজার টাকা দিতে হলো তাকে। নিলো তিনজন। থানার পুলিস অফিসার, পেশকার আর হাকিম স্বয়ং। ব্যস, সে বেকসুর খালাস।

হীরাকে আমার বড় ভালো লাগতো। জাতে সাঁওতাল। তন্বী আর ভারী দুর্দান্ত চেহারা। সাঁওতালদের মধ্যে এমন চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্য আমি দেখিনি। ব্যবহারও অতি চমৎকার। নম্র, ভদ্র, বিনয়ী। গায়ের রং অতোটা কালো নয়, বরং খানিকটা ফর্সা ঘেঁষা। বেশ লম্বাটে গড়ন। চলনে বলনে আভিজাত্যের ছাপ। এটা ওর স্বভাবজ। এর জন্যে ওকে আলাদা ভাবে কোন কসরৎ করতে হয় না। কোনদিন দেখিনি ওকে হাসতে। কখনো কখনো হয়তো আপন খেয়ালেই ঠোঁটের কোণে এক চিলতে মুচকি হাসির ঝিলিক ফুটিয়ে তুলতো, কিন্তু সে মুহূর্তের বিলাস। যেমন আসতো আচমকা, মিলিয়ে যেতেও তেমনি সময় লাগতো না। প্রাণ খুলে হাসবেই বা কিভাবে। যে বিপদে পড়েছে, তার তো কোন সমাধান নেই। সে তো নিজে সেটা ভালো করেই বোঝে। ভীষণ গরীব তো বাবা মা।

তাই যৌবন যখন এলো, কবে বাবা মা দেবে বিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা না করে নিজেই জুটিয়ে নিলো বর, নিজেই বিয়ে করলো। বরের বাবা মা ভীষণ অসুখী। অমন তরতাজা জোয়ান ছেলে তাদের. তারা তো বসে ছিলো উন্মুখ হয়ে দেখে শুনে তার বিয়ে দেবে বলে। বেশ পয়সাঅলা ঘরের মেয়ে আনবে, বৌ এর সঙ্গে সঙ্গে দুটো পয়সাও আসবে সংসারে, অর্থাৎ বরপণ। তা না তো কোথেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলো হাড় হাভাতে একটা মেয়ে! এ কি সহ্য হয়! বিয়ে উপেক্ষা করে তারা নতুন করে মেয়ে দেখলো, কথা দিলো মেয়ের বাপকে। এদিকে হীরার পেটে তো ততদিনে বাচ্চা এসেছে। আর কী টিটকিরি পাড়াপড়শীর! বলে, কদিন পরে তো দূর করে তোকে তাড়িয়ে দেবে বাড়ি থেকে, তখন তোর কি হবে? ও তো ফের বিয়ে করলো বলে। কাঁহাতক আর সহ্য হয়। একদিন এক বুড়ীর সঙ্গে এই নিয়ে লাগলো হীরার তর্কাতর্কি। বুড়ীর সে যা বাক্যবাণ! হীরার রাগ উঠলো চরমে। হাতের কাছে ছিলো একটা ইঁট, তাই দিয়ে ধাঁ করে বুড়ীর মাথায় বসিয়ে দিলো এক ঘা। বুড়ী চোখ কপালে তুলে তৎক্ষণাৎ অক্কা তারপর তো থানা পুলিস, শেষে জেল। পেটের সেই বাচ্চাটা ভূমিষ্ঠ হয়েছে ছেলে। ছেলের বাপ তো এদিকে বাবা মার পছন্দ করা সেই মেয়েকে বিয়ে করে ফেলেছে। করলেও সাঁওতাল সমাজের নিয়মানুযায়ী হীরার ছেলেকে তার নিজের ছেলে বলে মেনে নেওযার কথা। তার দায় দায়িত্ব পালন করার কথা। সে নিয়ম ধোপে টেঁকে নি। হীরার শ্বশুর পয়সা খাইয়ে পাঞ্চায়েতের মুখ বন্ধ করে রেখেছে। সুতরাং সন্তানের দায়িত্বও এখন হীরার। হীরার ভায়েরা চেয়েছিল সাহায্য করতে। জামিন নেবার তোড়জোড়ও করেছিলো। কিন্তু সাহস করে শেষ অব্দি আর এগোতে পারে নি। মুখিয়া তো বহুদিন আগেই হীরাকে দিয়েছে বে-জাত করে। তাকে নিয়ে নাচানাচি করলে যদি তাদেরও একঘরে করে দেয়! কিভাবে বাঁচবে তাহলে তারা! কাজ পাবে না, কেউ কথাটি অব্দি বলবে না, সব দোর বন্ধ—পারে কেউ এই অবস্থায় দিনের পর দিন বেঁচে থাকতে! সুতরাং পরিবারের আর সকলের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে হীরাকে তারা বরবাদ করতে রাজী হয়েছে। একের জন্যে দশজন কষ্ট ভোগ করবে—এ কি হয়!

গুলাবীর কথাও এই প্রসঙ্গে মনে আসছে। আমার কাছে সময় অসময়ে আসতো। নানান সুখ দুঃখের কথা বলতো। গরীব তো খুব, আর বয়েসটাও প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। সবাই ডাকতো গুলাবী বুড়ী বলে। পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই

হলেই এদের হিসেবে সবাই বুড়ো। তা জামসেদপুরে আমি আসার ক হপ্তা আগে শুনি এক জমাদার গুলাবীকে বেদম মেরেছে। মার খেয়ে পড়ে গেছে ছিটকে। কাঁধের হাড সরে গেছে। সে কী যন্ত্রণা। দেখি মাঝে মাঝেই কাতরায়। এদিকে জেলে তো যন্ত্রণা লাঘবের কোন উপায়ই নেই। না ডাক্তারখানায় না অন্য কোথাও। বাড়ির কেউ খোঁজ নিতেও আসে না। আসবে কি করে, বড় যে গরীব। আর জামিনে খালাস করে নিয়ে যাওয়া? হায়, জামিন নেবার অতো টাকা কি তাদের বেচলেও জুটবে? এসব গুলাবী ভালো করেই জানে। তাই বাড়ির ওপর ভরসা না করে নিজেই সঞ্চয় করা শুরু করেছে। রেশনের বরাদ্দ তেল বেচে, সাবান বেচে একটির পর একটি পয়সা শুধু জমায়। কোনদিন খরচ করতে দেখি না। জামিনে খালাস পেতে গেলে ঘুষের অঙ্কটা যে বড্ড বেশি। ইদানীং পুরনো হিসেবে আর হয় না। বাজার মাগ গী হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুষের টাকার পরিমাণও বেড়েছে। অত টাকা কি আর তেল সাবান বেচে জোটানো যায়? এখন কি অবস্থায় আছে সে জানিনা। তবে জামসেদপুর থেকে যখন আমি ফের হাজারিবাগে ফিরে আসি, তখন পর্যন্ত তার একদিনও হাকিমের মুখোমুখি হবার সুযোগ হয় নি। তিন তিনটে বছর সে নাগাড়ে বিনা বিচারে জেল খাটছে।

সেই যে বলে না অজ্ঞ—গুলাবী ঠিক তাই। শুধু সে কেন, অনেকেই। কিছুই জানে না, কিছুই বোঝে না। কিছু বলতে এই দুনিয়ার হালচাল, তার অদ্ভুত সব নিয়ম। দিনমজুর খাটতো এক জমিদারের ক্ষেতে। ধান কাটার মরশুম। আরো চারজন দিনমজুর কাজ করতো। এদিকে সেই জমি নিয়ে আবার জমিদারেরই ভাইপোর সঙ্গে কষাকষি। একদিন পুলিস এনে দিলো সবকটাকে ধরিয়ে। এমনকি গুলাবীদের যে কাজে লাগিয়ে ছিলো, তাকেও। অভিযোগ—ওরা নাকি ধান চুরি করছিল। গ্রেপ্তারের পর রাজায় রাজায় মীমাংসা হলো। কি সেই মীমাংসার শর্ত গুলাবী জানে না। তবে দেখা গেলো, কাজে লাগিয়েছিল যে, সে জামিনে খালাস পেয়ে চলে গেছে। পড়ে রইলো শুধু তারা পাঁচ জন। তাদের আর কেউ খালাস করার কথা ভাবে না। দেখতে দেখতে তিন বছর কাটলো। এই তিন বছর ধরে কি আর করবে গুলাবী, বসে বসে কাঁথা সেলাই করেছে। যেখানে যত ছেঁড়া ন্যাকড়া আছে সব কুড়িয়ে নিয়ে আসে। একটার ওপর আরেকটা, তার ওপর আরেকটা পেতে সেলাই করে কাঁথা। এগুলো নাকি ও বাড়ি যাবার সময় নিয়ে যাবে। হায় অজ্ঞতা! বোঝে না তো কেমন মানুষ ঐ মেটিনী। ফটকের বাইরে একখানা কানিও বের করতে দিলে তো!

দেখতে দেখতে শরৎ এলো। ধানকাটার মরশুম। আপশোষ করতো গুলাবী —ইস্, যদি এখন বাড়িতে থাকতাম, কত কাজই না পেতাম! আর কত পয়সা! সংসারে দু মুঠো সবাই পেট পুরে খেতে পারতো। ভাবে ওর সেই তাগদ বুঝি এখনও আছে। কাঁধের হাড় সরে গেলে সেটা ফের সঠিক অবস্থানে ফিরে না যাওয়া অব্দি যে কেউ কাজ করতে পারে না, এই সহজ সত্যটি তাকে বোঝাবো কেমন করে? বলে, ধান কাটার মরশুম শেষ হলে জঙ্গলে কাঠ কুড়োবে। নয় মেনে নিলাম একহাত দিয়ে ছোট ছোট কাঠ কুড়োতে পারবে। কিন্তু বয়ে আনা? সেটা দু হাত ছাড়া কি সম্ভব। ঘাড়ে গোটের জন্যে যে একটা হাত মোটে নাড়তে পারে না।

জামসেদপুরে আর একটি নতুন ঘটনা একদিন প্রত্যক্ষ করলাম। হাজারিবাগে দেখেছিলাম একটা মৃতদেহ. এখানে দেখলাম জন্ম। বলতে গেলে আমার চোখের সামনে একটি নবজাতক ভূমিষ্ঠ হলো।

একেবারে আক্ষরিক অর্থে ভূমিষ্ঠ। তালা খুলে দিয়েছে আমার কুঠুরির, তখন ভোর, বেরিয়ে এসে দেখি রক্ত আর রক্ত। আর মাটিতে সেই রক্তের মধ্যে একটি ফুটফুটে মেয়ে, মাত্র ক'মিনিট আগে যার জন্ম হলো।

মা দাঁড়িয়ে আছে দেয়াল ধরে, ঝুঁকে পড়া শরীর। কাপড় তুলে কোমরে জড়ানো, ঘামে জবজব করছে গা, আর দু পা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্তের ধারা। নীচে থকথক করছে আঁঠার মতো লোদ, আর জলের মতো একরকমের তরল, আর তো রক্ত। শিশুটি তারই মধ্যে চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে।

আর কি অবাক কাণ্ড. কেউ তাকে ছোঁবে না। বাচ্চা খালাস করা যে নোংরা কাজ, চামাররা করে. তারা অচ্ছুৎ। হিন্দুরা কি এসবের ধার কাছ মাড়ায়! বন্দীদের মধ্যে চামার কেউ নেই, সবাই হিন্দু। ফলে কেউ আর এগোয় না। শুধু মেটিনীই যা দেখলাম একটু ব্যতিক্রম। প্রসবের সময় বাচ্চা ধরে দিয়ে গেছে। এবং ঐটুকুই। তাকেও আর ধারে কাছে দেখছি না। তা কি করি! বীণা আর আমি হাত লাগালাম। জানি কি ছাই কিছু! ধোয়াধুয়ি যে করবো, তার একটুকরো কানি অব্দি নেই। বাচ্চাটাকে জড়াবার নেই একটু পরিষ্কার ন্যাকড়া। তবু হাত দিয়েই যাহোক যেটুকু পারি করলাম। ইতিমধ্যে প্রাতরাশ হাজির। পুরুষ বন্দীরা বালতি হাতে এসে দাঁড়িয়েছে। দেখলো একবার চোখ তুলে প্রসূতির দিকে। নিস্পৃহের মত পর মুহূর্তেই খাবার বিলি করা শুরু করলো। ডাক্তার এলো তারও খানিকক্ষণ পরে। সদাচারী ব্রাহ্মণ, নিজে তো আর ঐ বেজাতের আতুড় ছুঁতে

পারে না, সঙ্গী কয়েদীকে বললো নাড় কেটে বেঁধে দিতে। আর সে বেচারীর যা অবস্থা। জীবনে এ কাজ তো কখনো করে নি, এই প্রথম, কি করবে কিভাবে কি বাঁধবে ভেবেই পায় না। ডাক্তারখানায় কাজ করে তাই সবাই ওকে বলে কম্পাউণ্ডার। কাজ তো আদতে কিছুই জানে না। হিসেব টিসেব রাখতে পারে। অক্ষর জ্ঞান আছে, দু কলম লিখতেও পারে—এটাই ওর যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি। অবিশ্যি এছাড়া তার দরকারই বা কি। নামেই হাসপাতাল, আসলে ছোট্ট একটা ঘর, তাতে দু তিন রকমের শুধু ট্যাবলেট—মাথা ধরা আর বদ-হজমের। তা-ও আবার এই মহা মূল্যবান ওষুধগুলি প্রচণ্ড অসুস্থ না হলে কাউকে দেওয়া হয় না। তো বেশি জানার দরকারটা কি।

সে বছর বর্ষা এলো বিস্তর দেরী করে। জুন মাসে ধান চাষের সময় তো বৃষ্টি হয়, বিশেষ করে চারা বসাবার আগে; সে বার আসতে আসতে সেই সেপ্টেম্বর। ধান তখন সবে পেকে উঠেছে, গেলো সব নষ্ট হয়ে। আর সে বৃষ্টিও কী বৃষ্টি। সারাদিন শুধু ঝরঝর ঝমঝম, যেন ঝরার আর কামাই নেই। বেরুবো একটু তার উপায়ও নেই। এদিকে ছাদ ফুটো। চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল পড়ে ঘরের অবস্থা কাহিল। সঙ্গে দমকা হাওয়া। এক একটা দমকা আসে, দেয় গরাদের উলটো দিকের দেয়াল অব্দি ভিজিয়ে। গা বাঁচিয়ে কোথাও শান্তিতে যে একটু বসবো, তার উপায় নেই। বৃষ্টির জন্যে রান্নাতেও দেরী। খাবার আসে বেলা করে। খিদেয় তো পেট চুঁই চুঁই করতে থাকে। শীত করে খুব। কনকনানি ঠাণ্ডা। তবে লাভ একটা হয়েছে। বৃষ্টির তাড়নায় ইঁদুরগুলো সব বেরিয়ে পড়েছে গর্ত থেকে। বন্দীদের সে কী আনন্দ! বৃষ্টি মাথায় করে হুড়মুড় করে দল বেঁধে বেরিয়ে ধরে আনে একেকটা ইঁদুর, কোনদিন দুটো তিনটে বা তারও বেশি। ধরতে গিয়ে ধপাস ধপাস আছাড় খেয়ে তো কাদায় মাখামাখি। তবু বিকার নেই। মাংস তো হলো। হরিজনদের একটা অংশ ইঁদুরের মাংস খেতে ভালোবাসে। মোটামুটি আগুনে ঝলসে নেয়। তাই খায় নুন মশলা দিয়ে। হাজার হোক, প্রোটিন তো! প্রোটিনের জন্যে সে যে কী আকুতি! আমাকে বলেছিল কয়েকবার চেখে দেখতে। নাকি ভারী সুস্বাদু, ক্ষতিকারক নয়। একদিন কিন্তু কিন্তু করে দু টুকরো মুখে দিলাম। মন্দ না। ফ্রান্সে ব্যাঙের ঠ্যাঙ খেয়েছিলাম, বা খরগোসের মাংস—স্বাদটা একটু তার চেয়ে অন্যরকম। এ ছাড়া অভিনবত্ব আর কিছু নেই।

বৃষ্টির দিনে বসে থাকা ছাড়া তো আর কোন কাজ নেই, বসে বসে মশগুল হয়ে

শুনতাম বীণার গল্প। গল্প বলবো, না কাহিনী? এ তার নিজেরই জীবনের কথা। এমনই বৃষ্টির দিনে যেতো ধান রুইতে, ভোর সকাল থেকে সন্ধ্যে অব্দি একটানা কাজ, তারপর স্নান। স্নান করে ভেজা শাড়ী গায়েই শুকোতো। একখানা বই দুখানা তো আর নেই। মজুরী পেতো চালে। বাড়ি ফিরে তাই চড়িয়ে দিতো হাঁড়িতে। আদ্দেকটা খেতো আর আদ্দেক রেখে দিতো পরের দিন সকালের জন্যে। বিছানায় শুতো, পায়ে সে কী চুলকোনি! বদ্ধ জলে সারাদিন কাজ। চুলকোবেই তো। কোমর করতো টনটন, হাতে যেন আর জোর নেই। তার ওপর কাজ করতে করতে নামতো বৃষ্টি। শাড়ি ভিজে জবজবে। শুকোতো গায়ে। একদিন নয়, দুদিন নয়—দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। একসঙ্গে দুখানা শাড়ীর মুখ কখনো দেখেনি। দেখবার সুযোগও হয় নি।

বীণাই বললো আমাকে, গ্রেপ্তার হবার আগে গ্রামীণ জীবন সম্বন্ধে যা পড়েছি আমি সব ঠিক। কোথাও তার এতোটুকু ভুল নেই। সারা গ্রামের মধ্যে একমাত্র জমিদারই সম্পন্ন মানুষ। তার ভাঁড়ার কখনো শূন্য হয় না। হলে সে ধার দেবে কেমন করে। বীণা যেখানে থাকতো, সেখানকার সুদের হার শতকরা একশো ভাগ। সরকারী সাহায্য কখনো কখনো আসতো না যে এমন নয়, কিন্তু পেতো শুধু তপশীলী জাতি উপজাতির মানুষ। তারও আবার বিলি বণ্টনের দায়িত্ব গাঁয়ের মোড়লের। সে জমিদারের পেটোয়া বণ্টনের সময় সে কিছু টাকা ফাঁকি দিয়ে কেটে রাখে, সেই টাকা দিয়ে যখন ধানের দাম পড়ে যায়, কিনে রাখে ধান। সেই ধান কর্জ দেয়। যথারীতি চড়া সুদে। সে যে কী দুঃখ কী কষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। হিসেবের কারচুপিতে যাকে বলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত অবস্থা। তাই মেটাতে গাঁয়ের শত শত লোককে আজীবন জমিদারের জমিতে বেগার খাটতে হয়। যারা ছোটখাটো জমির মালিক, তাদেরও দুঃখের শেষ নেই। কর্জ তো তাদেরকেও নিতে হয়েছে। ধান কাটার সময় আগে ভাগে এসে জমিদারের লোক দাঁড়িয়ে থাকে। তারটা না মিটিয়ে কাটা ধান ঘরে নিয়ে যাওয়া চলবে না। ভাগচাষীরাও নাকালের একশেষ। লাঙ্গল সার বীজধান শ্রম সব তাদের, তবু জমি যেহেতু জমিদারের, তার খাজনা বাবদ দিতে হবে আদ্দেক, কখনও কখনও দুই তৃতীয়াংশ ফসল। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার জমিদার আর সুদখোর মহাজনের ওপর গাঁয়ের ব্যাপক মানুষের এই নির্ভরশীলতার জন্যই যে সব ভোট হয়—সে পঞ্চায়েতী ভোট বা বিধানসভার ভোট,—তাতে এই জমিদার-মহাজনের লোকেরাই জেতে। অর্থাৎ এই ব্যাপক নিপীড়িত মানুষই জেতায়। না জেতালে যে কর্জ পাবে না, তাহলে যে না খেয়ে মরতে হবে।

বাহাত্তরে ফসল ভালো হলো না। আমাদের খাবার আসতে দেরী হয়। একপেট খিদে নিয়ে বসে থাকি, তাই প্রতিবাদের পর প্রতিবাদ করতে লাগলাম। পরে শুনলাম, দেশের প্রায় দুকোটি মানুষ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছে। এক দানা খাবারও তারা পায় না। এদিকে গম বেপাত্তা। কোথায় গিয়ে যে লুকিয়ে পড়লো, কেউ আর হদিশ পায় না। একমাত্র কালো বাজার ছাড়া। সেখানে বেশি দাম দিলে দেদার গম পাওয়া যায়। চালের দাম তো ক মাসের মধ্যে বাড়তে বাড়তে ঠিক দুগুণ। সবাই বলে আরো নাকি বাড়বে। সরকারী ভাষ্য অনুযায়ী এটা কিন্তু বাস্তব অবস্থা নয়, এতোটা আকাল নাকি হয় নি। কিন্তু ভাষ্যে তো আর পেট ভরে না। গরীব মানুষ যে ক্ষুধার খাদ্য পায় না, এটা সত্যি। ফলে ভাষ্যদান সত্ত্বেও অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে। শুধু দাপিয়ে বেড়ায় কালোবাজারী আর মজুতদারের দল। আর কলেরা আর বসন্ত আর ম্যালেরিয়া। এনকেফেলা-ইটিসেও বিস্তর মানুষ মারা যায়। সব অসুখেরই মূলে হয় খাদ্যাভাব নয় উপযুক্ত ওষুধের অভাব, নয় তো সামান্য একটা মশারি কেনার যোগ্যতার অভাব।

তবে চুপচাপ মুখ বুজে সবাই যে সব কিছু মেনে নিচ্ছে এমন নয়। ভারতীয় জনগণ নিশ্চুপে মেনে নেবার মতো মানুষ নন। যেন একটা ফুটন্ত কড়াই, টগবগ করে ফুটছে সব কিছু। সরকার চাইছে স্তোকবাক্য দিয়ে ঢাকাঢুকি দিয়ে রাখতে। তাতে কি আর কাজ হয়। পানীয়ের সংকট, জ্বালানীর সংকট। মহারাষ্ট্রে তো খাদ্য নিয়ে ছোটখাটো দাঙ্গাও হয়ে গেলো। বিহারে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে হলো ধর্মঘট। ওরা বললো নাশকতামূলক কাজ। আর ধর্মঘট তো অন্যান্য হাজারো ব্যাপারে লেগেই আছে। পরিবহন ধর্মঘট, সরকারী কর্মচারী ধর্মঘট, শ্রমিক ধর্মঘট, ট্যাক্সি ধর্মঘট, ডাকবিভাগের কর্মীদের ধর্মঘট—যেন শেষ নেই, সমাপ্তি নেই। জমিদারের গোলা লুঠের খবরও কাগজে দেখতে পাই। পুলিস বাধা দিতে এলে তাদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ লাগে। বিস্তর এলাকায় ধান চাল খাদ্যশস্যের দোকান লুঠ হলো। খোদ জামসেদপুরে ছাত্ররা একদিন চালের দোকানে ঢুকে চাল বিলি করে দিলো নিরন্ন মানুষের মধ্যে। তাই নিয়ে বিস্তর গ্রেপ্তার হলো। বাজার বন্ধ-এর খবরও পেলাম। দোকানদারেরা নাকি প্রতিবাদে বেচাকেনা বন্ধ রেখেছে। আর সবের পেছনে নাকি নকশাল। কাগজে তো তাই বলে। রোজই প্রায় একটার পর একটা এই জাতীয় খবর।

পূর্বাঞ্চলের পুলিসের আই. জি তো নকশাল পুনরভ্যুত্থানের ব্যাপারে রীতিমতো একটা বৈঠকই করে বসলো। কাঁকসায় শুনলাম আদিবাসী মানুষ নাকি জমিদারের

জমি কেড়ে নিয়েছে। তার শস্যের গোলা লুঠ করেছে। কলকাতার কাছে পুলিস চৌকী থেকে কটা রাইফেল ছিনতাই হলো। স্টেটস্‌ম্যান লিখলো, সরকার নাকি গোপন সংবাদ পেয়েছে, ধানবাদ কোলিয়ারী এলাকায় নকশাল পন্থীরা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে গেছে। এমনভাবে মিশে গেছে শ্রমিকদের মধ্যে তাদের আর আলাদা করে চেনবার উপায় নেই।

এদিকে বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা। খোদ সরকারী প্রশাসনে ঘটছে নানান বিরুদ্ধ ঘটনা। মে মাসে উত্তর প্রদেশে সশস্ত্র পুলিস্ বাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। সেনা পাঠানো হলো তাদের দমন করার জন্যে। খণ্ডযুদ্ধে মারা গেলো সাঁইত্রিশ জন। অস্ত্র নিয়ে বহু পুলিস বেপাত্তা হলো। মাসের পর মাস যায়, তাদের আর হদিশ মেলে না। উত্তর প্রদেশ সরকারকে এইজন্য পদত্যাগ করতে হলো। বিহারে তো আমার গ্রেপ্তারীর পর এই নিয়ে পাঁচবার সরকার বদলালো। কংগ্রেসে অন্তর্কলহের পরিণতি আর কি। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করলো। গুজরাট আর উত্তর প্রদেশে একই সঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন রুজু হলো। এদিকে মধ্যপ্রদেশ সরকারের নাকি এই যায় কি সেই যায় অবস্থা। পশ্চিমবঙ্গেও প্রায় একই দৃশ্য। কংগ্রেসে নিজেদের মধ্যে কোন্দল। তারই পরিণতি হিসেবে দুমাসে বিশ জনকে প্রাণ হারাতে হলো।

শরতে একেবারে চূড়ান্ত অবস্থা। খাদ্য আর জ্বালানীর জন্য অগণিত দাঙ্গা, ধর্মঘট, ছাত্র বিক্ষোভ, পুলিস জনতা খণ্ডযুদ্ধ, কারখানায় ক্লোজার, শাসক দলে স্বার্থ নিয়ে সংঘাত আর সরকারের পদত্যাগ। কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় প্রতিদিনই এই সবের ভিত্তিতে জনগণের উদ্দেশ্যে বাণী দেন। সঙ্গে নানান ব্যাপারে অঙ্গীকার। বিতর্কের ঝড় বয়ে যায় লোকসভার চার দেয়ালের আড়ালে। তাতে সমস্যার এতোটুকু সুরাহা হয় না, জনগণের এতোটুকু সাশ্রয় হয় না। এরই মধ্যে শ্রীমতী গান্ধী যুগোশ্লাভিয়া আর ক্যানাডা ভ্রমণ করে এলেন। সেখানে গিয়ে সদর্পে প্রচার করলেন 'অহিংসা' আর 'মানবতা' আর 'গণতন্ত্রের' বাণী। বলে এলেন, আর সংশয়ের কারণ নেই। কদিনের মধ্যেই ভারতের অবস্থা স্বাভাবিক হবে। ফিরে এসে শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে এক বাণী দিয়ে বললেন, তারা যেন দেশের এই সংকটে ধর্মঘট না করে, 'করিলে কঠিন শাস্তি পাইতে হইবে।'

সেপ্টেম্বরে চিলিতে সামরিক অভ্যুত্থান হলো। ভারত বললো, গতিক সুবিধের নয়, সাবধান, দেশের সংকটের সুযোগ নিয়ে সি. আই. এ. ভারতেও এ ধরনের ঘটনা ঘটাতে পারে। এদিকে রাষ্ট্রপুঞ্জে সামরিক জুন্টাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে

ভোট প্রস্তাব পাশ হলো এবং জুন্টাকে নির্দেশ দেওয়া হলো রাজবন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে। ভারত এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে ভোটদান থেকে বিরত রইলো।

আমার কুঠুরির দেয়ালের ওধারে একটা আমগাছ, তার নীচে একসারি ঘর। তারই একটি ঘরে থাকে এক রহস্যময় বন্দী। ফিসফিস করে সবাই তার সম্বন্ধে আলোচনা করে, নামও উচ্চারণ করে ফিসফিস করে। রোজ রাত নটার সময় শুনি তার গান। সঙ্গে গলা মেলায় তার ভাই আর ভাইপো। রাতের খাবার আসে বাড়ি থেকে। জেলের খাবার তারা ছোঁয় না। মানুষটা বাকি সারাদিন অফিস ঘরে কাটায়। পান খায় খুব। গাঁজা খায়। সব ওখানে বসেই। আর মাঝে মাঝে একে তাকে হুকুম করে—যা তো, আমার জন্যে এক কাপ চা নিয়ে আয়, বা কোকাকোলা। অবশ্যই জেলের বাইরের দোকান থেকে। দেখলে রীতিমতো গা ছমছম করে। কপালে ইয়া বিরাট এক সিঁদুরের ফোঁটা। নাকি পরম সাত্ত্বিক। তা একটু এক, করে আমি অনেক কিছুই জানলাম। বিস্তর জমির মালিক, শহরে নাকি মস্ত বড় ব্যবসা। সেই সাথে হিন্দু ধর্মের নিষ্ঠাবান সেবক। শহরে একটা মস্ত মন্দির নাকি তৈরী হচ্ছে তার পয়সায়। এতো গেলো চরিত্রের একটা দিক। আরেকটা দিকও আছে। মাফিয়া দলের মতো তারও নাকি এক বিরাট দল, সব গুণ্ডা, সমাজ বিরোধী। খুন জখম ডাকাতি যা খুশি তাই করে বেড়ায়। শুধু প্রভুর আদেশের প্রতীক্ষা। প্রভুটি যে ইদানীং জেলে তার কারণ হলো এই, পালটা দলের সর্দার নাকি শাসিয়েছে, দেখতে পেলেই তাকে খুন করবে। খুনের বদলা খুন। আগে নাকি তারই দলের একজনকে প্রভুটি তার অনুচরদের দিয়ে নিকেশ করিয়েছে। হাকিম সেই ভয়ে তাকে জামিন দেয় না। জেলের কর্মচারীরাও ভয়ে সর্বদা তটস্থ হয়ে থাকে। কে জানে বাপু, পান থেকে চুণ খসলে শেষে যদি তারই জীবন নিয়ে টানাটানি হয়। তাই তো তার ঘরে ভুলেও তালা পড়ে না। অবাধ তার গতিবিধি। এমনও শুনি, রোজ রাত্রে নাকি সে বাইরে থেকে দু চার ঘণ্টার জন্যে ঘুরে আসে। আর মেয়েরা দেখি অনেকেই তাকে চেনে। কেউ হয়তো টাকা ধার নিয়েছে, কেউ বা কিছু নেয় নি, এমনিই অকারণ ভয়। কত অন্যায় করে যে সে আজ এতো বড় লোক, সে গল্পও কেউ কেউ মাঝে মাঝে করে। পরম সাত্ত্বিক তো, তাই অন্যায় অপরাধ অন্যায় নয়, সব ন্যায়। এটা যে শুধু মেয়েরা বিশ্বাস করে তা নয়, খোদ সরকার বাহাদুরও করেন। নইলে একেই দেয় জেলখানার মাল যোগানের ঠিকাদারী! এ সংবাদ আমি বছর দুই পরে পেয়েছিলাম।

আর আমাদের মতো ছাপোষা বন্দীদের ক্ষেত্রে সেই চিরকালীন নিরাপত্তার অভাব। তার আর শেষ নেই, বিরাম নেই। এই ব্যাপারে তিয়াত্তরের ১০ই অক্টোবর আমার ডায়রীতে লিখলাম—

'কাল ওরা এসে আগুন নিভিয়ে দিয়ে গেলো। আগুন জ্বালানো যায় এমন বস্তু আর কয়েদীদের হাতের গোড়ায় রাখতে দেওয়া হবে না। শুধু তাই নয়, আরো নানান 'আপত্তিকর' জিনিস ওরা তল্লাসী করে নিয়ে গেছে। 'আপত্তিকর' অর্থাৎ আমাদের সময় কাটাবার কিছু কিছু সরঞ্জাম। নেই সেগুলো—কিভাবে কি নিয়ে কাটাবো আমরা আমাদের দিন! জেল কি বসবাসের যোগ্য যে এখানে শুধু হাতে কোন কিছু না নিয়ে বাস করা যায়? কদিন চলবে এইরকম, আমি জানি। কড়া নিরাপত্তা। খুব জোর জলুম হবে। তারপর আবার সব চুপ। আবার যে কে সেই। আবার ঢিলে ঢালা ভাব। আগুনে আবার ফুল্‌কি উঠবে। ছড়াবে সেই ফুল্‌কি। চা গরম হবে। ছোলা সেদ্ধ হবে। ঠাণ্ডা চাপাটি ফের গরম হবে। কাঁকর মেশানো ভাত আবার আমরা গরম করে খাবো। সেই সুখ, সেই পুরনো স্বাচ্ছন্দ্য। এমনি ভাবে চলবে আবার বেশ কয়েক মাস।

'কালকের ঘটনাটা নেহাৎই প্রতিশোধমূলক। কিছুটা ভয়ের ব্যাপারও আছে। এটা আমি পরে চিন্তা করে বুঝতে পেরেছি। একমাস যাবৎ আমাদের সাবান দেওয়া হয় না। কত আবেদন জানিয়েছি, কত অনুরোধ—যেন গা-ই করে না, যেন শুনেও শোনে না। কাল তাই প্রতিবাদে মেয়েরা একজোট হয়ে অনশন করেছিলো। একজোট হতে দেখলেই তো ওরা ভয় পায়, আতঙ্কে কি করবে ভেবে পায় না,—এসেছিলো তাই প্রতিশোধ নিতে। উনুন ভেঙে দিয়ে গেছে, শুকনো ডালপালা যা দু-চার টুকরো জড় করা ছিলো নিয়ে গেছে। এমনকি উনুন জ্বালবার জন্যে জোগাড় করা শুকনো পাতাকটা অব্দি। ভারী আশা মনে, এতে মেয়েরা পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করবে, 'সুযোগ' নষ্ট হয়ে গেলো সেই জন্যে। আমি অন্ততঃ একটা কাজ পেরেছি। ওদেরকে বলেছি, যেন প্ররোচনায় পা না দেয়, যেন চুপচাপ এককাট্টা হয়ে থাকে। থেকেছে তাই। এবং এখন মোটামুটি নিশ্চিত আমরা, অবিলম্বে সাবান পাবো। পাবোই। ওরা দেবে। তবে এখানেই শেষ নয়। এরকম অত্যাচার আবারও আসবে। আমাদেরও মতলব বের করতে হবে। সবাই মিলে। এলে এবার আর ছাড়বো না। আমরাও যাহোক একটা বদলা নেবো।'

তবে এতো অত্যাচার, এতো লণ্ডভণ্ড—তারই মধ্যে বড় মন উথাল-পাথাল হয়

শরতের আকাশ দেখে। সে যে কী অপূর্ব শোভা! ভারী ইচ্ছে করে ছবি আঁকতে, লিখতে, সেলাইয়ের কাজ করতে। করিও। দেখতে দেখতে দিনগুলো কেটে যায়। টেরও পাই না। ফুরফুরে মিষ্টি বাতাস, ছোট দিন, সূর্য ওঠে দেরী করে, আবার অস্ত যায় তাড়াতাড়ি। আড়াইটে বাজতে না বাজতে চারদিকে ছায়া, পেঁপে গাছের ছায়া পড়ে আড় হয়ে, দেয়ালের ছায়া পড়ে কোণাকুণি, আমগাছের ছায়া দেখে মনে হয় যেন পাখির একগুচ্ছ পালক, আর পড়ে লোহার গরাদের ছায়া, সব সমান্তরাল। দেখতে বিশ্রী লাগে।

মোটের ওপর জামসেদপুরে জীবনযাপনে একটু একটু করে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি। সেই প্রথম দিকের ভাবটা আর নেই। এদিকে শুনানীও শেষ। সাত-মাসে খুব বেশি হলে বারো বার হাকিমের সামনে আমাকে দাঁড়াতে হয়েছে। কোন সাক্ষীই আমাকে চিনতে পারে নি। আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগও কেউ পেশ করে নি। তবু সবাই আমরা অভিযুক্ত। পুলিসের দেওয়া একটা অভিযোগও খণ্ডন হয় নি। এইভাবে চললে দায়রার আদালতে সোপর্দ হতে লাগবে আরো চার কি পাঁচ বছর। উকিল আমাকে বললো, আপনি হাই কমিশনকে চিঠি লিখুন। ওরা তোড়জোড় করলে ভারত সরকারের কাছে আর্জি করলে মামলা মিটতে দেরী হবে না। লিখে তো জানি কোন লাভ নেই, তবু বললো লিখতে, তাই তিনখানা চিঠি লিখলাম। একটা হাই কমিশন দপ্তরে, একটা বাড়িতে বাবার কাছে, আর একটা বন্ধুর কাছে। যাতে সবাই মিলে মামলা নিষ্পত্তি করার ব্যাপারে ভারত সরকারকে চাপ দেয়।

এরই কদিন পরে বিচারের পরবর্তী পর্যায়ের জন্য আমাদের ফের হাজারিবাগ জেলে ফেরত পাঠানো হলো।

হাজারিবাগে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত। ডরমিটরির পাশ দিয়ে চলেছি নিজের ঘরের দিকে, দেখি সার সার দাঁড়িয়ে আছে সবাই গরাদ ধরে। কেউ বললো,—সেলাম আলেকম দিদি, কেউ বললো—নমস্তে। বাঙ্কো হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলো। সে কী অভিনন্দন আর শুভেচ্ছা! সবাইকে প্রতি-শুভেচ্ছা জানিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে দেখি সেই তিনখানা কম্বল, প্রথম দিন এসে যেরকম ভাঁজ করা দেখেছিলাম, সেই একই ভাবে একধারে জড় করা। ততক্ষণে ছুটতে ছুটতে জমাদারনী এসে হাজির। হাতে কাগজে জড়ানো গরমাগরম চাপাটি। একটু পরে চা। এটা বাঙ্কো পাঠিয়ে দিয়েছে। আগে থেকেই জানতো তো আমি আসবো। তাই কখানা ঘুঁটে সরিয়ে রেখেছিল কম্বলের নীচে। তারই আগুনে চটপট অমনি চা গরম করে দিলো। আহারে ভালবাসা! জানে, আসবো আমি অনেক দূর থেকে, ক্ষুধার্ত ক্লান্ত, খাওয়ায় আমার কষ্ট হবে, তাই আগে থেকে সব ঠিকঠাক করে রেখেছে।

পরদিন সকালে সবার সঙ্গেই দেখা হলো। কজন নতুন বন্দী এসেছে। তাঁদের সঙ্গেও আলাপ হলো। ইতিমধ্যে তিন দফা প্রাতরাশ খেলাম। আমার পাওনা রেশন তখনও এসে পৌঁছয়নি, ওরাই নিজেদের ভাগ থেকে আমাকে দিলো। যেন নিজের বাড়ি আমার। গিয়েছিলাম কদিনের জন্য বাইরে, ফিরে এসেছি, সবাই খুব আদর যত্ন করছে। বড় ভালো লাগছে সব কিছু। পাশাপাশি বীণার জন্যে মন খারাপও লাগছে। তবু কি করবো, উপায় তো নেই। হাজারিবাগের বিস্তর অসুবিধে, জানি। সরিয়ে আনলো জামসেদপুর থেকে, তার মানে নতুন করে বিচার কবে আরম্ভ হবে তার কোন ঠিক নেই। তাছাড়া এখানে কলকাতা থেকে আত্মীয় স্বজনের দেখা করতে আসাও কষ্টকর। সহবন্দীদের সাক্ষাতও আর বহুদিনের মধ্যে ভাগ্যে জুটবে না। তবু ঐ যে একটা মস্তবড় সুখ—এ যেন আমার নিজের বাড়ি। সেই সবাই মিলে আবার হৈ চৈ, সেই একসাথে গল্পগুজব আনন্দ। কর্তৃপক্ষ যত অন্যায় অবিচারই করুক, যতই আমাকে অসুবিধেয় ফেলবার চেষ্টা করুক—এখানে কোন সুবিধে করতে পারবে না। সব লাঘব করে দেবে আমার বন্ধুরা।

কয়েকজন ছাড়া পেয়ে চলে গেছে। বদলে নতুন কজন এসেছে। তবে সে

সামান্তই। সাত মাসের মধ্যে এমন একটা অদলবদল কিছু হয় নি। চার বছর জেল খাটবার পর রাজকুমারীর মামলা আদালতে উঠেছিল, সে নির্দোষ সাব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু চোলাই মদ তৈরী করার অভিযোগে ফের ছ মাসের মেয়াদ খাটতে হচ্ছে। এটা নতুন অভিযোগ। তার মানে সব মিলিয়ে মোট সাড়ে চার বছর।

এদিকে শীতের ফসল কদিনের মধ্যেই ফলবে, গাছে ফুল ধরেছে। আর কী নির্মল আকাশ! আবার আমি আগের মতো সূর্যোদয় সূর্যাস্ত দেখতে পাচ্ছি। গরাদের ওপর এক ধাপ বেয়ে উঠলে চোখে পড়ে ধু ধু মাঠ, গাছপালা, গ্রাম, একটা রাস্তা চলে গেছে সোজা ঐ কত দূ-র। কদিন থেকে ফের ছবি আঁকতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে। আইরিসের দেওয়া সেই জলরং—সে তো বলতে গেলে ধরাই পড়ে আছে। নিয়ে বসলামও সব কিছু। তবু কই, ঠিক ঠিক ফোটাতে যে পারি না। সকালের সেই রোদ—তার রং, কিংবা পুরুষ মহলের বেলে রঙের দেয়ালের ওপর প্রথম সূর্যের সেই মোলায়েম আলো, অথবা গাছগুলো এই যে এখন কালচে সবুজ দেখায় তার সঠিক রং, বা ইটের মতো লাল মাটির সেই আগুন করা বাহার। সব যেন কেমন অন্যরকম হয়ে যায়। জামসেদপুরে কিন্তু এতো বৈচিত্র্য নজরে পড়ে না। সেখানে আকাশ জুড়ে সর্বদা লোহার কারখানার লাল আভা। আর এখানে মস্ত বিশাল এই আকাশ, ভারী নীল নির্মেঘ তার রং, আকাশের পটভূমিকায় সব কিছু অনেক স্পষ্ট অনেক জীবন্ত; এমনকি দেয়ালের গায়ে ঐ নজরদারীর টঙ, তাও দেখতে লাগে এতো চমৎকার, যেন তুলিতে আঁকা একটা ছবির মতো, যেন হাত বাড়ালেই ছবিটা ছুঁয়ে দেওয়া যায়। আর যে কত রঙ, চারপাশে! নীল, লাল বেগুনী বাদামী সোনালী—যেন রঙের এক মেলা। এরই মাঝে বিকেলে সূর্য অস্ত যায়। তখন আবার এক দফা রঙ বদলের খেলা। ভারী ইচ্ছে করে ওর দু একটা রঙ ধরে রাখি আমার তুলিতে, আমার ক্যানভাসে। করি চেষ্টা, কিন্তু পারি না।

আসলে জানি না কেন, কদিন থেকে অদ্ভুত এক সৌন্দর্যের নেশা আমাকে পেয়ে বসেছে। যা কিছু সুন্দর দেখতে বড় ভালো লাগে। একটা মেরিগোল্ড ফুলগাছ আছে আমার ঠিক ঘরের সামনে, সুপারের হাজার অত্যাচারেও তাকে দমন করা যায় নি—তাতে ফুল ফোটে। আমি অবাক হয়ে ফুলের দিকে তাকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকি। ছবি আঁকি তার। নানান দৃষ্টিকোণ থেকে, নানানভাবে। ওর পাঁপড়ির রঙ আমি ধরে রাখতে চাই। ঘরের দেয়াল তো বলতে গেলে এই ফুলের ছবিতে প্রায় ভরে গেল। লিখেছিলাম সেই কথা আমার এক বান্ধবীকে। সে অমনি কটা ছবির বই ডাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলো।

তা নয় দিলো, কত কিই তো তারা করছে, শুধু একটা ব্যবস্থা করতে পারে নি। তা হলো গান শোনাবার কোন ব্যবস্থা। গান যে আমি বড় ভালবাসি। পুরুষ মহলে শুনি প্রায় প্রতিদিনই বিকেলে এক বন্দী বাঁশিতে তান ধরে। আমি কান পেতে শুনি। ও নির্ঘাৎ টেরটিও পায় না। জানি না, আমি যে ওর অতি অনুরাগী শ্রোতা ব্যাপারটা জানতে পারলে ও কি করতো।

জামসেদপুরে থাকতে সব সময় মনে বিরাজ করতো একটা উৎকণ্ঠা। ছোট তো চৌহদ্দি। গায়ে গায়ে ঘর। বলতে গেলে গায়ে গায়েই পুরুষ মহল। সব আসতো কানে। বেড়ি ঘষটে চলার আওয়াজ, চিৎকার, ঘুঁষি মারার শব্দ— সব। শুনতাম আর উৎকণ্ঠা বাড়তো। এখানে তার উপায় নেই। পাশে যদিও পুরুষ মহল, ঘরগুলো দূরে দূরে। কি হচ্ছে সেখানে বিরাট আওয়াজ না হলে শোনা যায় না। তাই উৎকণ্ঠাও কম। তা বলে একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো না। শোনা না গেলেও এখানে জামসেদপুরের প্রতিটি ঘটনাই ঘটে। এবং নিয়মিত। যে কোন মুহূর্তে চূড়ান্ত কিছুও ঘটতে পারে। মোটামুটি সেই ভাবেই মনকে তৈরী করে রাখলাম।

তা আমাকে ফিরে আসতে দেখে ভারী খুশী হয়েছিল মোতি। সাঁওতাল উপজাতির মেয়ে। মাথাটা একটু খারাপ। মোতিকে প্রথম আমি কদিনের জন্য জামসেদপুরে দেখতে পাই। এমনিতে ভারী ভদ্র, ভারী বিনয়ী, বুঝিয়ে বললে বোঝে আর ভীষণ পরিশ্রমী। কিন্তু ঐ এক দোষ—একটু রাগ হলো তো গেলো সব গোলমাল হয়ে। সে কী রাগ, আর যেন পড়তে চায় না! আমাকে ডাকতো বেটি বলে। সেই সুবাদে যেই রাগতো অমনি জমাদারণী আমাকে ডেকে বলতো ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করতে। হয় কি শান্ত। মাথাটাই যে গোলমাল। কি করবে কি বলবে আগে থেকে কি কেউ বুঝতে পারে। গোটা দিন হয়তো শান্ত হয়ে কাটালো, চুপচাপ ঘুরে ঘুরে কত কি করলো, গল্প করলো শান্তভাবে। সন্ধ্যে হতে যেই না তাকে আলাদা ঘরে তালা আটকে দিয়েছে, আর যায় কোথায়, অমনি রাগ! রাগের বশেই মনে পড়ে গেলো দিনের বেলা কে কি বলেছে, কে গাল দিয়েছে সেই সব কথা। শুরু হলো গালাগালি। সে যা মুখ খারাপের চোট! রাগে দপদপায় আর লোহার গরাদটা ঝং ঝং করে নাড়ে। গাছ কোমর বেঁধে নিয়েছে এরই মধ্যে। বলে, ভাবিস্ কি তোরা আমাকে? আমি কি ছাগল? আমিও মানুষ। হ্যাঁ, মানুষ। কোন্ সাহসে আমাকে তাহলে তালা বন্ধ করে রাখিস্? আমি বাড়ি যাবো। এক্ষুনি আমার তালা খুলে দিয়ে যা। আয়, আয়, আয় বলছি!

একদিন ভোর সকাল থেকে চিল চিৎকার। তখন সবে তিনটে বাজে। তো চিৎকার শুনে বুঝলাম বলতে চাইছে, ওর নাকি পেট খারাপ হয়েছে, গামলা টই-টম্বুর; তারই গন্ধে তিষ্ঠোতে পারছে না। ছটা নাগাদ বড় জমাদার এলো তালা খুলতে। সেটাই নিয়ম। ওর কি আর তর সয়! গামলা নিয়ে নিজেই গরাদ খোলার সঙ্গে সঙ্গে পড়ি কি মরি করে ছুট। খেলো হোঁচট। গামলার সব গু পড়লো ছিটকে—একেবারে জমাদারের গায়। আমরা তো মুখ লুকিয়ে কাণ্ড দেখে হাসছি। জমাদারণীও। আর জমাদার? সে খানিকটা স্তম্ভিত। হতভম্ব। অবাক। এবং বিরক্ত। ভারী দুর্গন্ধ যে! কিছু না বলে হনহনিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল পরিষ্কার হতে।

তা পেট খারাপের আর দোষ কি, খাওয়ার কি বাছবিচার আছে? খুব খায় মোতি। রাক্ষুসে ক্ষিধে। এই খায়, এই বলে ক্ষিধে পেয়েছে, কি খাবো? এদিকে তখন তো রীতিমতো খাদ্য সংকট। বাইরে ভেতরে সর্বত্র। রেশন দিয়েছে কমিয়ে। আটা পাওয়া যায় না মাসের পর মাস। দেয় শুধু চাল। সে-ও কয়েক মুঠো মাত্র। আটা বরং হজম হতে একটু সময় লাগে। ভাত তো খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হজম। তার ওপর শীতের অত বড় রাত। অন্য বন্দীদের তো রাক্ষুসে ক্ষিধে নেই, তারা ওরই থেকে দু এক মুঠো সরিয়ে রাখে বিক্রী করবে বলে। মোতির তাতে ভীষণ রাগ। টাকা সেও জমাতে চায়, কিন্তু তাই বলে চাল ক্ষিধের জিনিস। আগে পেট, পরে তো জমানো! জেলে সাধারণ নিয়মে এ হিসেব অচল। আর হজম শক্তিও দুর্দান্ত বটে মোতির। কিছুতেই পেট আর ভরে না। ভোর সকালে উঠে বাগান খুঁজে খুঁজে নিয়ে আসে পাতা।—লঙ্কা পাতা, টমেটো পাতা, মটর পাতা, পেঁয়াজ পাতা, রসুন পাতা,—মোটমাট হিসেব থেকে কিছু বাদ যায় না। সব এনে চড়িয়ে দেয় উনুনে। জলে সেদ্ধ হয়। একটু নুন বা দুটো লংকা মেশায়। গোগ্রাসে দেখি ক্ষিধে পেলে বসে বসে তাই খায়। যখন খায়, দম নেবার ফুরসতটুকু যেন নেই। মুখে ফেলছে আর গিলছে, এতো ওর ক্ষিধে। আর মন ভালো থাকলে তো কথাই নেই। আমাদের মাঝে মাঝে সাধে একটু চেখে দেখতে। আমরা কায়দা করে এড়িয়ে যাই। মোটমাট এই বিচিত্র খাদ্যের স্বাদ ওর একান্ত নিজস্ব হয়েই থাকুক, আমরা তাতে ভাগ বসাতে আদৌ আগ্রহী নই।

নতুন যারা এসেছে, তাদের মধ্যে একজন বোবা আর কালা। বয়েস অনুমান ষোলো। কেউ তার সম্বন্ধে কিছু জানে না। না নাম, না অন্য কোন পরিচয়।

কেন এখানে এলো, তাও অজ্ঞাত। পুলিশ নাকি এখান থেকে ত্রিশ মাইল দূরে শহরে ঘোরাঘুরি করতে দেখে ধরে হাজতে চালান করে দেয়। ৭৫ সালে যখন জেল থেকে আমি চলে আসি, তখনও দেখি সেখানে সে রয়েছে। কথা বলতে পারে না, কানে একদম শোনে না। কাউকে বোঝাতে পারে না নিজের কোন কথা। সে এক যন্ত্রণা আর কি। যন্ত্রণার ছাপ দেখি মাঝে মাঝে ওর চোখে মুখেও ফুটে ওঠে। মনে হয় একটু যেন অপ্রকৃতিস্থ। মাঝে মাঝে অদ্ভুত আচরণ করে। দু তিন দিনের রেশন জড় করে তাই দিয়ে রাঁধলো ভাত, হয়তো পুরো সেদ্ধ হলো না, বসে গেলো খেতে। সব খেলো। চেটেপুটে শেষ দানাটি অব্দি। তারপর ঘুম। সে ঘুম আর সহসা ভাঙবার নয়। কখনো কখনো একটানা তিন চার দিনও ঘুমোতে দেখেছি। জানিনা ঠিক কিনা, তবে, হয়তো চিকিৎসা করলে মোতি বা এই মেয়েটি—দুজনের রোগই সেরে যায়। এরা দুজনেই মানসিক রোগী। কিন্তু জেলখানায় কি আর এ রোগের চিকিৎসা আছে। আছে দু একটা মাত্র ওষুধ, ভীষণ বেড়ে গেলে বা উৎপাত শুরু করলে ডাক্তার এসে ইঞ্জেকশন দিয়ে চলে যায়। তাতে ঘুমিয়ে থাকে রুগী, সাময়িক কদিন সুস্থ থাকে। কিন্তু এই কি সব! চাই সেবা, চাই উপযুক্ত চিকিৎসা। দুটোকে পাশাপাশি মেলাতে হবে। জমাদার কি পারে সেই সেবা করতে, এ ধরনের রুগীর সঙ্গে উপযুক্ত ব্যবহার করতে? পারবে কি করে, এর জন্যে যে আলাদা তালিম যে আলাদা শিক্ষা সে সব তো তার নেই। আর কর্তৃপক্ষ? সে তো যাবতীয় ব্যাপারেই উদাসীন। শুধু একটা ব্যাপারে তীক্ষ্ণ নজর রাখে। জেল পরিদর্শনে কোন মান্যগণ্য অতিথি এলে এ ধরনের রুগীকে আলাদা ঘরে তালা বন্ধ করে লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে রেখে দেয়। ঐটুকু সময়ের জন্য শুধু ভাবনা। গেলেন তিনি চলে, ব্যস যে কে সেই। আমি দেখেছি, জেলখানার পরিবেশে প্রতিটি মানসিক রোগী আগের চেয়ে আরো বেশি রোগগ্রস্ত হয়। সারে তো না-ই, বরং বাড়তে থাকে। ডাক্তার মাঝে মাঝে কর্তৃপক্ষকে বলে, এদের মানসিক হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন। কে শোনে কার কথা! সেখানেই বা এতো জায়গা কোথায়! ডাক্তারের মুখেই শুনেছিলাম, হাজারিবাগে শুধু পুরুষ বিভাগে নাকি আশি জনের মতো উন্মাদ বন্দী আছে।

মানসিক রোগীদের ক্ষেত্রে সরকারী ভাষ্য অনুযায়ী জেলখানা যেমন 'নিশ্চিন্ত: নিরাপদ আশ্রয়', তেমনি ভবঘুরে বা পরিত্যক্তদের জন্যও। তিয়াত্তরের ডিসেম্বরের শেষভাগে দেখলাম এমন একটি বালিকা এসে হাজির। এগারো বছর বয়েস।

ছেঁড়া একখানা শাড়ী পরা। 'তাকে পুলিস ধরে এনে 'নিরাপদ আশ্রয়ে' চালান করে দিয়েছে। জিজ্ঞেস করে জানলাম, বাপ মা আসামের চা বাগিচার শ্রমিক। এখানে আসার কদিন আগে বাবা সামান্য সঞ্চয়ের কিছু টাকা নিয়ে যাচ্ছিল বিহারের গ্রামে অসুস্থ মাকে দেখতে। সঙ্গে সত্য। তো স্টেশনে বসে আছে, ট্রেন আসতে তখনও দেরী, এমন সময় কজন লোক এসে বাবাকে ডেকে নিয়ে গেলো। সেই শেষ। বাবাকে আর দেখেনি সত্য। কদিন পর সেই স্টেশন থেকে পুলিস তাকে গ্রেপ্তার করে জেলখানায় জমা করে দেয়। ব্যস্, পুলিসের দায়িত্ব শেষ। একটু যে খোঁজ খবর করবে, কোথায় তার বাড়ি, কোথায় থাকে তার মা ভারী বয়ে গেছে! কার অতো দায় পড়েছে যে এতো খাটাখাটুনি করে! অথচ এদিক নেই ওদিক আছে। এক খ্রীষ্টান জমাদারণী বললো, সে সত্যের দায়িত্ব নিতে রাজী। নিজের মেয়ের মতো তাকে মানুষ করবে। তাতে ছোট জেলার আর কোর্টের পেশকারদের ঘোর আপত্তি। জাত যাবে যে! খ্রীষ্টানরা গরু খায়। সত্য খ্রীষ্টানের কাছে থাকলে তাকেও গরু খেতে হবে। এমনভাবে জেনে শুনে জাত খোয়ানো যে পাপ। ফলে জেলেই পড়ে রইলো সত্য।

আর শীত ক্রমশঃ বাড়ছে। সে যা ঠাণ্ডা! কদিন ধরে কি যে ভূত চেপেছে মাথায়,—উদ্ভট উদ্ভট চিন্তা শুধু ভিড় করে বেড়ায়। আহ, যদি একটু গরম জল পেতাম স্নান করবার জন্যে, যদি নরম একটা বিছানা পেতাম! স্বপ্নই সে সব। ক্ষণিকের বিভ্রম। নিজের সুখ নিয়ে মশগুল থাকার কি অবস্থা আছে! রোজই শুনি কেউ না কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ঠাণ্ডা লেগে অসুখ। মোটের ওপর, কারুরই শরীর ভালো নয়। তাদের কথা ভাববো না কি আমার নিজের কথা ভাববো? কিড্‌নি আর লিভারের গোলমালও কারুর কারুর দেখা দিচ্ছে। আর গায়ে পিঠে ভীষণ বেদনা। ঠাণ্ডা মেঝেতে শোবার ফল আর কি। আর সবার ওপরে আছে রক্তশূন্যতা জনিত রোগ। কৃমির দাপটও কম নয়। মাঝে মাঝে পেটের নাড়িভুড়ি পাক দিয়ে বমি উঠে আসে। সে আর সহসা থামানো যায় না। আর ফোঁড়া খোস পাঁচড়া এ-তো নৈমিত্তিক ঘটনা। ভিটামিনের অভাব আর বদহজম এর মূলে। মেয়েদের কাছে সুস্থ থাকাটাই যেন আশ্চর্যের। শরীর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, কেয়া করেগা? এ তো সারবার নয়। এইভাবেই চলবে। এটাকে ওরা ভাগ্য বলেই মেনে নিয়েছে। বাড়িতে থাকতেও তো এই রকমই প্রায় চলতো। প্রোটিনের অভাব সেখানেও নৈমিত্তিক। মাছ মাংস ছানা দুধ এসব আবার মেয়েরা খাবে কি, এ তো পুরুষদের খাদ্য! তাই

এমন নয় যে ভগ্নস্বাস্থ্যের ব্যাপারটা জেলখানায় নতুন।

আর এদের তুলনায় আমি? আমি তো দৈত্য। পাঁচ ফুট দু ইঞ্চি লম্বা, স্বাস্থ্য ইদানীং একটু ভেঙেছে, ওজন কমে এখন আমি প্রায় আট স্টোন। পাঁচ বছর জেলে ছিলাম, আমার চেয়ে লম্বা মেয়ে আমি দুটি কি তিনটি মাত্র দেখেছি। আর ওজন! কেউ কেউ তো সর্বসাকুল্যে মাত্র পাঁচ স্টোন। তবু কী অসম্ভব পরিশ্রমী। বলতে গেলে সারাদিন দেখতাম খাটতে, হয় মাথায় করে মাটির ঝুড়ি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, অনেক ওজন, নয় তো দু হাতে দু বাল্‌তি জল নিয়ে অক্লেশে হেঁটে যাচ্ছে। তবু কই, কাহিল হতে তো দেখিনা।

শরীর খারাপ কাকে বলে বোঝে, অসুখ কাকে বলে সে জ্ঞান আছে, তবু অবাক কাণ্ড, কেউ জেলখানায় আসার আগে কোনদিন ডাক্তার দেখেনি। আর ডাক্তারও তেমনি। তার ধান্দা কেবল কিভাবে দু পয়সা গুছিয়ে নেবে। এ তো আর ডাক্তারী নয়, চাকরী। জেলখানায় চাকরীর অন্যতম শর্তই হলো কিছু কামিয়ে নেওয়া। সে-ই বা বাদ যাবে কেন। দু একজন ডাক্তারকে দেখতাম নিস্পৃহ। হাজার দুঃখ কষ্ট অসুখ বিসুখ, কিছুতেই তাদের মন আর টলানো যায় না। দু একজন এরই মধ্যে একটু আলাদা। রোগী কিছু বললে শুনবার আগেই খসখস করে কাগজে নিদান লিখে দিতো। হয় তা কৃমির ওষুধ, নয় বেদনা সারার বড়ি। একদিক থেকে দেখতে গেলে দুটো ধারাই সমান। রোগীর অসুখ কোন কিছুতেই সারে না। আর মাঝে মাঝে আমার মনে হতো, জেলখানা হয়তো নতুন বেরুনো ওষুধ পরীক্ষার একটা আদর্শ জায়গা। কখনো দেখিনি একই ওষুধ দুবার দিতে। লক্ষণ কিন্তু দুবারেই এক। নিত্যি নব নব বড়ি দেখতাম। কে জানে বাপু, কোম্পানি কি নতুন ওষুধ তৈরী করার সঙ্গে সঙ্গে এখানেই আগে পাঠিয়ে দেয়! এদিকে খাবারের অবস্থা দিনকে দিন খারাপ হচ্ছে। বাইরেও খোলা বাজারে সব খাবার পাওয়া যায় না। উধাও হয়েছে নানান সামগ্রী। পেছনের দরজা দিয়ে কালো বাজারে কিন্তু চড়া দামে সবই মেলে। তা বাইরে যখন অবস্থা এই, জেলের ভেতরে যে আরো খারাপ হবে, এটাই স্বাভাবিক। হচ্ছেও তাই। মাঝখানে কদিন তো ভেজা ছোলা অব্দি উধাও। তার বদলে খানিকটা গলা ভাত, সঙ্গে একটু গুড়। ভাতও আবার চালের নয়, খুদের। তার মধ্যে না আছে হেন বস্তু নেই। কুড়ো, বালি, কাঁকর, খড় সব মিশিয়ে সেই বিচিত্র প্রাতরাশ। দুপুরে রেশনে যে চাল দেয়, তাতে ছাতা ধরা, বহুদিনের পুরনো একটা গন্ধ, মনে হয় অনেক দিন কোথাও লুকোনো ছিল, বের করে এনে

আমাদের দিয়েছে। সব্জি বলতে কানা পোকা বেগুন, সঙ্গে ফুলকপির পাতা আর ডাঁটা। তাও যখন দেয়, শত সাবধানে, যেন মাপের বেশি এক ফোঁটাও না পাতে পড়ে। ডাল দেয় দু বার করে। মুসুরীর ডাল। পোকায় ধরা, মনে হয় বহুদিনের পুরনো আর তিতকুটে স্বাদ। একদিন দেখি সকালে ফের ছোলা দিল। সে নামেই ছোলা। আসলে খোসা একরাশ। ভেতরের মূল রসদটুকু আমাদের আগেই পোকা সাবাড় করে দিয়েছে। আলু দিতো, তারও আকৃতি ছোলার চেয়ে সামান্য বড়, আর কালো কালো রঙের, দেখে মনে হতো খেলে নির্ঘাৎ অসুখ করবে। ফলে অসন্তোষ উত্তরোত্তর বাড়ছে। সবাই তো একই দুর্দশার শরিক। তাই দেখি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ঝাঁটি এখন আর তেমন হয় না। মেটিনীও গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে। কি লাভ আর কর্তৃপক্ষের হয়ে অহেতুক হম্বিতম্বি চালিয়ে। আসল লাভের ঘরে তো সব শূন্য। উপরি রোজগার আর বলতে গেলে এক পয়সাও হয় না। কেন তবে মিথ্যে বাড়াবাড়ি।

তবে মেটিনীর হয় না বলে যে আর কারো নাফা হয় না, এটা ভাবলে ভুল হবে। একদল এরই মধ্যে নিত্য তিরিশ দিন এই সংকটকে মূলধন করে মুনাফা লুটছে। এদের দলে পড়ে ভাঁড়ারের দায়িত্বে আছে যে সব মেট তারা আর অফিস ঘরের কেরানী বাবুরা। এরা একদম প্রাথমিক স্তরে। এদের শিরোমণি বড় জমাদার। তারই সব দিক থেকে পোয়াবারো। যাবতীয় ঘুষের সিংহভাগ তার। শুনি নাকি এই সব দু নম্বরী পথে তার আয় মাসে ছ থেকে সাত হাজার। কয়েকটা ট্যাক্সির নাকি মালিক, ত্রিশ একরের মতো জমিও আছে। এদিকে সরকারী মাইনে সাকুল্যে মাত্র তিনশো। হয় তাতে এতো বড় একটা পরিবারের খরচ জুগিয়ে এই সব অতিরিক্ত সম্পদ? তারই অসীম আনুকূল্যে মেটেরা লাভ-জনক ব্যাবসা ফেঁদে বসেছে। খাবার যা আসে আমাদের জন্যে সব বেচে দেয়। বলা বাহুল্য অনেক বেশি দামে। কাপড় চোপড়ও বিক্রী করে। এমনকি মশলা পাতিও। লাভের একটা বড় অংশ বড় জমাদারের পকেটস্থ হয়। এই বাড়তি পাওনাকে সবাই সংক্ষেপে বলে 'ইনকাম'। একেবারে হুবহু ইংরিজী শব্দটাই ব্যবহার করে। যে পড়তে লিখতে একদম জানে না সে-ও। মেটেরা আছে মস্ত সুখে। কোন তো চিন্তা নেই। খোদ বড় জমাদার তাদের হাতের পাঁচ। প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আলাদা ঘর। একা থাকে না, একটু সুন্দর দেখতে ছোকরা বন্দীদের সঙ্গে রাখে। এদের ওপর নাকি ওদের বড় টান। ছোঁড়াগুলোও পাজির পা ঝাড়া। ভালো মন্দ খাবার পায়, ভালো পোশাকটি পায়, জেলখানার ধোপাই দেয়

কেচে কুচে ইস্ত্রি করে, আর দপদপিয়ে বেড়ায় এ মাথা থেকে ও মাথা। যত রকম কুকাজ সব এরাই প্রথম শুরু করে। মেটেরা তো শুনি বাড়িতে প্রত্যেক মাসে মানি অর্ডার করে টাকা পাঠায়। একজনের তো শুনলাম ঘুষের টাকায় বাড়ি তৈরী হচ্ছে। এরাই হলো জেলের বকলমে কর্তা। বন্দীরা কেউ এদের দেখতে পারে না।

আর আমি দেখতে পারতাম না ডাক্তারখানা আর ডাক্তারের নির্দেশমতো খাবার বিলি করে যে দুই মেট তাদের। যেন দুচোখের বিষ। কেউ হয়তো ভর্তি হলো হাসপাতালে—এরা তাকে ওষুধটুকু অব্দি ঠিক সময় মতো দেবে না। একটু কি বিবেকবোধও নেই? দিন দিন তো দেখি গায়ে গতরে বেশ বাড়ছে। হাসপাতালের ওষুধ আর খাবার বাইরে বিক্রী করে পয়সার পর পয়সা জমাচ্ছে। তা বলে এমন নিষ্ঠুর এমন নির্দয় ভাবে! অসুস্থ রুগীটাকে খাবার অব্দি নিদান মতো দেয় না। বড় জমাদারের আস্কারা আছে, সহজেই বোঝা যায়। জেলের কর্তাব্যক্তিরা দেখে সব, বোঝেও, কিন্তু কিছু বলে না। বলবে কেন, তাদেরও তো ঘুষে ভাগ আছে। ভাগ আছে যাবতীয় বাড়তি লাভে। জেলার প্রতিমাসে মেটেদের কাছ থেকে নিজের প্রাপ্যটুকু পায়। সব চেয়ে ভালো জিনিসটি পৌঁছবামাত্র নিয়ে যায় তার বেশ খানিকটা অংশ নিজের বাড়িতে। বাইরে থেকে যে সব পরিদর্শক আসে জেল দেখতে, মান্যগন্য আঞ্চলিক বা বাইরের ব্যক্তিবর্গ—যাবার সময় কত কী উপঢৌকন দেয় তাদের দু হাত ভরে। কোত্থেকে দেয়? জেলের খরচ তো সব হিসেব করা। হিসেবের মধ্যে দেখায় কি এই সব উপঢৌকন বাবদ খরচ? সুপারও তথৈবচ। শুনি নাকি দু হাতে পয়সা ওড়ায়। কোত্থেকে আসে এতো পয়সা? এই তো কদিন আগে গেলো তার মেয়ের বিয়ে। কদিন টানা বন্দীদের খাটিয়ে অতিথিরা আসবে বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে, তাদের বসবার জন্য চেয়ারের ছোট ছোট গদি বানিয়ে নিয়ে গেল। বন্দীরা তো এই সব মহামান্য ব্যক্তিবর্গের চাকর। সেই ভাবেই এরা দেখে। চৌহদ্দির মধ্যেই তো ছোট বড় মেজো সব অফিসারের ঘর। কাজ সব ভাগ করা আছে। কোন্ বন্দী কার বাড়িতে গিয়ে জল তুলবে, বাসন মাজবে, কাপড় কাচবে, নর্দমা পরিষ্কার করবে—সব আগে থেকে হিসেব করে ঠিক করা। এমন কি শুনি কেউ কেউ গা হাত পা মালিশ করেও দেয়।

সুপারের প্রসঙ্গে আসি। দুর্নীতির ব্যাপারে সেও কিছু কম যায় না। একদিন তো আমাকে বলেই ফেললো, এই যে মাঝে মাঝে আসে সবাই জেল দেখতে—এই সব মন্ত্রী আর বড় বড় অফিসারের দল—আমার একদম ভালো লাগে না।

বললাম, কেন? —আর বলবেন না. এসে সবাই টাকা চায়। যদি না দিই, আমাকে অমনি বদলী করে দেবে। সে হয় তো এমন একটা জায়গা যেখানে গিয়ে আমি তিষ্ঠোতে পারবো না, বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারবো না, মিশতে পারবো না কারুর সঙ্গে। এই সব ঝকমারি। মোটমাট এখানে থাকতে হলে আমাকে টাকা দিতেই হবে।

কথাটা অবিশ্যি মিথ্যে নয়। বদলী টদলীর ব্যাপারে টাকার খেলা আছে। টাকা দিলে সবাই যে যার পছন্দ মতো এলাকায় বদলী হতে পারে। বেশির ভাগেরই পছন্দ শিল্প এলাকা। যেমন জামসেদপুর, যেমন ধানবাদ। শিল্পাঞ্চলের বন্দী তো আর হাজারিবাগের বন্দীর মতো অভাবী নয়। তাদের পয়সা আছে। সুতরাং ঘুষ টুষ ভালোই হবে। বন্দীর আত্মীয় স্বজন আসবে ঘন ঘন দেখা করতে। তাদেরও ভালো দোয়ানো যাবে!

বন্দীদের প্রসঙ্গে আসি। সঞ্চয় কিন্তু তাদেরও আছে। চাল ডাল সাবান বিক্রী করা পয়সা। খুবই অল্প, তবু মনে সদা সর্বদা ভয়। এই বুঝি কেউ নিয়ে নেয়। জমাদার মাঝে মাঝে এসে পয়সা চায়। বলে, দাও নয়তো জেলারের কাছে মিথ্যে নালিশ করে দুর্ভোগে ফেলবো। দিয়ে দেয় তখন যার যা সঞ্চয়। বরং যাক টাকা, তবু দুর্ভোগের হাত থেকে তো বাঁচি! আমি নিজের চোখে দেখেছি টাকা হস্তান্তরের দৃশ্য। বড় জমাদার এসে দাঁড়ালো, অমনি ছুটে গিয়ে বন্দীরা তার হাতে যার যা সঞ্চয় গুঁজে দিয়ে এলো। যার কাছ থেকে কম পাবে, সে শুধু তাকে মিটিমিটি হেসে বলবে,—কিরে, কদিন একলা থাকতে বুঝি খুব ইচ্ছে হচ্ছে? একবার শুনলাম এই মহামান্য ব্যক্তিটি নাকি পাটনা জেলে বদলী হবে। কথাবার্তা প্রায় পাকা। মুখোমুখি পড়ে যেতে একদিন হেসে বললাম, আর কি, আপনার তো এবার সুবিধে হলো। বড় মানুষদের সঙ্গে এবার দেখা সাক্ষাৎ হবে।....বলে, কি হবে আমার বড় মানুষ দিয়ে? ওরা পয়সা দেয় না। পয়সা দেয় আমাকে গরীব মানুষ। আমার গরীবই ভালো।

তা যে সব দিনে আসতো কোন মন্ত্রী, কি জেলখানার ইন্সপেক্টর জেনারেল বা অন্য কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি, চতুর্দিকে পড়ে যেতো অমনি সাজো সাজো রব। আমাদের ভব্য সভ্য করে রাখা হতো। পায়খানায় দেখতাম ফিনাইল ঢেলেছে, নর্দমায় দিয়েছে চুণ—অতি সুকৌশলে, যা'তে ফাটলগুলো ঢাকা পড়ে যায়। সব ঝকঝকে তকতকে। এমন কি আমাদের জামাকাপড় অব্দি বাইরে রাখার জো নেই। সব ভাঁজ করে গুছিয়ে রাখতে হবে কম্বলের নীচে।

ছিঃ, ছেঁড়া নোংরা ময়লা জিনিস কি ঐসব মান্যবরদের দেখানো যায়! এবং সেদিন আমাদের রান্না বলতে গেলে বন্ধ। যেই তারা চলে যাবে, তারপর রান্না। সবাইকে বারবার সাবধান করে দেওয়া হতো,—খবরদার, বিশিষ্ট অতিথিদের সামনে যেন আবার আমরা এটা নেই ওটা নেই সেটা পাই না এই সব বলে নাকে কাঁদতে না বসি। তো ভয়ে ভয়ে সবাই মুখে কুলুপ এঁটে থাকতো। এর অন্যথাও যে হতো না মাঝে মাঝে এমন নয়। সবাই তো আর ভীরু নয়। এক একদিন প্রচণ্ড সাহসী কাউকে দেখতাম হুট করে লাইন থেকে বেরিয়ে মান্যবরের সামনে বলে বসলো নিজস্ব দু একটা অভিযোগের কথা। সে হয়তো চালের নিম্ন মান নিয়ে, কি কাপড় দেয় না তাই নিয়ে বা আর কতদিন তাকে বিনা বিচারে আটক থাকতে হবে এই নিয়ে। শুনে তিনি দুটি বা বড়জোর তিনটি শব্দে আশ্বাস দিতেন,—ঠিক আছে, দেখবো। তারপর দেখতাম নিজেদের মধ্যে অভিযোগ কারিণীর দেশোয়ালী ঢঙে বলার কায়দা নিয়ে সে কী ইংরিজিতে রঙ্গ রসিকতার বহর! পাছে এরকম আরো অভিযোগ ফস ফস করে বেরিয়ে পড়ে, তাই সুপারকে দেখতাম তখন এক অদ্ভুত চাল চালতে। হাসতে হাসতে মান্যবরকে বলতো, বুঝলেন স্যার, এরা সব খুনের আসামী। জাত শয়তান। বেশিক্ষণ এখানে আর থাকা ঠিক নয়। চলুন আমরা অফিস ঘরে গিয়ে বসি। ব্যস্, মান্যবরের কানে যেন জল পড়তো। তড়িঘড়ি অমনি তিনি ছিটকে প্রায় সরে আসতেন। তারপর সিধে ফটক। মেয়েদের দেখেছি এই নিয়ে খুব অসন্তোষ প্রকাশ করতে। অবশ্যই সুপারের সামনে নয়, আড়ালে।—তাইতো, আমরা কী ওদের মজার সামগ্রী যে যা বলবো তাই নিয়ে হাসবে, মস্করা করবে! আমাদের কি সম্মান বলে কিছু নেই? মোটমাট অসম্মানের ব্যাপারটা তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারতো না। না পারাটাই স্বাভাবিক। আত্মসম্মান বোধ একটা জন্তুর অব্দি আছে। আর এরা তো মানুষ।

আর একটা ব্যাপারও এই সব পরিদর্শনের সময় হতো। বাগানে যেখানে যতো ফুল, সব তুলে বন্দীদের দিয়ে মালা গাঁথানো হতো ঐ সব মহামান্যদের গলায় লটকাবে বলে। সে এক হতশ্রী ব্যাপার। আমার ঘরের সামনে সেই যে বাগানটা—বেশ কটা কুঁড়ি ধরেছিলো তাতে, বাহারী সব মরশুমী ফুল। একদিন দেখি সেগুলোও পটাপট ছিঁড়ে নিয়ে গেলো। ক্ষোভে দুঃখে সেই থেকে বাগান করা ছেড়ে দিলাম।

একবার, শুধু একবার জনৈক সরকারী কর্মচারীর আগমনে আমাদের খানিকটা

লাভ হয়েছিল। চুয়াত্তরের জানুয়ারী, আমার স্পষ্ট মনে আছে। কলটা গেছিল খারাপ হয়ে। তারই তৎপরতায় সারানো হলো। ক হপ্তা আগেই কিন্তু মিস্ত্রী এসে অদ্ভুত এক কাণ্ড করে গেছে। পাইপ ছিলো ফাটা, তাই দিয়ে গলগল করে জল বেরিয়ে যেতো, তারা এসে করলো কি—মুখের দিকে ফাটা পাইপটা বাদ দিয়ে কলের প্যাঁচ ঘোরানো মুখটা অব্দি খুলে দিয়ে চলে গেলো। তখন সে এক অদ্ভুত দর্শন জিনিস। দেয়ালের গায়ে একটা ফুটো শুধু, তাই দিয়ে জল বেরোয়। বন্ধ করার আর উপায় নেই। অকারণেও পড়ে নষ্ট হয়ে যায়, ফলে জলের ভাঁড়ারে পড়ে টান অর্থাৎ ট্যাঙ্কে, জল তখন বেরোয় ফোঁটা ফোঁটা। তারপর একসময় সেটাও আচমকা একদম বন্ধ হয়ে যবে। কেউ জানে না কখন বন্ধ হবে। হয়তো মাথায় মেখেছি সাবান, চুল ধোবো, গেলো বন্ধ হয়ে জল। বা কেউ হয়তো কাপড় সাবান-কাচা করেছে, এবার ধোবে, ধোওয়া আর হলো না,জল আচমকা বন্ধ। সেই অবস্থাতেই বসে রইলাম ফুটোর দিকে তাকিয়ে। অনেক অনেকক্ষণ পরে তিনি আবার দেখা দিলেন, ততক্ষণে সব শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে। সে চুল, কি সাবান-ঘষা কাপড়, কি গায়ের সাবান। তখন আবার নতুন করে জলে ভিজিয়ে তবে চূড়ান্ত ধোয়াপাখলা হলো। এ তো গেলো একটা দিক। আর একটা দিকও আছে। এই কলটারই আরেকটা দিক পুরুষ মহলে। একই নল, একই তার উৎস, শুধু পাইপটা দেয়াল এফোঁড় ওফোঁড় করে দুটো মুখ বের করা। হতো উদ্ভট সব রগড়। হয়তো জল খাচ্ছি কল থেকে, ওদিকে একজন কেউ দিলো কল খুলে, সঙ্গে সঙ্গে এদিকেরটা বন্ধ। যেন ম্যাজিক। অদৃশ্য এক হাতের কারসাজিতে কখনো খুলছে, কখনো বন্ধ হচ্ছে। হাতের মালিককে লক্ষ্য করে তখন শুরু হতো কটু কথার বন্যা। রাগ হওয়াটাই স্বাভাবিক। একটা মোটে কল, তার ভাগীদার ত্রিশটি পূর্ণবয়স্কা মেয়ে এবং কয়েকটি শিশু। একসঙ্গে তো আর সবার পক্ষে প্রয়োজন মিটিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। কেউ হয়তো চান করছে, তখন আরেকজন ঘষছে কাপড়ে সাবান, তৃতীয় একজন বসে আছে উন্মুখ হয়ে পানীয় জল বা রান্নার জন্যে দরকারী জল নিয়ে যাবে বলে, আরেকজনের হাতে তখন বালতি। এই তিনজনের হলে সে বাল্তি ভরে জল নেবে। তার ওপর হয়তো ভার পড়েছে ঘর ধোয়াবার নয়তো বাগানে জল দেবার। পুরুষ মহলে তবু তো বাড়তি একটা কুয়ো আছে। এরা বলে ইঁদারা। দড়ি দিয়ে কপিকলে জল তুলতে হয় অনেক নীচ থেকে, কলটা গেছে ভেঙে। সেই থেকে মেরামত হয়নি। ফলে ইঁদারা ব্যবহারের অযোগ্য অবস্থায় পড়ে আছে। তাই

বাস্তবিক এই যে ওরা সময়ে অসময়ে কল খুলে আমাদের দুর্ভোগে ফেলে, এজন্য ওদের দোষ দেওয়া যায় না। তবু প্রয়োজনের মুখে ঐ যে বলে যুক্তি প্রায় হার মেনে—মাঝে মাঝেই রাগে তিড়বিড়িয়ে ওঠে মেয়েরা। একদিন তো রেগে কাদা আর পাথর ছোঁড়া শুরু করলো সেই অদৃশ্য মানুষটিকে লক্ষ্য করে! জমাদার পরে এজন্য খুব বকাঝকা করে গেছে।

জমাদারণীদের বার বার বলেছি জলের সমস্যা নিয়ে জেলারের সঙ্গে কথা বলতে। ওরা বলে নি। নিজেরাই বা কি এমন সুখে সোয়াস্তিতে আছে যে আমাদের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবে? পরিবার পরিজন নিয়ে সবাই তো জেলখানার চৌহদ্দির মধ্যেই থাকে। একপাশে ওদের কোয়ার্টার। দেখেছি আমি। ছোট্ট একখানা করে ঘর, তার ছাদটা নীচু, সামনে ছোট্ট একটা বারান্দা আর একটু উঠোন মতো। তারই মধ্যে থাকতে হয় এক এক পরিবারের আট নটি পোষ্যকে। লিওনী বলে, আমার বাপু ডিউটি করতেই ভালো লাগে। এখানে তবু খোলামেলা পরিবেশ। মশা কম মাছি কম। ঐ ঘুপচির মধ্যে ঢুকলে আমার যেন প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।

একদিন হাকিমের এজলাসে হাজিরা দেওয়াতে নিয়ে গিয়েছিল এক জমাদারণী আমাদের একজনকে, ফিরে এসে বললো সে নাকি একটা বাচ্চা মেয়েকে দেখে এলো, শতছিন্ন কাপড় পরা, এজলাসের সামনে মাঠে শুয়ে খিদের জ্বালায় ছটফট করছে। শুধু চোখেই দেখা। কিই বা করবে সে। নিজেও তো খুবই গরীব। একটার বেশি দুটো পয়সা খরচ করতে পাঁচবার হিসেব করতে হয়। তাছাড়া এক্ষেত্রে পয়সা দেওয়া বা কিছু খাবার কিনে দেওয়া, দুটোই নিরর্থক। একবেলার জন্য মরণটাকে পেছিয়ে দেওয়া। কাল তো ও আর দিতে যাচ্ছে না। কাল নির্ঘাৎ ঐভাবে ছটফট করতে করতে মরবে। মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল শুনে। বড় অপরাধী লাগছে নিজেকে। তাইতো, আমরা কি কিছুই করতে পারি না এ সবের বিরুদ্ধে! ভেতরে ভেতরে ভীষণ রাগ হতে লাগলো। এই তো দেশ! এই তার অবস্থা! এদিকে লোকসভায় তর্কের ঝড় বয়ে যাচ্ছে—এই যে বিভিন্ন রাজ্যে এতোগুলো করে লোক মারা যাচ্ছে, তারা অনাহারে মরছে না অর্ধাহারে। এটা দেখেছি লোকসভায় একটা নৈমিত্তিক ব্যাপার। দুর্ভিক্ষ হলো কি অমনি বিতর্ক উঠলো—মৃত্যুর কারণ অনাহার না অর্ধাহার। যেন দুটোর মধ্যে বিরাট তফাৎ। অর্ধাহারের ব্যাপারটা তবু যেন মেনে নেওয়া যায়। অনাহার হলেই মানতে হত আপত্তি।

কোন বিতর্কেই আর কিছু ফল হলো না। দুর্যোগের গোড়ায় যা ছিলো অনিবার্য,

তাই ঘটলো অনাহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিক্ষোভ শুরু হলো গুজরাটে। পাঠানো হলো সৈন্য দল। আপৎকালীন নৈশ আইন জারী হলো মোট তিরাত্তরটি জেলায়। রোজই পুলিসের গুলি চালনার সংবাদ পাই। ফেব্রুয়ারীর গোড়ার দিকে সরকার স্বীকার করলো চল্লিশ জন মারা গেছে পুলিসের গুলিতে। বিহারেও বিক্ষোভ উঠেছে চরমে। একুশে জানুয়ারী ডাকা হলো হরতাল। এক জমাদার গিয়েছিল ধানবাদে কি একটা কাজে. এসে বললো, দেখে এলো পুলিস নাকি থিক থিক করছে, মুখে গ্যাস-মুখোশ, হাতে উদ্যত রাইফেল, টহল দিচ্ছে অলিতে গলিতে, খাদ্যের দাবীতে যে কোন মুহূর্তে মানুষ নাকি বিক্ষোভে ফেটে পড়তে পারে।

২৬ শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস। রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি দেশ ও জাতির কাছে আবেদন জানালেন, সবাই যেন শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকে। আইন যেন না ভাঙে। অবাক হয়ে ভাবি, শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকার আর আছেটা কি? শৃঙ্খলা মানে কি তাহলে. ক্ষুধার জ্বালা ভুলে থাকা? দু মুঠো খাবারের জন্য কাঁদছে শিশু—তার মুখে হাত দিয়ে চেপে ধরে থাকা? বা এই যে খাদ্যের বদলে চলছে বাণী আর বক্তৃতার বন্যা, তাই শুনে চুপচাপ ক্ষিধে ভুলে বসে থাকা? শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, খাদ্যের অভাব নেই; পর্যাপ্ত খাদ্য আছে দেশে। হয়তো ঠিক। কিন্তু সে খাদ্য যে জনগণের হাতে পৌছয় না, সে খবর কি তিনি রাখেন? এতো দাম দিয়ে খাদ্য কেনার মতো পয়সা কোথায় তাদের হাতে? তাই তো লুঠ করতে যায়। তাইতো গুলি খেয়ে মরে।] গুজরাটে দাঙ্গা থামেনি। আমেদাবাদ সুরাট আর বরোদার গ্রামে গঞ্জে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছে। ২১ শে ফেব্রুয়ারী' ৭৪ হিন্দী দৈনিক 'আর্যাবর্তে' লিখলো, স্বাধীন ভারতে এ এক পরম বিস্ময়কর ঘটনা। একই দিনে চৌত্রিশটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গুলি চালিয়েছে পুলিস। তাতে পাঁচজন মারা গেছে। আর আহতের সংখ্যা অগুনতি। সাতচল্লিশ সালের পর ভারতে একই দিনে এতো ব্যাপক গুলিচালনার ঘটনা আর কখনো ঘটে নি।

আর শীতও যেন সে বছর বেশি। কী ঠাণ্ডা আর কী শুকনো যে আবহাওয়া! একটু উষ্ণতার জন্যে সে কী আকুতি! ভাঙা একটা মাটির পাত্রে করে চোরা-গোপ্তা পথে একটু আগুন নিয়ে যেতাম ঘরে, বড় জমাদারের তালা আটকাবার আগে, গোল হয়ে বসতাম সেই আগুন ঘিরে কজন—আমার ঘরে তখন আমি ছাড়াও আরো দু তিনজন থাকে; শুরু হতো আমাদের গল্প। স্বভাবতঃই আমি শ্রোতা। বলতো ওরাই। আমি শুনতাম। ছেষট্টির সেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের

কথা বলতো। সেই অসীম কষ্ট দুঃখ আর দুর্দশার কথা। অবাক হয়ে ভাবতাম, এতো কষ্টও পারে মানুষ সহ্য করতে! এতো দুর্দশা! এই দুর্ভিক্ষের মধ্যেই বড় হয়েছে ওদের সন্তান। তাদের পিঠে বেঁধে বেরিয়ে পড়তো সেই ভোরবেলা। যেতো মাইলের পর মাইল হেঁটে কাজ খুঁজতে। কোথায় তৈরী হচ্ছে রাস্তা, কোথায় খাল কাটার কাজ হচ্ছে—সব ওদের খেয়াল রাখতে হতো। সারাদিন ভাঙতে হতো পাথর, নয়তো বইতে হতো ঝুড়ির পর ঝুড়ি মাটি। বিনিময়ে মজুরী একবাটি মাত্র খিচুড়ী। এখন আবার সেই সব দিনের কথা নতুন করে মনে পড়ছে। শুনেছে তো গ্রামে গঞ্জে দুর্ভিক্ষের খবর। বাড়ির কথা ভেবে মন চঞ্চল হয়ে উঠছে,—পারবে তো ওরা খাটতে? পাবে তো কাজ? পাবে তো খিচুড়ী? বারবার এই নিয়ে হা হুতাশ করতো।

ফেব্রুয়ারী মাসে একটি শিশু এলো আমাদের মহলে। বন্দী নয়, তবে বন্দীর সন্তান। মা নেই। বাবা কয়লাখনি শ্রমিক। চাকরী থেকে ছাঁটাই হয়েছে, তাই ম্যানেজারের অফিসের সামনে বসে অনশন করছিলো। একটানা পাঁচদিন। শেষ দিনে ম্যানেজার আর সহ্য করতে না পেয়ে পুলিস ডাকে। গ্রেপ্তারীর পর সোজা জেল। তা তিন বছরের মেয়েকে দেখবার বাড়িতে তো আর কেউ নেই, তাই তাকেও সঙ্গে করে আনা হলো। গোড়ায় বাবার সঙ্গেই পুরুষ মহলে ছিলো। তাতে বড় জমাদারের ঘোর আপত্তি। তারই হুকুমে শেষ অব্দি মেয়ে এসেছে মেয়ে মহলে। হায় রে শিশু! শ্রমিকের শিশু যে দেখলেই চিনতে পারা যায়। পেটটা ধুকশ হয়ে ফোলা, রোগা প্যাকাটির মতো চেহারা। পেটের হাল এমন হয় দিনের পর দিন শুধু শর্করা জাতীয় খাদ্য খেলে। শরীরের পুষ্টির জন্যে প্রোটিনও যে দরকার। চুলে জট ধরা, তাতে আবার থিক থিক করছে উকুন। না পায় একটু চুলে মাখবার মতো তেল, না পায় সাবান। কে জানে, চান করবার জলটুকুও পায় কিনা। সারা গায়ে ফোস্কা ফোস্কা ঘা। আমরা পেট পুরে খাওয়ালাম, চুল কেটে দিলাম, উকুন মেরে দিলাম, বেশ ভালো করে স্নান করালাম। একজন কিনিয়ে আনলো তার জন্যে নতুন একটা জামা। কদিনের মধ্যে জামিনে খালাস পেয়ে তার বাবা তাকে নিয়ে চলে গেলো। কদিনই চের। তবু এসেছিলো বলে তো জানতে পারলাম অজানা এক ইতিহাস। এই হলো ভারতের শ্রমিকের পরিবারের অন্তর্নিহিত রূপ। এই ভাবেই এদের সন্তান একটু একটু করে বড় হয়।

তখন আমি জামসেদপুরে। রাত্রে পড়েছে দিওলীর ডিউটি। তো নাকি

ঘুমিয়ে পড়েছে। জেলারের কানে কিভাবে কথাটা উঠলো কে জানে, সে তো বিরাট হৈ চৈ! সামরিক বরখাস্তের আদেশ নাকি এই বেরোয় কি সেই বেরোয়। কাজে গাফিলতি বলে কথা! ধরে করে বড় জমাদার নাকি সে যাত্রা উদ্ধার করলো। লিওনী বলে নি তাকে তার হয়ে জেলারের কাছে আর্জি জানাতে। নিজের থেকেই সে গেছে। তারপর থেকে চাকরীর ব্যাপারে আর কোন গোল নেই। তা ইদানীং ফিরে দেখি, অমন হাসিখুশী মেয়েটা কেমন মনমরা। ভারী অবাক তো। একদিন বিকেলে দুজনে বসে সেলাই করছি, আর কেউ নেই, শুধু আমরাই দুজন। বললাম, কি হয়েছে বলো তো? এমন দেখাচ্ছে কেন? বলবো কি, অমনি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো। শেষে যা বৃত্তান্ত শুনলাম তার কাছে, আমি তো স্তম্ভিত। বড় জমাদার নাকি তাকে ইতিমধ্যে বার কয়েক স্মরণ করিয়ে দিয়েছে চাকরি রক্ষার প্রতিদান লিওনী এখনও তাকে দেয় নি। টাকা নয়, টাকায় সে প্রতিদান চায় না। সে চায় লিওনীকে, তার দেহকে। একদিন রাস্তায় নাকি লিওনীর স্বামী বেচারাকে ধরে খুব ধমকে দিয়েছে। বলেছে অবিলম্বে যেন লিওনীকে তার ঘরে পাঠিয়ে দেয়। স্বামী মিনমিন করছিল লিওনীর কাছে, মনে তো ভয়। লিওনী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছে, যাবে না। তাই যত অশান্তি। ডিউটি শেষে হয়তো বাড়ি ফিরছে, পড়ে গেল জমাদারের মুখোমুখি, জমাদার খুব একচোট শাসিয়ে দিল,—চাকরী খেয়ে নেবো, তাড়িয়ে দেবো এখান থেকে। হোক, তবু লিওনী কঠোর। যাবে না কিছুতেই। মরে গেলেও না। তবু ভয় বলেও একটা জিনিস আছে তো। চাকরী যাবার ভয়। বড় যে গরীব। যদি সত্যি সত্যিই চাকরীটা খেয়ে নেয়! যদি হুজ্জুৎ করে! তাহলে তো সব গেলো। তার পরিবার, তার সুখ, তার স্বামী, তার সন্তান। সবাইকে নিয়ে আবার পথে নামতে হবে।

আমার কিন্তু শুনে খুব একটা অবাক লাগে নি। বড় জমাদার ব্রাহ্মণ তো, এ আচরণ ওদেরই শোভা পায়। উপজাতীয় জমাদারণীদের ওরা এই ভাবেই ভোগ করতে চায়। নিজের বেলায় কিন্তু আঁটিসুঁটি। নিজের বৌকে দেখুন গিয়ে কী সাবধানে আর সতর্কতায় বাড়ির চার দেওয়ালের আড়ালে বন্দী করে রেখেছে। পরপুরুষের নজরও তার গায়ে পড়তে পারে না। আর এই যে সব নীচু জাতের মেয়ে,—ওদেরই ভাষায় এরা নীচু জাত—এরা কিনা কাজকর্ম করে খায়, ওদের ধারণায় এদের সতীত্ব বলতে কিছুই নেই। যেন অতি সহজেই ইচ্ছে মতো এদের ভোগ করা যেতে পারে। তাতে কোন পাপ বা অন্যায়

নেই। শুনি তো মাঝে মাঝে, কী বেহায়ার মতো জমাদারের দল জমাদারণীদের সঙ্গে কথা বলে, নানা রকম কু ইঙ্গিত দেয়। উচ্চবর্ণের হিন্দু হলে তো সে সবার এক কাঠি ওপরে। হরিজন বা তথাকথিত নীচু জাতের মেয়েরা নাকি তাদের খেলনার সামগ্রী। সেইভাবেই দেখে। অথচ বিয়ে করতে বললে কিন্তু করবে না। সেটা বিরাট অন্যায়। বেজাতে বিয়ে! তায় আবার হরিজন! জেলখানাও এই নিয়মের বাইরে নয়।

জাত বেজাতের ব্যাপারটা অন্য ভাবেও জেল জীবনে প্রতিফলিত হয়। জমাদারদের মধ্যে কেউ ব্রাহ্মণ কেউ রাজপুত। আবার সরকারী বিধিনিষেধ অনুযায়ী সরকারী চাকরীতে যেহেতু আংশিক তপশীলী এবং উপজাতি সম্প্রদায়ের লোক নিতে হবে, তাই কিছু কর্মচারী সেই সব সম্প্রদায় ভুক্ত। কাজ বণ্টনের ব্যাপারেও দেখি জাতপাতের এই অদ্ভুত দ্বন্দ্ব। বেছে বেছে নিম্ন বর্ণের কর্মচারীদের শক্ত শক্ত কাজ আর উচ্চ বর্ণের বাবুরা বসে থাকে ভালো ভালো ঘাঁটি আগলে। সেখানে উপরি, সম্মান দুই-ই আছে। ঝক্কিও যৎপরোনাস্তি কম।

মার্চের গোড়ায় হাই কমিশন অফিসের জনৈক সেক্রেটারী এলো আমার সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে উকিলের একখানা চিঠির নকল। আসলটা নাকি বেশ কয়েকদিন আগে ডাকে পাঠিয়েছিল। আমি পাই নি। চিঠিতে লেখা আছে, মামলার দিন যেহেতু ঘনিয়ে আসছে, আমি যেন আমার সহ বন্দীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যাপারটা একবার ঝালিয়ে নিই। তা সেই ভাবে নিজেকে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্য নিয়ে সবে একটু নড়াচড়া করতে শুরু করেছি কি করিনি, অমনি সারা বিহারে শুরু হলো তুমুল গণ্ডগোল। যেখানে যত পুলিস, সবাইকে খবর করে নিয়ে যাওয়া হলো দেশের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে। এমনকি আমাদের যে সঙ্গে করে হাকিমের এজলাসে নিয়ে যাবে, এমন কজন পুলিসও বাড়তি নেই। এদিকে রাতারাতি সরকারী ঘোষণা বলে পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের কোর্ট হাজিরা বা এক জেল থেকে আরেক জেলে বদলীর বিষয়টি মুলতুবী রইলো। কদিন পরে শুনি কোর্টের স্বাভাবিক কাজকর্ম নাকি প্রায় বন্ধ হবার মুখে। বিহার বিধানসভা ঘেরাও করে রাখা হলো দীর্ঘক্ষণ। ঢোকা বেরুনো সব বন্ধ। ছাত্ররা নেমেছে আন্দোলনে নানান প্রতিবাদ নিয়ে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে প্রতিবাদ, বেকারীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, দুর্নীতির জন্য প্রতিবাদ, এমনকি শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল সংস্কারের জন্যও প্রতিবাদ।

সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে অবিশ্যি এসব বলা নেই। মামলা শুরু না করার পক্ষে অন্য

একটা কারণ দর্শানো হলো। জামসেদপুর জেলে নাকি জলবসন্ত মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে। মামলা চলাকালীন জামসেদপুরেই আমাদের থাকতে হবে। জেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আমাদের তারা আপাততঃ থাকার জায়গা দিতে অক্ষম। এদিকে হাকিম বলেছে, জেলের মধ্যে বানানো এজলাস ব্যবহারের অযোগ্য, ওখানে বিচারের বন্দোবস্ত হলে তার পক্ষে হাজির থাকা সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে জামসেদপুর জেল হাজতের কর্মচারীদেরও নাকি বদলীর হুকুম হয়েছে। একজনও বাদ নয়, একেবারে সবাই। হুকুম দিয়েছেন স্বয়ং কারা-আধিকারিক। ব্যাপক আকারে নাকি খোস পাঁচড়া দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এমতাবস্থায় জামসেদপুরে থাকা কোন কর্মচারীর পক্ষে মঙ্গলজনক নয়।

বাইরে এদিকে অবস্থা সাংঘাতিক। রোজই একটা না একটা খবর পাই জমাদারণীদের মুখে। আজ বাজার বন্ধ। কাল পরিবহন ধর্মঘট। পরশু গোটা হাজারিবাগের মানুষ যাবে সরকারী দপ্তরে বিক্ষোভ জানাতে। সে যে কত খবর! এখানে সেখানে আনাচে কানাচে কেবল ফিসফাস কথা। বাইরে শুধু গুজব আর গুজব। গোটা শহরটা ছেয়ে ফেলেছে হেলমেট পরা সশস্ত্র সিপাই দল। আমরা তো সব সময় কান খাড়া করে থাকি। বাতাস হয়তো হঠাৎ একটু জোরে জোরে বয়ে গেলো, অমনি আমরা চঞ্চল হয়ে উঠলাম। বা একটা কাক হয়তো ডানা ঝাপটালো, কি কোথাও বাজলো ঢোল, কিংবা দূরে হয়তো শুনলাম একটা শ্লোগান,—অমনি উৎকর্ণ হই, দম বন্ধ করে বসে থাকি পরে কি ঘটবে শুনবার জন্যে। এ তো গেলো বাইরের কথা। জেলের ভেতরেও কি আর অবস্থার কিছু অন্যরকম আছে? কোন জমাদার হয়তো বাঁশিতে একবার ফুঁ দিলো, কি কেউ হয়তো একবার চেঁচিয়ে উঠলো বা জোরে জোরে কথা বললো দু চারবার—ব্যস্, আমার তো বুক ভয়ে ধুক পুক করতে শুরু করেছে। না জানি এই একটা কিছু হয়। কিছু একটা ঘটে! উৎকণ্ঠা যাকে বলে আর কি। জানি না তো সঠিক করে কি ঘটবে। তাই কেবল অনুমান আর অনুমান। হবেই তো। বাইরে যে গোটা ভারত উত্তাল। পাটনায় শুনলাম শয়ে শয়ে লোক গ্রেপ্তার বরণ করেছে। গুজরাটে জনগণের চাপে সরকার ইস্তফা দিয়েছে। আরো কত কি ঘটনা। যেন মনে হয় জীবন আর কখনো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে না।

সব দিক থেকে সে এক আকাল আর কি। একটা ঝাঁটা নেই আমাদের যে ঘর ঝাঁট দেবো। নেই একটু ফিনাইল, এমনকি জলও মাঝে মাঝে থাকে না। আর সে এমনই গরম, আমার কলমের কালিটুকু অব্দি শুকিয়ে গেছে। রাত্রে গরাদের

কাছটায় প্রায় অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় শুয়ে থাকি, ফিনফিন করে কখনো আসে একটু দয়ালু হাওয়া, তারই আশায় তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করি। ঘুম আর আসতে চায় না। আর ঘর নয় তো যেন অগ্নিকুণ্ড। এর বদলে যদি কেউ আমাকে ঘাসের ওপর শুয়ে থাকতে বলতো, বা ওই জলের কলের নোংরা চাতালে, আমি সানন্দে স্বীকার করে নিতাম। তবু এই মরণকূপের হাত থেকে তো অব্যাহতি পাওয়া যেতো। উঃ, সে যা গরম! সারাদিন রোদ পড়ে দেয়ালের গায়ে, দেয়াল সেই তাপ ধরে রেখে দেয়। পড়ে গরাদের ওপর, গরাদ যেন হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় না। আর মেঝে তো সর্বদা গরম হয়ে আছেই। গরাদের ফাঁক দিয়ে মেঝের ওপরই তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে রোদ। ঘুম থেকে উঠে পড়ি সেই রাত্তির থাকতে থাকতে। তবু যাহোক একটু নিরিবিলি তো পাবো। আমাকে একটু যে চিন্তাভাবনাও করতে হয়। কত নিজস্ব চিন্তা আছে না আমার! অমলেন্দুর কথা ঘুরে ফিরে মনে পড়ে। কেমন আছে সে? পাই না তার খবর। অনেক দিন কোন যোগাযোগ নেই। অনেকের সঙ্গেই নেই। ইদানীং লোকজন দেখা করতে তেমন একটা আসে না। সেই আমি জামসেদপুর থেকে ফিরে আসার পর থেকে এখন অব্দি।

এদিকে ছমাসের মধ্যে বৃষ্টির নাম গন্ধ নেই। একদিন 'টাইমসে' পড়লাম, সাসেক্সে নাকি দুমাস পরপর বৃষ্টি হয়নি দেখে কর্তৃপক্ষ খরা ঘোষণা করে দিয়েছে। আচ্ছা যদি এমন হয়? এই যে বিহারে এখন ছটা মাস বৃষ্টি নেই, নদী নালা পুকুর ইঁদারা শুকিয়ে সব ফুটি ফাটা—যদি ঠিক একইভাবে টেম্‌স্‌ও যায় শুকিয়ে? যদি সারা ইংল্যাণ্ডে এতোটুকু জল না থাকে!

এমন কখনো হয় না, তাই ভাবনাটাকে বেশি দূর অব্দি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলাম না।

সাতটি কলেজের ছাত্রী এলো বন্দী হয়ে। সরকার বিরোধী আন্দোলনে সারা হাজারিবাগে এরাই প্রথম নারী বন্দী। ভারী প্রাণোচ্ছল, সংকল্পে একনিষ্ঠ। কথা বলে খুব আনন্দ পেতাম। কিন্তু বেশি দিন মেলামেশার ফুরসৎ হয় নি। মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। বাপ দাদার আর কিছু না থাক অর্থ আছে, যোগাযোগ আছে। অচিরেই সাতজন জামিন পেয়ে চলে গেল। যাবার সময় বারবার বলে গেল আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে আসবে দেখা করতে। জানিনা এসেছিলো কিনা। এলেও নির্ঘাৎ দেখা করার অনুমতি পায় নি।

মে মাসের গোড়ায় কনসাল অফিসের এক কর্তা এলেন দেখা করতে। অতি সম্প্রতি আমার মামলা দেখাশোনার দায়িত্ব তারই ওপর ন্যস্ত হয়েছে। বললেন, ছুটিতে ইংল্যাণ্ড যাচ্ছেন। আমার বাবা মার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করবেন।

শুনে তবু খানিকটা ধাতস্থ হওয়া গেলো। এর আগে আরো কত কেউ গেছে ছুটিতে, যাবার আগে একবার দেখা করেনি বা বাবা মার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে এমন আশ্বাসও দেয় নি। মার জন্য দুখানা ছবি এঁকে রেখেছিলাম, তাকে দিলাম মার হাতে দেবার জন্য। নিতে রাজী হলেন। কিন্তু তার রাজীতে তো কিছু যায় আসে না। স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের অফিসার বললো, আগে ছবি দুখানা 'পরীক্ষা' করে দেখবে, তারপর অসুবিধে না হলে ডাকে কনসাল অফিসে পাঠিয়ে দেবে। বলাবাহুল্য ছাড়পত্র পায় নি।

কনসাল অফিসের কর্তাটি বললেন, জামসেদপুরে যে বসন্ত দেখা দিয়েছে ব্যাপারটা ঠিক। সেই মর্মে তাদের কাছেও চিঠি গেছে এবং মামলা পিছিয়ে যাবার সেটাই অন্যতম কারণ। তবে পাশাপাশি আরেকটা খবর দিলেন, যেটা রীতিমতো আশার। নাকি ইংল্যাণ্ডে একটা কমিটি তৈরী হয়েছে, জিল্ ডিমক আর রুথ ফস্টারের চেষ্টায়। তারা আমার মুক্তির ব্যাপার নিয়ে আন্দোলন করবে, বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে। শুনে যাহোক খুব ভালো লাগলো।

আন্দোলন

কাগজে আর নতুন কোন খবর নেই, শুধু আন্দোলন আর আন্দোলন। উত্তাল হয়ে উঠেছে বিহার। রোজই পাই দাঙ্গার খবর, নয় ধর্মঘট, নয় বিক্ষোভ, নয় পুলিসের গুলি, সঙ্গে অসুখ বিসুখ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ—বিহারের সব কাগজ প্রতিদিন এই একই খবরে বোঝাই। কদিন পড়ার পর মনে হবে যেন একই খবর রোজ নতুন করে লিখছে, রোজ আমরা তাই নতুন করে পড়ছি। যেন শেষ নেই এর। যেন পুঞ্জীভূত রাগ মানুষের ফেটে পড়ছে মুহুর্মুহু। এরই মধ্যে চুয়াত্তরের মে মাসে গেল রেল শ্রমিক ধর্মঘট। সরকারী বিরোধিতার কায়দা নতুন ভাবে সবার চোখে ধরা পড়লো। ধর্মঘটের এক হপ্তা আগে আলোচনা চলছে ইউনিয়নের সর্বভারতীয়

নেতৃবৃন্দের সঙ্গে। হঠাৎ ভোর সকালে কেউ কিছু টের পাবার আগেই নেতাদের গ্রেপ্তার করা হলো। কোথায় যে রাখলো তাদের কহ প্তা কেউ খবরও পায় না। ধর্মঘট দমনের জন্যই এই মনোভাব যদি নিয়ে থাকে সরকার, তবে বলবো সে চেষ্টা তাদের ব্যর্থ হয়েছে। বরং উলটো ফল হলো। যথারীতি পূর্ব নির্ধারিত দিনে শুরু হলো ধর্মঘট, চললো একটানা কুড়ি দিন। এই কুড়ি দিনে গ্রেপ্তার হলেন প্রায় পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক। আর সে যে কা অত্যাচার! বিক্ষোভকারীদের ওপর চলছে মুহুর্মুহু গুলি, শ্রমিক কর্মচারীর ছেলে মেয়ে বৃদ্ধ বাবা মা এমনকি স্ত্রী পর্যন্ত রাগ্না-রোষের কবল থেকে নিস্তার পাচ্ছে না, বারবার তাদের নানাভাবে হয়রান করা হচ্ছে, কোয়ার্টার থেকে বের করে দিচ্ছে তাদের—সে এক দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড। তখন সেনা তলব করা হলো ট্রেন চালাবার জন্যে। শেষে তাতেও যখন কুলোয় না, দালাল কর্মীদের দিয়ে তাদের পরিবার পরিজনকে দিয়ে কাজ করানো হলো। বোনাস দেওয়া হলো এই সব কর্মীকে। আর নতুন যাদের কাজে নিলো, তাদের যোগ্যতা বিচারের অপেক্ষা না রেখে 'অযোগ্য' 'অপদার্থ' ধর্মঘটী কর্মীদের চেয়ারে বসে কাজ করতে দেওয়া হলো।

সকাল সন্ধ্যে রাস্তা দিয়ে যায় বিক্ষোভ মিছিল, রেল শ্রমিকের স্লোগানে আকাশ বাতাস মুখর হয়ে ওঠে, আমরা জেলের ভেতর থেকে শুনতে পাই। আভ্যন্তরীন নিরাপত্তা আইন আর ভারতরক্ষা আইন নতুন করে জোরদার করা হলো। সংক্ষেপে মিসা এবং ডি, আই আর। তাতে গ্রেপ্তার হলো হাজারে হাজারে। সর্বস্তরের মানুষ। কেউ ছাত্র, কেউ শিক্ষক, কেউ আইনজীবী, কেউ বুদ্ধিজীবী—বাদ নেই কেউ। এদিকে জেলখানা বোঝাই। একটা নয়, সব জেল। না আছে থাকতে দেবার জায়গা, না প্রয়োজনীয় খাদ্য। এদিকে অগণিত বন্দীর রক্ষণাবেক্ষণ করতে গিয়ে খাটতে খাটতে দেখি পুরনো মুষ্টিমেয় কিছু কয়েদীর তো প্রাণ যায় যায় অবস্থা। জমাদারের দল তো হুকুম দিয়েই খালাস, সব যে তামিল করতে হয় তাদের। দেখি দিন দিন রোগা হচ্ছে, চোখের কোলে কালি। নাইবার খাবার ঘুমোবার অব্দি সময় পায় না। পাটনাতে অবস্থা আয়ত্তের বাইরে দেখে নতুন করে প্রশাসনে জোর অদলবদল হলো। কিন্তু তাতে কি কিছু হয়! ফেটে পড়বার যে অপেক্ষা মাত্র। জনগণের বিক্ষোভ উঠেছে তুঙ্গে। এতোটুকু হেরফেরও হলো না।

জুন মাসের গোড়ায় দুটি মহিলা এলেন আমাদের সঙ্গে থাকতে। এক অধ্যাপিকা এবং এক প্রধান শিক্ষিকা। অধ্যাপিকার তো প্রথমে ভীষণ ভয়—

কিছুতে আমার সঙ্গে মিশবেন না, আমি যে নকশাল, নকশালরা যে হিংসা ছাড়া আর কিছু বোঝে না। পরে অবিশ্যি ভুল তার ভেঙেছিলো। খুব মিশতেন আমার সঙ্গে। খুব গল্প করতেন। ওরই মুখে শুনলাম, নাকি ছাত্রীদের এক বিরাট দল নিয়ে গিয়েছিলেন দিল্লী, শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে বিহারের খাদ্যাভাব, বিহারের জনগণের অবস্থার প্রকৃত বিবরণ তুলে ধরবেন বলে। একদিকে খাদ্য নেই, অন্যদিকে মজুতদারেরা জমা করে রেখেছে রাশি রাশি বস্তা বস্তা খাবার। দরিদ্রের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে চড়া দামে তাই বিক্রী করছে, জমাচ্ছে মুনাফার পাহাড়। ঠিক ছিলো এসব খবরই তাকে দেবেন। তো দেখা কি আর অতো সহজে মেলে! প্রধান মন্ত্রী বলে কথা! বসে থাকতে হলো অনেক দিন। তারপর শ্রীমতী গান্ধী দেখা করতে রাজী হলেন। শুনলেন সব। বললেন, বাড়িয়ে বলা হচ্ছে। দারিদ্র্য এমন প্রবল নয়। তিনি নাকি বেশ কটা সভা করে এসেছেন। সেখানে দেখেছেন হাজার হাজার মানুষ। প্রায় প্রত্যেকেরই পরনে নতুন জামা কাপড়, হাতে ট্রানজিস্টর রেডিও। অসীম দারিদ্র্য থাকলে কি আর এইসব হয়!

ফিরে এসে তিনি বিক্ষোভে শামিল হয়েছেন। শামিল হয়েছে তার ছাত্রীরাও। সেই মহা বিক্ষোভ। যার সূচনা পাটনায়। তারিখ ১৪ই মে '৭৪। নতুন পর্যায়ে যার সূচনা। সবাই শামিল হয়েছিলেন সেই বিক্ষোভে। সর্বস্তরের মানুষ। সবার মুখে একটিই নাম—অন্দোলন। সেই পর্যায়ের বিক্ষোভকে তারা এই নামেই অভিহিত করতেন। চলেছিল সারা বছর ধরে। সে কী চেষ্টা বিক্ষোভ দমনের। কী প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। শেষ কি হয়! তবু কি থামে? অধ্যাপিকা বললেন, বিধানসভা তখন ঘেরাও করে বসে আছে সব ছাত্র-ছাত্রী, পুলিসের জীপ তাদের গায়ের ওপর দিয়ে চলে গেল, রক্তের বন্যা বয়ে গেল চতুর্দিকে। তবু কেউ নড়লো না, বিক্ষোভ দমন করা গেল না।

প্রধান শিক্ষিকা জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত। জীবজগতের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা। যখন হাটেন, মাটিতে ঘোরে চোখ, পাছে অজ্ঞাতসারে কোন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব পায়ের চাপে পিষ্ট হয়ে মারা যায়। আমার ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গে দেখতাম চোখ মুখ কুঁচকে গেলো। কিঁঙ্কাপার, না ঐ যে আমি মাছি মেরে রেখেছি পিটিয়ে পিটিয়ে, অতোগুলো জীব! একটা খাটিয়ায় শুতেন। কর্তৃপক্ষ বলেছিল ছারপোকা তো খুব, ওষুধ দিয়ে দিই। তিনি আপত্তি করেছেন। থাক না রক্ত। ওদেরও তো বাঁচতে হবে! আসলে ধনী পরিবারের মেয়ে তো, বাইরে তেমন একটা কষ্ট দুঃখ ভোগ করার দরকার হয় না। বাড়িতে এই সব নিয়েই থাকেন। এই ওদের

পরিবারের রেওয়াজ। ঘুরতেন বাইরে বাইরে. সব কিছু দেখতেন বুঝতেন, তবে দেখতাম কেমন করে বজায় রাখেন ওর এই ধর্মবোধ!

কি করে এই সব ধনাঢ্য ঘরের মানুষ এই আন্দোলনে শামিল হলো, আমি কথাবার্তা বলে সেই রহস্যই ভেদ করতে চাইতাম। বিচিত্র এদের মানসিকতা। অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে মেলামেশা যদিও করে বন্ধুর মতো, তবু গতর খাটুনীর কাজ মোটে করতে চায় না। একদম না। এখানে সেই সনাতন ধারণা শক্ত হয়ে চেপে বসে আছে। কাজ! সে তো করবে গরীবরা, অশিক্ষিতরা। শিক্ষিতদের ধনীদের সেবা করাই তো ওদের ধর্ম। আর ওদের দৈনন্দিন সমস্যা! সেটা ওদের নিজস্ব ব্যাপার, তার মধ্যে মাথা গলাবার প্রয়োজন কি? কল্পনা আর বীণার সঙ্গে এই সব ব্যাপারে অদ্ভুত এক তফাৎ নজরে পড়তো। এমনকি ডেকে যে ওদের দুটো জ্ঞানের কথা বলবে, একটু যে ওদের বুদ্ধি বা বিবেচনা বাড়াবার চেষ্টা করবে, তাতেও অনীহা। কথায় কথায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভারতের গৌরবময় অতীতের কাহিনী বলতে শুরু করে। বলে, তারাই নাকি প্রকৃত দেশপ্রেমিক যারা ভারতকে সম্মানের আসনে বসাতে চেয়েছিলেন। ভারত ভিখিরীর মতো হাত পেতে সবার কাছে ভিক্ষে চেয়ে বেড়ায় বা ভারতের প্রতি স্তরে রয়েছে দুর্নীতির বীজ—এরকম প্রচার করা নাকি দেশদ্রোহিতা।—কেন তবে আপনারা আন্দোলনে নেমেছিলেন?—নামবোই তো। খাদ্য আছে, অথচ মানুষ খেতে পায় না, এ তো লজ্জার কথা। তাই আমরা মজুত উদ্ধার-অভিযানে নামতে বাধ্য হয়েছিলাম। —আর সরকার আপনাদের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলার দায়ে জেলে পুরলো?—সে তো করবেই সরকার। এটা সরকারের ধর্ম। মোদ্দা কথায়, এই দুজন হলেন তাবৎ বিহারে যে হাজার হাজার মানুষ গ্রেপ্তার হয়েছেন, তাদেরই প্রতিভূ। এরা সকলেই হাইকোর্টে আবেদনের ভিত্তিতে পরবর্তীকালে ছাড়া পেয়েছেন। অধ্যাপিকা পরেও আরো তিনবার গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

দুজনের চিন্তায় আমাদের বিস্তর ফারাক। তবু বলবো মহিলা থাকাতে আমার অনেক সুবিধে হতো। ছাত্রীরা আসতো দেখা করতে, অফিস ঘরে বসে অনেকক্ষণ তাদের সঙ্গে গল্প করতেন। কর্মচারীদের সঙ্গেও নানান কথা বলতেন, এটা ওটা খোঁজখবর নিতেন। পরে সব এসে বলতেন আমাকে। ফলে অনেক নতুন নতুন খবর পেতাম। স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের লোকেরা নাকি বারবার সাবধান করে দিয়েছে ওকে, যেন আমার সঙ্গে মেলামেশা না করেন, যেন সব কথা আমার কানে না তোলেন। বলেছে, আমি নাকি বিপজ্জনক। আতঙ্ক স্বরূপ। যখন

গ্রেপ্তার হই, আমার সঙ্গে একটা পিস্তল আর একটা রিভলবার ছিল। তাই তো বাইরের চিঠিপত্র আমাকে ওরা দেয় না। এটা ছোট জেলার বলেছে। সব নাকি ছিঁড়ে কুচিকুচি করে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেয়। তবে তো আসল রহস্য বুঝতে পারলাম! কোন চিঠিই আসে না কেন, বা কোন চিঠি আমার কোন আত্মীয় স্বজন পায় না কেন—এর প্রকৃত রহস্য কি তা সম্বন্ধে ভাসা ভাসা একটা ধারণা ছিল মাত্র। বলাতে সব পরিষ্কার হলো।

কাছাকাছি ছিল একটা বাড়ি। নাম ছিল 'সংশোধনী স্কুল'—বন্দীদের রাখা হতো সেখানে আত্ম সংশোধনের মাধ্যমে সৎ হবার জন্যে। এতোদিন বন্ধ ছিল। সেটা নতুন বন্দীর ভিড় এড়াবার জন্যে আবার খোলা হলো, নাম দেওয়া হলো 'হাজারিবাগ স্পেশ্যাল জেল।' আর সে যে কত বন্দী! কত গ্রেপ্তার! সারা বিহারের মানুষ যেন গ্রেপ্তার বরণ করার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে। সত্যি বলতে কি আমি বুঝিনা বিক্ষোভের মর্ম কি বা মূল উদ্দেশ্য কি। সব যেন তালগোল পাকিয়ে আছে। এদের দাবী সম্বন্ধে আমার কোন মতভেদ নেই। আমি মনে করি, দাবী এদের ন্যায্য। তবু যে মনটা কেমন খুত খুত করে! কার স্বার্থ এতে সাধিত হচ্ছে? অগণিত দুঃখী দরিদ্র মানুষের, না কি মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর? দাম যে জিনিসপত্রের বেড়েছে, তাতে যারা কিনতে পারে, মোটামুটি কেনার সামর্থ্য আছে, তাদেরই তো অসুবিধে। অবশ্যই সীমিত সামর্থ্য, পারে না তাই দিয়ে নিজের সব অভাব পূরণ করতে। তাই বিক্ষোভ। তাই গ্রেপ্তার। কিন্তু যাদের একেবারে নেই তাদের? দাম দু পয়সা কমলো কি কমলো না, তাতে তাদের কি আসে যায়' একেবারেই তো সঙ্গতি নেই। এখন কথা হলো, মধ্যবিত্তদের নিজস্ব দাবী পূরণ হওয়ার পরও কি তারা ব্যাপক মানুষের স্বার্থে আন্দোলন চালিয়ে যাবে? খেতে পায় না যারা, দারিদ্র্য সীমার নীচে যাদের অবস্থান—তাদের স্বার্থে? জানি না চালাবে কিনা। তবে দু একটা যা নর্জ র দেখি, মনে ধন্দ লাগে। জেলের মধ্যেও দেখি তাদের আন্দোলন করতে। নিছকই নিজেদের দাবী দাওয়া পূরণের প্রয়োজনে। ব্যাপক বন্দীর কথা তারা ভাবে না। নিজেরটুকু পুষিয়ে নিতে পারলেই খুশী।

এই নিয়ে দেখি বাকীদের মধ্যেও অসন্তোষ। আমাকে বলে, এ কেমন ধারা লোক বলো তো' আসছে তো আসছেই। কদিন থাকে, হৈ চৈ করে নিজেদের জন্যে ভালো জামাকাপড় ভালো খাবারের ব্যবস্থা করে নেয়, তারপর হাওয়া। কই আমাদের জন্যে তো কখনো কিছু বলে না? বলে, জানো দিদি, এরা

গরীবদের জন্যে কিছু করবে না, কভি নেহি! তা এই নিয়ে তো আর জেলখানার মধ্যে এদের বিরুদ্ধে কিছু বলা সঙ্গত নয়। আমি বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা রাখি। বলি, দেখো বোন, হুটপাট করে আন্দোলন একটা কিছু শুরু করলেই হয় না। তার একটা পরিষ্কার রাজনীতি থাকা চাই। লক্ষ্য থাকা চাই। ভারতের এতে কোনো উপকার হবে বলে আমার মনে হয় না।

তা বলে যতো লোক শামিল হচ্ছে আন্দোলনে, সবাই যে একই রকম, এমন নয়। কিছু ছাত্রকে দেখেছি, ভীষণ জঙ্গী, আন্দোলন তাদের রাজনীতি মজবুত করেছে। শিখিয়েছে অনেক কিছু। শুনলাম এদেরই সমবেত প্রতিবাদে পুরুষ বিভাগে নকশাল বন্দীদের পায়ের বেড়ি হাতের বেড়িগুলো খুলে দিতে হলো। নকশালরা করলো অনশন, তার সমর্থনে এরা শ্লোগান দিলো, বিক্ষোভ জানালো। অবশ্যই এই সব সুযোগ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। অচিরেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোরদার করা হলো, হাতে পায়ে আবার উঠলো বেড়ি। কেননা মুজফফরপুর জেলে কদিন আগে পলায়নোদ্যত কিছু বন্দী ধরা পড়ে যায়। এ সব তারই জের।

বাইরে তখন পুলিস আর সেনাবিভাগ জনগণকে দমন করতে এতো ব্যস্ত, নকশালদের দিকে আলাদা করে নজর দেবার আর ফুরসৎ নেই। একদিন কাগজে পড়লাম এক অদ্ভুত খবর। কালি দিয়ে লেপে দিয়েছে, তবু দু'ইঞ্চি বড় এক একটা অক্ষর—বড় খবর যাকে বলে আর কি, যায় কি তাকে অতো সহজে আড়াল করা।—**সরকার ভোজপুরে নকশাল মোকাবিলায় ব্যর্থ।** এরই দু হপ্তা পরে এই সংক্রান্ত আরো খবর বেরুলো। নাকি নকশালরা মস্ত বড় এক সুড়ঙ্গ খুঁড়েছে। পশ্চিম বিহারের ভোজপুর এলাকার তাবৎ হরিজন আর ভূমিহীন কৃষকের সমর্থন লাভে সমর্থ হয়েছে। এমনও খবর, নাকি শহরে আন্দোলনকারী ছাত্রদের বড় একটা অংশ নকশালদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে।

৬ই জুন পাটনায় বিশাল এক বিক্ষোভ সমর্থন হবার কথা। আগের দিন সারা শহর দাপিয়ে বেড়ালো আধা মিলিটারী বাহিনীর লোকেরা। চৌকি বসানো হলো যত্রতত্র। বারবার জীপে করে মাইকে বলে বেড়ালো, জনগণ যেন বিক্ষোভে শামিল না হয়, তাহলে বিপদ হবে। সমাবেশের দিন যানবাহন দিলো বন্ধ করে। ট্রেন বন্ধ। ফেরী জাহাজ বন্ধ। তবু সমাবেশ হলো। একলাখ লোক জড় হলো মোট। আগে থেকেই অনুমান করতে পেরেছিলো, এমন একটা কিছু ঘটতে পারে। তাই আগে থেকেই সবাই নানান জায়গা থেকে এসে ভিড় করতে শুরু করেছিলো। সে এক সমাবেশ বটে! আওয়াজ উঠলো সরকার পদত্যাগ করুক, বিধানসভা

ভেঙে দেওয়া হোক। এদিকে আমরা তো জেলের মধ্যে আশঙ্কা নিয়ে বসে আছি, কখন কি দুঃসংবাদ আসে। হয়তো শুনবো গুলি চলেছে নির্দয় ভাবে, জনতা পুলিস খণ্ডযুদ্ধে হয়তো রাশি রাশি প্রাণ শেষ হয়েছে। কিন্তু না, সব আশঙ্কা বানচাল করে বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণ ভাবে শেষ হলো।

আর পাশাপাশি জুলাই মাসে আমার জন্মদিন—জেলে আসার পর এই পঞ্চম বার—খুব ঝঞ্ঝাটে কাটলো গোটা দিনটা। স্পেশ্যাল জেলে সেদিনই হলো দাঙ্গা। অবস্থা উন্নতির দাবীতে মরীয়া বন্দীর দল দিলো সব কাগজপত্রে আগুন লাগিয়ে। মিলিটারী পুলিস ডাকতে হলো অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্যে। একই দিনে পাটনার কাছে ফুলওয়ারী শরীফ সাময়িক জেলে জমাদারদের সঙ্গে সংঘর্ষে আঠেরো জন বন্দী মারাত্মকভাবে জখম হলো। ভাগলপুরে জেলে সেই দিনই ছাত্রদের নির্দয়ভাবে পেটালো জমাদারের দল। সব খবর আমরা বসে বসেই শুনছি। জের হিসেবে আমাদের জেলখানায় আরেকদফা তল্লাসী হলো। কিছুই যে পাবে না, এটা ওরা ভালো ভাবেই জানতো। তবু ঐ একটু হয়রানি। সরকারকে ক্ষেপিয়ে তুলছো, হয়রান তোমাকে হতেই হবে।

আর এতো সব টালমাটালের মধ্যে কি আর বিচার শুরু হবার আশা করা যায়। আদৌ হবে কিনা কোনদিন, সেটাই এখন সন্দেহ লাগে। এদিকে জামসেদপুর থেকে বদলী হয়ে এলো এক জমাদার। তার মুখে শুনলাম, সেখানে নাকি এখন থিকথিক করছে বন্দী। আমি যে ঘরটায় থাকতাম, সেখানে রেখেছে তিরিশ জনকে। যেটাকে আমাদের হাজত করা হয়েছিল, সেখানে আপাততঃ দুশো জন আছে। পরে সংখ্যা আরো বাড়তে পারে।

সেই অধ্যাপিকাটি প্রথমবার জামিনে খালাস পেয়ে চলে যাবার পর এক মহিলা এলো মিসায় বন্দী হয়ে। সোশ্যালিষ্ট পার্টি করে। লোকসভার প্রাক্তন সদস্যা, জমিজিরেত প্রচুর। ট্রাকটর আছে। বছরে জমি থেকে আয় বললো নীট পঞ্চাশ হাজার টাকা। আর খুব আহ্লাদ মনে জেলে এসেছে বলে। একদিন হাত দিয়ে চারপাশ দেখিয়ে বললো, এই এমন সুন্দর খোলামেলা—একে বলে নাকি জেল? বিয়ের পর আট বছর আমি তো এটুকুও পাইনি। দু কামরার বাড়ি। তাতে কাটাতে হতো বন্দী জীবন। জেল তো সেটাই। পয়সাওয়ালা হিন্দু ঘরের বৌ তো, তাই সনাতন নিয়ম অনুযায়ী অপ্রকাশ্যে থাকতে হয়েছে। শ্বশুর মারা যাবার পর স্বামী আর বাধা দেয় নি। বাইরে বেরোবার অনুমতি পেয়েছে, এমনকি রাজনীতি করারও। কোন কিছুতেই আর এখন বাধা নেই।

তা দেব দ্বিজে তো অসীম ভক্তি, বেশির ভাগ সময় দেখতাম উঠোনে পায়চারী করতে করতে কি একটা ধর্মগ্রন্থ পড়ছে। মনে মনে তারিফ করতাম। যাক, তবু তো ভক্তি নিয়ে আছে। মনে দয়া মায়াও খুব। শুধু দোষ ঐ—অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে সহজ ভাবে মিশতে চায় না। পোশাক আশাক অতি অনাড়ম্বর। পরনে খদ্দরের শাড়ি, কিন্তু দামী খুব। এইটাই ওর বিশেষত্ব। খায় খুব কম, কিন্তু যা খায় খুব দামী আর সেরা জিনিসটি। একবার নাকি ইংল্যাণ্ডও পাড়ি দিয়ে এসেছে লোকসভার এক বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিদের সঙ্গে। আসার সময় নিয়ে এসেছে একটা টেলিভিশন। বললো, ঐ মানাই সার, কাজ কিছু হয় না। দিল্লী আর পাঞ্জাবের কিছু অংশ ছাড়া কোথাও তো টেলিভিশন এখনও চালু হয় নি। পড়ে আছে ঐ ভাবে ঘরের কোণে।

হোক। তবু কেতা তো দেখানো হলো! যাকে বলে ঠাট। সেটাই বা কম কি!

ছ মাস ডায়রীতে একটা অক্ষরও লিখতে পারি নি। মার্চ থেকে আগষ্ট। না একটা চিঠি। মন বসাতে পারি না যে একদম। বাইরে এমন বিশৃঙ্খলা। একবার একটা ঘটনায় আর না লিখে থাকতে পারি নি। সেটা মে মাস। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকেরা পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটালেন সেই প্রথমবার। ব্যাপারটা রসিকতার মতো আমার চোখে ঠেকলো। লোক মরছে অনাহারে, সেচের ব্যবস্থা খুব বেশি হলে মাত্র কুড়ি ভাগ গ্রামের মাটি ভেজাতে পারছে, অসুখ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে চারধার—তাকে দমন করার মতো কোন ওষুধ অব্দি যেখানে নেই, পৃথিবীর যে কোন দেশের চেয়ে ঋণের বোঝা ভারতে যখন সবচেয়ে বেশি, বেশির ভাগ গ্রামে নেই বিদ্যুৎ, নেই পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত, যে দেশে শতকরা সত্তর ভাগ মানুষ অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে আছে, সেই দেশে কিনা কোটি কোটি অর্থ ব্যয় করে পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বলা হচ্ছে বিরাট এক কীর্তি। এতে ব্যাপক জন সাধারণের যদি এক ফোঁটা উপকার হতো তবে ওদের সুরে সুর মিলিয়ে স্বচ্ছন্দে আমিও বলতাম কীর্তি। কিন্তু পারছি না যে।

জুলাই মাসে এক জমাদারণীর মুখে শুনলাম, সদ্য নাকি এক নকশাল বন্দী এসেছে, তাকে পুলিস গ্রেপ্তারের পর বুক অব্দি গরম জলের মধ্যে চুবিয়ে ধরেছিল। এক বন্দী বললো, সে নিজে সুপারকে শুনেছে ডাক্তারের ওপর খুব হম্বিতম্বি করতে—কেন ডাক্তার নকশাল বন্দীদের দামী দামী ওষুধ দিয়ে গায়ের জোর বাড়াতে সাহায্য করে; ঐ জোর দিয়ে তো ওরা সরকারের বিরুদ্ধেই

পড়বে। কাগজে পড়লাম, কলকাতার প্রেসিডেন্সী জেলে নারী বন্দীদের ওপর নির্যাতন হচ্ছে। ওখানেই তো রয়েছে কল্পনা। কলকাতার মোট তিনটে জেলে খবর পেলাম, বেয়াল্লিশ জন নকশাল বন্দী নিজেদের অবস্থা উন্নতির জন্যে প্রায় একমাস নাকি অনশন করেছে। অর্থাৎ ঘুরে ফিরে সেই একাত্তর। এই ভাবেই একটু একটু করে উত্তেজনা চরমে উঠেছিল। এখনও সেই উত্তেজনা। এর অনিবার্য পরিণতি কি, আমি জানি। তাই কাগজে যখন পড়লাম, পুলিসের সঙ্গে 'মুখোমুখি সংঘর্ষে' নকশাল বন্দীরা নিহত হয়েছে, তখন নতুন করে আর অবাক হলাম না।

আগস্টের গোড়ায় একদিন দেখি একটা বেড়ালছানা, আমাদের সব্জিক্ষেতের আড়ে খাড়ে ঘুর ঘুর করছে। নিয়ে এলাম তুলে। দড়ি দিয়ে আমার ঘরের গরাদের লোহার সঙ্গে বেঁধে রাখলাম। ভারী ইচ্ছে পোষ মানাবো। লাভও আছে পোষ মানালে। ইঁদুর মারতে পারবে। যা উৎপাত! সব্জি সব নষ্ট করে দেয়। আলু খেয়ে যায়, টমেটো খেয়ে যায়. কিছুতেই পারি না আর কায়দা করতে। দশ দিন বেঁধে রাখলাম নাগাড়ে। মা-টা রাত্তির বেলায় আসতো। বুকের দুধ খাইয়ে আবার চলে যেতো। যাওয়ার সময় বাচ্চাটার সে কী কান্না! তা মোতির ঘর তো উঠোনটার ওপাশে, কান্না শুনলেই দেখতাম চনমনিয়ে উঠতো। ওর ধারণা বেড়াল ছানাটা নাকি ডাইনী। অশুভ আত্মা বেড়ালের রূপ ধরে এসেছে। এমন ধারণার কারণও আছে। একদিন মা-টা যে ওর ঘরে ঢুকে সাবড়ে এসেছে কখানা চাপাটি, সেই রাগ কি সহজে যায়! তাছাড়া এই যে সামান্য একটা কুড়িয়ে পাওয়া জীবের প্রতি এতো দরদ দেখাই, খাবার টাবার দিই, এটা ওর ভারী অপছন্দ। একটু হিংসে হয়। দেখি মাঝে মাঝেই এসে আমার ঘরের সামনে দাঁড়ায়। কটমট করে তাকায় ছানাটার দিকে আর আমার দিকে। ভারী মুশকিলে পড়েছি।

একদিন সকালে থালা বাটি ধুয়ে আমি ফিরে আসছি, শুনি পরিত্রাহি চিৎকার। সেই ছানাটার। হাত থেকে তো বাসন আমার পড়ে গেছে। পড়ি কি মরি করে ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। দেখি মোতি, কোলে সেই ছানাটা, হাতের মুঠোয় ধরা তার গলা, হয়তো গলা টিপে মারতেই গিয়েছিল, আমি আসাতে আর হয়ে উঠলো না। আমাকে দেখেই বেড়াল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। দাঁত বের করে হাসলো। বললো, কিছু না, আদর করছিলাম। খুব সুন্দর তো দেখতে, তাই। বলে গটমট

করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো, দেখো দেখি কাণ্ড! পোষ মেনেছে বাচ্চাটা, ঐ টুকুনি দুধের শিশু—তাকে অব্দি গলা টিপে মারবার ধান্দা। মহা মুশকিল হলো দেখছি। ফের হয়তো কোনদিন সুযোগ বুঝে মারবার চেষ্টা করবে। কি করি আমি, উপায় কি!

এদিকে গরমটাও খুব চেপে পড়েছে। মোতির ধারণা, গরমের এই চোট তাও এই ডাইনীটার জন্যে। থাকবে না আর এখানে, চলে যাবে। ডাইনীর আওতা থেকে যত দূরে যাওয়া যায় মঙ্গল। তা ওর তো একটা পুঁটুলি আছে, ওর যাবতীয় সম্পত্তির আধার। কি নেই তাতে? ন্যাকড়া, চুলের ক্লিপ, পেতলের আংটি, ফিতে, পুরনো দড়ি, শুকনো ছোলা, কটা পেরেক—এক কথায় যা যেখানে যখন পাওয়া যায় সব। মাঝে মাঝেই পুঁটুলিটা বগলে করে রওনা দেয়। ফটক অব্দি গিয়ে গরাদ ধরে টানাটানি করে আর বলে, আর কতদিন আমাকে এখানে রাখবি? আর ক-ত-দিন? আমি দেশে যাবো। খুলে দে দরজা। আয়!

এরকম সাধারণতঃ দিনের বেলাই ঘটে থাকে। খানিকক্ষণ দাপাদাপি করে আবার ফিরে আসে নিজের ঘরে। মোটমাট আমরা তাতেই অভ্যস্ত। তা সেদিন দেখি ভোর সকালে গিনতি শেষ করে বড় জমাদার চলে যাচ্ছে, তার পেছন পেছন পুঁটুলি নিয়ে সে-ও রওনা দিয়েছে। সর্বনাশ! যদি কোনমতে ফটক পেরিয়ে যায়। বড় জমাদার তো আর আস্ত রাখবে না। পালাবার চেষ্টা বলে ভেবে নিয়ে তো ভীষণ মারবে! পেছন থেকে গিয়ে আমি কাপড় টেনে ধরলাম। আর যায় কোথায়, অমনি একটা গালাগালি দিয়ে ঘুরে আমার হাত ধরে মুচড়ে দিলো। অমনি ঘাড় ফিরিয়ে দেখে ফেললো বড় জমাদার। হাতে পাঁচ-হাতি লাঠি। অমন তুলে তাই দিয়ে ধপাধপ মার। দু এক ঘা খেয়েই তো মোতির হুঁশ ফিরেছে। পড়ে গেছে মাটিতে। পা চেপে ধরেছে বড় জমাদারের,—হেই বাবু, মেরো না। কিরপা করো! কিসের কৃপা! তার তো খুন চেপে গেছে তখন মাথায়। ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে শুধু এলোপাথাড়ি মার আর মার। আরো মারতো, আমরা বলে কয়ে থামালাম। সাকুল্যে কম করেও কুড়ি ঘা পড়েছে হাতে পায়ে আর পিঠের ওপর। আহা রে বেচারী, হাঁটতে পারে না। হামাগুড়ি দিয়ে কোনমতে তো ঢুকলো নিজের ঘরে, শুয়ে গোঙাতে লাগলো। সারা গায়েই বলতে গেলে কালসিটে দাগ। দু দিন সমানে পড়ে রইলো সেইভাবে। উঠে বসার শক্তিটুকুও নেই। আর শুনেছে কি জমাদারের গলার আওয়াজ, অমনি ভয়ে জড়সড়। কম্বলের আড়ালে গিয়ে দেখি মুখ লুকোয়। এমন কি একা একা

পেচ্ছাপ করতে যেতে অব্দি সাহস পায় না। সঙ্গে একজন না একজন কাউকে যেতে হয়। আমাকে কাতরভাবে বলতো, দোহাই বেটি, আর আমাকে মার খাওয়াস্ না। দোহাই তোর। আমি বলতাম, না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

বড় দুঃখ পেলাম মনে। আর নিজের ওপর রাগ। যত নষ্টের গোড়া তো আমিই। যদি না বেড়ালটাকে পুষতাম, তবে ওর এতো রাগ হতো না। রাগ না হলে বাড়ি যাবার কথাও ভাবতো না। তাহলে টেনে ধরতে হতো না ওকে এবং ফলে পাঁচ-হাতির পেটানিও খেতে হতো না। নির্দয়, নিষ্ঠুর। অমন মার কেউ কাউকে মারে। ঐ বড় জমাদার,—রাগে ঘিন ঘিন করে সেই ঘটনার পর থেকে ওর দিকে তাকাতে। এড়িয়ে চলি। হাতে একটা লাঠি দিয়েছে সরকার, ভাবে সেই লাঠি দিয়েই বিশ্ব দুনিয়াকে বশ করে রাখবে। বশ করার যে আর কোন উপায় আছে বা থাকতে পারে এ নিয়ে কখনো ভাবে না। এদের কাণ্ডজ্ঞান বলে কি কোন জিনিয আছে। জেলের নিয়ম কানুন অব্দি ঠিক ঠিক করে কেউ জানে না। কেউ কোথাও কোনো ট্রেনিং অব্দি পায় নি। মাঝে মাঝে দেখি মিলিটারী কেতায় কুচকাওয়াজ করতে। এই ওদের শিক্ষা। এদেরই হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় এতোগুলো বন্দীর দায়িত্ব। কি সুবাদে এরা এই ধরনের কাজ পায় তা নিয়ে প্রশ্ন অব্দি কেউ তোলে না। এরা এইভাবে বন্দীদের বশে রাখবে না তো কি।

এক কয়েদী গেল পনেরো দিনের প্যারোলে, বড় জমাদারের খুব পেয়ারের লোক, শুনি যাবার সময় সে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে ন হাজার টাকা। কোথায় পেলো? বাঃ পাবে না, সে যে টানা এগারো মাস অফিস-ঘরের ডিউটিতে ছিল। তাই তো এতো টাকা উপরি রোজগার করতে পেরেছে। এদিকে জমাদারণীদের মাইনে যেকালে মাত্র দুশো টাকা আর জেলারের মাইনে হাজার টাকার কম —ড্যাঙ ড্যেঙিয়ে সবার সামনে দিয়ে সে ন হাজার টাকা নিয়ে বাড়ি গেলো। অর্থাৎ পেয়ারের লোক হলে তার দুহাত ভরে রোজগার হবে, আর যারা চোখের বালি, তাদেরই যতো মুশকিল। তারা ঠিক ঠিক মতো সবসময় জেলখানার প্রচলিত নিয়মের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না যে। যেমন রমেশ। হাসপাতালে ডিউটি, প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা এসে কার কি ওষুধ দিয়েছে ডাক্তার, দিয়ে যায় এবং হাসপাতাল থেকে পাঠানো খাবার নির্দিষ্ট বন্দীকে দিয়ে যায়। সবাই রমেশকে খুব পছন্দ করে। মস্ত বড় গুণ লোকটার, ডাক্তার যাকে যতটুকু ওষুধ দেয়, এতোটুকু কার্পণ্য না করে ঠিক সেই টুকুই দিয়ে যায় তাকে। অন্যেরা দেয় না। দুটো দিয়ে চারটে নিজের পকেটে ঢুকিয়ে রাখে, পরে সেগুলো বিক্রী করে দেয় বাইরে। মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস

করে, কি জাত আপনার? বলে, জাত দিয়ে কি হবে, আমি মানুষ, এটাই আমার একমাত্র পরিচয়। একদিন এসে আমাকে হাতের ইশারায় ডেকে বললো, দিদি, আমি আর আসবো না। এবার থেকে আমাকে বাগানে কাজ করতে হবে। দেখি চোখের কোণে জল। ছাড়া পাবে ক'হপ্তার মধ্যে। মেয়াদ ওর শেষ। যেটুকু যা শিখেছে সেই জ্ঞান নিয়ে একটা ডাক্তারখানা খুলবে, এই ওর ইচ্ছে। চেয়েছিল শেষ কটা দিন হাসপাতালের কাজেই থাকতে। ইচ্ছে আর পূর্ণ হলো না।

বেশি কথা সেদিন আর বলতে পারলাম না। ডিউটি জমাদার আড় চোখে আমাদের দেখছে। চলে গেলো রমেশ। মনে খটকা লেগে রইলো—কেন শেষ কদিনের জন্য বদলী হতে হচ্ছে ওকে।

পরদিনই ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো। অন্য এক কয়েদীর মুখে সব শুনলাম। রমেশের প্রতিপক্ষ অপর কয়েকজন কয়েদী নাকি ঘুষ দিয়েছে বড় জমাদারকে, যাতে রমেশকে বদলী করে তাদের একজনকে সেখানে দেওয়া হয়। রমেশের মতো সৎ লোকের নাকি ওখানে থাকা উচিত নয়। এতে তার নিজের তো কিছু হচ্ছেই না, মাঝখান থেকে আর একজনের 'রোজগারে' বাধ সাধছে। তা সেদিন ডাক্তার আসতে ছেঁকে ধরলুম। বললাম, বলুন না আপনি, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। :বলে, জানিয়ে কিছু লাভ হলে তো? এর পেছনে বড় জমাদার জেলার দুজনেই আছে। আমি কিছু বললে আমাকেই হয়তো কোথায় না কোথায় বদলী করে দেবে। কি দরকার, যেচে নিজের বিপদ ডেকে আনবার। তখন আমরা নিজেরা ঠিক করলাম আমরাই প্রতিবাদ করবো। হাসপাতাল থেকে আসা কোন কিছু নেবো না, ফিরিয়ে দেবো। চললো সেই ভাবে কটা দিন। শেষে দেখি, কিছু যে নিই না, তা নিয়ে কর্তাদের বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা নেই। ফলে বন্ধ করলাম। তাছাড়া অন্য বিপদের আশঙ্কাও আছে। কর্তৃপক্ষ তো জানে আমি আছি যখন, এই জাতীয় প্রতিবাদের ব্যাপারে আমারই মদৎ আছে। তাতে আবার রমেশের কিছু না ক্ষতি হয়। মেয়াদ শেষ হবার মুখে হয়তো নকশাল বলে আলাদা ঘরে আটক রেখে দিলো। হাতে পায়ে বেড়ি। বরং থাক আর এগিয়ে কাজ নেই।

যেদিন ছাড়া পেয়ে চলে যায়,—এসেছিলো আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। ঝুঁকির কাজ সন্দেহ নেই। তবু না এসে পারে নি। এই তো আমাদের প্রকৃত বন্ধু! পুরো নামটা কি জানিনা, জানিনা জেল খাটতে এসেছিল কি অপরাধে। শুধু জানি, আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতো, হাসতো আমাদের কথায়, কখনো কপট রাগে ধমক দিতো। এই তো অনেক। বিশেষ করে এই জেল-

খানার চৌহদ্দির মধ্যে। ভুলেও কেউ তো এমন ব্যবহার করে না। বাইরে কি করে? জানি না। সেখানে মুক্ত মানুষ। কি করবে না করবে সেটা তারই একান্ত নিজস্ব ব্যাপার।

সোমরি নেই। রাজকুমারী নেই। এখন আমার সঙ্গে ঘোরে দুলালী আর কুর্মি। দুলালী হরিজন। জামসেদপুরের কাছে একটা তামার খনিতে করতো বাথরুম সাফাইয়ের কাজ। কাকে নাকি খুন করতে গিয়েছিল, সেই অভিযোগে গ্রেপ্তার। আসল ব্যাপারটা আলাদা। বাড়ির পাশে রাস্তায় দু দলে লেগেছিল মারপিট, ও গিয়েছিল ছাড়িয়ে দিতে। পুলিস এসে ওকে সুদ্ধ গ্রেপ্তার করে হাজতে চালান দিয়ে দেয়। বছর পঁয়ত্রিশ বয়েস, দেখতে আরো কম। সাতটি নাকি মোট সন্তান। বড় ছেলের বিয়ে হয়ে গেছে। ছোট্ট খাট্টো গড়ন, পাতলা ফিরফিরে চেহারা, খাটতে পারে খুব। আর ভারী হাসিখুশী। ওরা নাকি মোট দশ বোন। হিমসিম খেয়ে যেতে হয়েছিল বাবাকে ওদের পাত্রস্থ করতে। শেষে আর বাছ বিচারের বালাই নেই, যাকে পায়, তার কাছেই মেয়ে গছিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। দুলালীর স্বামীর তো আরেকটা বৌ আছে, সে বাজা। তাই বংশরক্ষার জন্যে আরেকবার বিয়ে করলো। বয়েসও খুব। তবে মানুষটা ভালো। দু বৌকেই সমান চোখে দেখে। আর দেখবে নাই বা কেন। দুলালী তো ঝুট ঝামেলা করে না, বরং স্বামীর সমান সমানই গতর খাটে। দুজনেই সেই তামার খনিতে চাকরী করতো। থাকতো খনিরই শ্রমিক বস্তীতে। মোটামুটি খেয়ে পরে সুখেই ছিলো। ওর বোনও কাজ করতো সেই খনিতে। পঁচিশ বছরের চাকরী তার। তবু পদোন্নতি হয়নি। বোনাস পাবার মুখে কোম্পানী বললো তোমাকে দিয়ে আর কাজ চলবে না, তুমি রাস্তা দেখো। ব্যস্, বোনের চাকরী বরবাদ।

তো 'অচ্ছুৎ' যে, ছোটবেলা থেকে তাই শুনে আসছে, আমি যখন বললাম, তার হাতের রান্না আমি খাবো, কিছুতে বিশ্বাস করতে চায় না। পরপর ক' হপ্তা দেখি উনুনের ধারে কাছেও ঘেঁষে না, দূরে দূরে থাকে। তখন কায়দা করে আমি একদিন বললাম, আজ আমার রান্নাটা করে দাও তো, আমাকে একটা দরকারী বই পড়তে হবে। তখন ইতস্ততঃ করে বসলো উনুনের সামনে। বিশ্বাস যেন তখনও পুরোপুরি হয় না। বারবার ছুটে ছুটে আসে আর জিজ্ঞেস করে, দিদি, এরপর কি করবো, এটা হয়ে গেলে তারপর? তখন ধমকে দিলাম। বললাম, দেখো বাপু, ডাকাডাকি করো না। সাতটা ছেলে মেয়ে তোমার। তাদের জন্যে রান্না করতে

করতে কি কাউকে সালিশী মানতে যেতে? যা পারো করো। আমি তা-ই খাবো। এরপর থেকে আর বলতে হয়নি। চমৎকার রান্না করে আমাকে খাওয়াতো।

একদিন রেশনে দিলো খানিকটা জল ছানা। বছরে একবার করে দেয় এবং বিশেষ কোনো উৎসব উপলক্ষ্যে। তা কি যেন তখন আমি করছিলাম, দুলালীকে বললাম, যাও আমার ভাগেরটা চেয়ে নিয়ে এসো। একটু পরে দেখি ফিরে এলো, হাত শূন্য, মুখখানা করুণ। কি ব্যাপার? না, ডিউটি জমাদার নাকি বলেছে, বল্লিস্ কি রে, টাইলার খাবে তোর হাতের ছোঁয়া? তুই তো মেথরাণী। অমনি বেরিয়ে গিয়ে দেখলাম সে নেই। কোথায় যেন গেছে। থাকলে বলতাম, খাবো না কেন? মেথরাণীর হাতের ঘুষ তোমরা খেতে পারো, সেটা বেশ মিষ্টি লাগে, আর আমি খাবার খেলে সেটা পাপ?

সারাটা জীবন পাত কুড়োনো জিনিষই খেয়েছে। কোন কিছু ফেলে না। পাতে হয়তো ফলের দুটো বীচি পড়ে রইলো বা খোসা, সব কুড়িয়ে কাড়িয়ে খেয়ে নিলো। বলে, সব আমি খেতে পারি। শুধু বিষ ছাড়া। আমার কখনো পেটের গোলমাল হয় না। পোড়া দাও, পচা দাও, বাসী দাও—সব আমি হজম করতে পারি। কিছু ফেলি না। আর এসে ইস্তক দেখি যাবতীয় নোংরা ফেলার কাজ ও অক্লেশে করে। কোন ঘেন্না নেই। পেয়ে বসেছে জমাদারণীরা। মাসিকের ন্যাকড়া ধোয়া থেকে শুরু করে পায়খানা পরিষ্কার, বমি ধোয়া—সব ওকে দিয়ে করায়। আমাকে বলতো, জানো দিদি, আমি যে সব ভদ্র বাবুদের বাড়িতে সাফাই করে দিয়ে আসতাম, আমি চলে আসার পর গঙ্গাজল ছিটিয়ে তারা বাড়ি ঘর 'পবিত্র' করে নিতো। আর সত্যি বলতে কি, এমন পয়-পরিষ্কার মেয়ে আমি খুব কম দেখেছি। কি ছিমছাম যে কাজ করে। ঘর মুছতে বলো, হাতে ছোট একটা ন্যাতা আর এক বালতি জল। মুছে দেবার পর মেঝেয় যেন নিজের মুখ দেখা যায় এরকম অবস্থা। এবং রোজ স্নান করা চাই। একদিন কোন কারণে স্নান করতে না পারলে ভীষণ রেগে যাবে, মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে থাকবে সর্বক্ষণ।

পাশাপাশি কুমি একেবারে আলাদা ধাতের। জাতে হিন্দু। সামাজিক অবস্থান মাঝামাঝি। গরীব চাষীর ঘরের মেয়ে। জাত নিয়ে ভীষণ সচেতন। আমরা তিনজন যে বসে বসে একসাথে খেতাম, মাঝে মাঝে বলতো, বাড়িতে থাকলে কখনো এইভাবে খেতে পারতাম না। ব্রাহ্মণ আর রাজপুতের রান্না ছাড়া কারো রান্না আমরা খাই না। দুলালীর সঙ্গে অন্য অনেক ব্যাপারেও তফাৎ। দুলালী

থাকে শিল্প এলাকায়, পাঁচজনের সঙ্গে মেশে, নিজে করে চাকরী। সিনেমা দেখেছে অনেকগুলো। তাতে এরোপ্লেন দেখেছে, বড় বড় বাড়ি দেখেছে, যন্ত্রপাতি দেখেছে। আর কুমি? — না গো, আমি 'সিলেমা' দেখিনি। সিনেমা কথাটা মুখ দিয়ে উচ্চারণ অব্দি করতে পারে না। জীবনে কখনো রেল লাইন দেখেনি, বাস দেখেনি। দারিদ্র্যের তাড়নায় কখনো সখনো জমিদারের মাঠে গেছে ধানকাটার কাজ করতে নয়তো সরকারী রিলিফের কাজে গিয়ে যোগ দিয়েছে। স্বভাবতঃই মন তার সঙ্কীর্ণ, অর্থাৎ চিন্তার ব্যাপ্তি কম। কিন্তু দিলদরিয়া ভাব, আর খুব বিশ্বাসী। কাজ কর্মে যদিও একটু ঢিলেঢালা, তবু যেটুকু করে খুব নিপুণ ভাবেই করে।

বড় কষ্ট কুমির জীবনে। বড় দুঃখ। পাঁচ পাঁচটা ছেলেমেয়ের মা, চারটে পেট থেকে মড়া বেরিয়েছে, একটা কোন মতে টিকে আছে। তাকে কোলে নিয়ে সেই বিশ বছর বয়েস থেকে বিধবা। বিহারের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী স্বামীর ছোট ভাই তাকে বিয়ে করেছে। তার আরো একটা বউ। খুব একটা ইচ্ছে ছিলো না তার বউ হবার, কিন্তু উপায় কি। জমিদারের কাছে দেনা রেখে মারা গেছে স্বামী, জমিদার বিধবা অবস্থায় একলা থাকলেই তুলে নিয়ে গণিকালয়ে বিক্রী করে দেবে। ঋণের টাকা উশুল করে নেবে সেই ভাবে। তার চেয়ে এই বরং ভালো। নতুন স্বামীর ঔরসে কদিনের মধ্যেই পেটে আবার এলো বাচ্চা। সতীন তো হিংসেয় জ্বলতে লাগলো। এদিকে মনে ভয়, যদি এটাও পেট থেকে মড়া বেরোয়। তাই অঙ্কুরেই বিনাশ করবার ব্যবস্থা করলো। এদিকে সতীন তো তক্কে তক্কে আছে কেমন করে ওকে হেনস্থা করা যায়। ভ্রূণ বিনাশের সংবাদটি একসময় থানায় গিয়ে জানিয়ে এলো। হত্যার দায়ে গ্রেপ্তার হলো কুমি। তা গর্ভপাতের ব্যাপারটা তো ভালো হাতে হয় নি, তাছাড়া ওষুধ বিষুধও পড়েনি ঠিক ঠিক মতো। তাই মাঝে মাঝে পেটে এখনও যন্ত্রণা হয়। কথাবার্তা যেন কেমন গোলমাল হয়ে যায়। মনটাও এমন অবস্থায় এলোমেলো হয়ে যায় তো। রাত্তির বেলা মাঝে মাঝে ঘুম থেকে ধড়মড় করে উঠে বসে, আমাকে বলে, দেখো তো দিদি, আমি বেঁচে আছি কিনা, বুকটা কেমন ধড়ফড় করে উঠলো হঠাৎ। ঘুমের মধ্যে কথা বলে। কার সঙ্গে কথা বুঝতে পারি না। একদিন বলে, আমি আর জেল থেকে যাবো না। এই আমার বেশ। গেলেই পেটে আবার বাচ্চা আসবে। আমি মরে যাবো।

বসে বসে শুনতাম ওর কাছে কত যে গল্প। গল্পের যেন একটি ভাণ্ডার। সব গ্রাম্য উপকথা। আর বলায় সে কী সুন্দর কায়দা। ভূত প্রেতে খুব বিশ্বাস।

বলতো দানোয় মেরেছে ওর পেটের বাচ্চাগুলোকে—পেটে থাকা অবস্থায় তাদের নিশ্বাস লাগতো। আর স্বামীর গায়ে বসন্ত উঠিয়ে মারলো তো তার শাশুড়ির পেত্নী। একদিন বললো, জানো আমাদের দেশে মেয়েদের পেটে কুমড়ো হয় হাতি হয়, সাপ হয়। দুলালী আর আমি তো হেসে কুল পাই না। পরে অবিশ্যি চিন্তা করে বুঝলাম, কি বলতে চাইছে। ব্যাপারটা আসলে গর্ভপাত। ফলে রক্তের একটা পিণ্ডকে কখনো দেখায় কুমড়োর মতো, কখনো হাতির মতো, কখনো বা সাপের মতো। সেটাকেই ওরা না বুঝে ঐ ভাবে ব্যক্ত করে।

একদিন তুচ্ছ একটা ঘটনা ঘটতে বুঝলাম, জাত পাতের ব্যাপারটা কী ভয়ানক। কুর্মির সঙ্গে সেদিন অন্য একটি মেয়ের ঝগড়া লেগেছে জল নেওয়া নিয়ে, দুলালী গেছে কুর্মিকে থামাতে। যত রাগ অমনি গিয়ে পড়লো দুলালীর ওপর। ভালো করতেই তো গিয়েছিল দুলালী। তার যে পরিণতি এই হবে আগে কি জানতো? তাছাড়া মিথ্যে দোষারোপ মেয়েটা একদম সহ্য করতে পারে না। রাগে কাঁপতে কাঁপতে কুর্মির গালে কষিয়ে দিলো এক থাপ্পড়। সে যা কাণ্ড! কুর্মি তো হাউ হাউ করে কাঁদতে লেগেছে। চড়টা কিন্তু এমন জোরালো নয় যে অতো কান্না আসতে পারে। সে যাকে বলে সারাদিন গুমরে গুমরে কান্না। দুলালী তো হাতে পায়ে ধরে আমাকে সাধ্য সাধনা করে,—যাও না দিদি, ওর কাছে বলে এসো আমি দোষ করেছি, আর করবো না। ক্ষমা চাইছি সে জন্যে। গেলাম। কিন্তু কান্না তবু থামে না। কারণটা পরে দুলালীই আমাকে ব্যাখ্যা করে বোঝালো। চড়টা কোন ব্যাপারই নয়। আসলে ঐ যে সে মেরেছে—অচ্ছুৎ অজাত একটা মেয়ে, এটাই যত বেদনার কারণ। বর্ণ হিন্দুকে মারবে কিনা অচ্ছুৎ! এর চেয়ে বড় অপমান আর কি থাকতে পারে? শুনে তো আমি থ! আমি যে ভাবতে শুরু করেছিলাম, তিনজন মিলে মিশে খাই আমরা, একসাথে থাকি—যাক, জাত পাতের বন্ধ বুঝি অন্ততঃ আমাদের তিনজনের মন থেকে দূর হলো। হা ভগবান, এই নাকি দূর হবার পরিচয়! এমন বদ্ধমূল হয়ে গেড়ে বসেছে এদের মনে, হাজার চেষ্টাতেও হাজার দুঃখ কষ্টেও দেখি যেতে চায় না! যাই হোক, ব্যাপারটা পরে অবিশ্যি মিটমাট হয়ে গিয়েছিল। তার জন্য যথেষ্ট ব্যাখ্যান দিতে হয়েছে দুলালীকে, যথেষ্ট গালাগাল খেতে হয়েছে, এমনকি শেষ অব্দি হরিজন হয়ে হিন্দুর গায়ে হাত তোলা যে ঘোর অন্যায় এবং পাপ, এটাও দুলালীকে মেনে নিতে হয়েছে। তবে তো মিটমাট। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, দুলালী কোন অন্যায়ই করে নি। আর পাপের তো কোন প্রশ্নই ওঠে না।

বেলীর ভাগ মেয়ে কখনো সাদা ময়দার পাউরুটি দেখে নি। জেলখানা থেকে কারুর পেট গোলমাল হলে যে রুটি দিতো, তার রঙ লালচে, টকটক স্বাদ, আর অবধারিত ভাবে আধ ভাজা। সেটাকেই এরা মনে করতো দারুণ, খুব আয়েস করে খেতো। একবার কুমির পেট নামলো। পাচ দিনের জন্যে ডাক্তার লিখে দিলো রুটি পথ্য। শুকনো শুকনো সেই রুটি। ছোলার বদলে সকালে জলখাবার হিসাবে দেওয়া হবে। দেখতাম খায় না কুমি। একফালি ন্যকড়া মুড়ে আমার ঘরের এক কোণে যত্ন করে রেখে দেয়। একদিন ধরলাম হাতে নাতে। --কি ব্যপার বলো তো, তোমাকে দেয় খেতে, তুমি নিজে উপোষ থাকো, এদিকে জমিয়ে রেখে দাও। তবে নাও কেন? বললো, কোর্টে হাজিরা দেবার কথা তো শিগগীরই, ছেলে আসবে দেখা করতে। তখন ছেলেকে দেবে। যে তারিখটা বললো তা প্রায় পনেরো দিন পর। বললাম, ততদিনে যে তোমার রুটি খটখটে শুকনো হয়ে যাবে। বললো, হোক। জলে ভিজিয়ে খেয়ে নেবে। তবু তো মুখ একটু বদলানো হবে। ভালোমন্দ কি আর খেতে পায়' এবং সত্যি সত্যি নিয়ে গেলো সঙ্গে করে কোর্টে যাবার দিন। সঙ্গে সঞ্চয় কটা টাকা। ছেলেকে দিলো সব। টাকা দিয়ে নতুন জামা কিনবে ছেলে। জামা যে একদম নেই।

বিরসিকে মনে আছে। আমার চেয়েও বেশি দিন নাগাড়ে জেল খাটছে। মুখে বয়েসের বলিরেখা, দেখতে লাগে যেন আদ্যিকালের বুড়ী। রাজকুমারী আর বিরসি এক জাত। খুব শান্ত নিরীহ গোবেচারা প্রকৃতির। কারুর সাতে পাঁচে থাকে না, এমনকি গুছিয়ে একটা কথা অব্দি বলতে পারে না। সব ব্যাপারে দেখতাম সবার পেছনে পড়ে থাকে। যে যার নিজের নিজের রান্না করে নিয়ে গেলো, ও দেখি চুপচাপ দাঁড়িয়েই আছে। সবার শেষ হলো, তখন ও গেলো। সাবান দেওয়া হবে রেশনে, যে আগে যাবে সে বড় টুকরোগুলো পাবে—সবাই হুদ্দাড় করে গিয়ে লাইনে দাঁড়ালো, ও ধীরে ধীরে গিয়ে দাঁড়ালো সবার পেছনে। কোন তাড়া নেই। কোন ভ্রুক্ষেপও নেই। স্বভাবটাই ওর এইরকম। তো স্বামীও জেলে। এই জেলেই। জমি নিয়ে গোলমালের জের। ধান কাটছিল নিজের জমির, চাষ করেছে যখন তখন অব্দি জানে ওটা ওদেরই জমি—ধান কাটতে গিয়ে শোনে জমির মালিক খোদ জমিদার, কেননা তারই হুকুমে পুলিস এসেছে তাদের ধরে নিয়ে যাবার জন্যে। সেই থেকে চারবছর টানা জেল। বিনা বিচারে বন্দী। জেলেই স্বামী মারা গেলো। খবর পেয়ে বিরসী যেন আরো চুপ মেরে গেছো আরো শান্ত। সেই সময় থেকে অনেক দিন বন্ধ থাকার পর ফের আটা দেওয়া শুরু হয়েছে। বিরসী

চাল একদম খেতো না, সব জমিয়ে রাখতো, বিক্রী করে দিতো, শুধু দু বেলা গুণে গুণে খেতো দুখানা চাপাটি। সাবানও মাখে না একদম, রান্নায় তেলও লাগায় না। তেল সাবান পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রী করে দেয়। আর অবাক কাণ্ড—কই, পয়সা তো একটাও বাজে খরচ করে না। না কেনে ভালো মন্দ খাবার, না এক জোড়া কাঁচের চুড়ি কি আলতা, শুধু দেখি জমায়। বললাম, কি ব্যাপার, এতো জমাও কেন? খাবারও তো দেখছি কমাতে কমাতে ঐটুকুতে এনে দাঁড় করিয়েছো। আগে নিজে বাঁচলে তবে না পয়সার দাম! আর সত্যি কথা বলতে কি, জিনিসপত্রের দাম যে হারে বাড়ছে, তাতে এই সামান্য জমানো পয়সা দিয়ে কি ওর সুরাহা হবে কে জানে। হয়তো ভাবছে, ছাড়া পেয়ে বাড়িতে গিয়ে মেয়েকে এই পয়সায় কিনে দেবে শাড়ী বা অন্য কিছু। মেয়েকে তো খুব ভালবাসে। কিন্তু যখন ছাড়া পাবে, কি দাম তখন এই পয়সার! বরং শাড়ী যদি কিনতে হয়, এখনই কিনে রাখা ভালো।

তখন বললো আমাকে সব। ওর সঞ্চয়ের আসল কারণ। বাড়ি গিয়ে যে অনেক খরচের ফের আছে। প্রথমতঃ স্বামীর শ্রাদ্ধ। তা তো জেলখানায় হয়ে উঠতে পারে নি। বাড়িতে গিয়ে করতে হবে, তাতে খরচ লাগবে। ওদের গাঁয়ের নিয়ম হলো, জাতীয় অনুষ্ঠানে আস্ত একটা পাঁঠা বলি দেওয়া এবং ব্রাহ্মণ ভোজন। শুধু ভোজন করালেই চলবে না, ভোজন দক্ষিণাও দিতে হবে। মোড়লকে দিতে হবে টাকা, পঞ্চায়েতকে দিতে হবে। এমনও হতে পারে, সেটা গিয়ে বুঝবে— হয়তো গোটা গাঁয়ের লোককে একদিন খাওয়াতে হবে পেট ভরে। নইলে যে জাত ফিরে পাবে না। হাজত খাটতে এলে গাঁয়ের প্রথা অনুযায়ী সবার যে জাত যায়। ফিরে না পেলে মুশকিল। কেউ মিশবে না তার সঙ্গে, কথা বলবে না, জল পাবে না; কাজ পাবে না। অর্থাৎ একঘরে। দয়া করে কেউ ঘরের বাইরে রেখে যাবে এক কলসী জল। তাই দিয়ে খাওয়া দাওয়া রান্না স্নান সব সারতে হবে। চাইতে পারবে না কোন কিছু। চাইলেও পাবে না। এমতাবস্থায় টাকা না জমিয়ে করবে কি?

সবাই সায় দিলো বিরসির কথায়। এটাই নাকি সর্বত্র প্রথা। সেইজন্যে সবাই পয়সা জমায়। জেল থেকে ফিরে তাকে তো আবার মানুষের মতো বাঁচবার চেষ্টা করতে হবে। তার জন্যে একান্ত প্রয়োজন জাত। জাত বাদ দিলে মানুষের আর রইলো কি!

আগষ্টের গোড়ায় হঠাৎ একদিন অফিস ঘরে তলব। কি ব্যাপার? না গিয়ে দেখি, আমার সঙ্গে গ্রেপ্তার আরো তিনজন বন্দী সেখানে হাজির। জামসেদপুরে বদলী হচ্ছে। শুনানী নাকি আরম্ভ হবার মুখে। সবাইকে জড়িয়ে তো একটা মূল মামলা আছেই, তার ওপর নাকি সবার বিরুদ্ধে আলাদা আলাদা একাধিক করে মামলা। ওরা বললো, আমার হয়ে লড়বার জন্যে উকিল ওরাই ঠিক করবে। সুপার বললো, চিন্তা নেই, আপনাকেও শিগগীরই যেতে হবে। হলোও তাই। চুয়াত্তরের আগষ্ট মাসের শেষ রবিবার, তারিখটা ঠিক ঠিক আমার মনে নেই—আমাকে শুনানীর জন্যে হাজারিবাগ থেকে আরেকবার জামসেদপুরে বদলী করা হলো।

হ্যাংলা

বেশ ভালো লাগছিল যেতে। যাকে বলে উপভোগ্য। একটি অল্প বয়েসী পুলিস অফিসার রয়েছে দায়িত্বে আমাকে জীপের সামনের আসনে বসতে দিলো। সে, আমি আর ড্রাইভার। গাড়ি চলছে ঝড়ের গতিতে। বর্ষার ভেজা বাতাসে ভরিয়ে নিচ্ছি বুক। মাথাটা হাল্‌কা লাগছে। বেশ চমৎকার।

পাশাপাশি ওদের কথাও এই প্রসঙ্গে না বললে নয়। আমার সহবন্দীদের কথা। এক জেল থেকে অন্য জেলে বদলী হওয়া যে ওদের কী ঝকমারি। রীতিমতো যন্ত্রণাদায়ক। জোড়ায় জোড়ায় হাতে পরায় বেড়ি; চারজন বন্দীকে একই দড়ি দিয়ে কোমর বাঁধে, ঠাসাঠাসি করে এই অবস্থায় তোলে ভ্যানে। একটাই ভ্যান, যাবতীয় নিজস্ব জিনিসপত্রও তোলে, তারপর জিনিসে বোঝাই সাধ্যের চেয়ে বেশি মানুষে বোঝাই গাড়ি নড়বড় করতে করতে রওনা দেয়। গাড়ি চড়লে যাদের মাথা ঘোরে কি যারা অসুস্থ হয়, তাদের মর্মান্তিক অবস্থা।

বীণা অপেক্ষা করছিল। শুনেছে আমি যাবো। কিন্তু দেখা হলো না। পেঁছুতে যে রাত হয়ে গেছে। বন্দীঘরে ততক্ষণে সে তালাবন্দী। ওইটুকুনি ঘরে মোট চল্লিশটি বন্দী। সঙ্গে ডজনখানেক শিশু। সে যাই হোক—পরদিন সকালে দোর খুলতেই এলো ছুটতে ছুটতে। আমার হাতে দুটো সন্দেশ গুঁজে দিলো।

দোকানের কেনা নয়। স্বাধীনতা দিবসে কোন মহাশয় যেন দিয়েছিল বন্দীদের। প্রায় পনেরো দিন পার হয়ে গেছে, ও যত্ন করে রেখে দিয়েছে। হালফিল পদোন্নতি হয়েছে ওর। এখন ও মেটেনি। তা কই। চেহারা তো ভালো হয়নি! যেন আরো রোগা আরো গম্ভীর লাগছে আগের থেকে। আমাকে হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল বন্দীদের সবার সঙ্গে দেখা করাবে বলে। দেখি সবাই মোটামুটি আগের চেয়ে খোশ মেজাজেই আছে। সেই দালালনীটা তো আর নেই, সেই শয়তানী। বলতে হবে বীণারই গুণ, অন্ততঃ আতঙ্কের ভাবটা কাটাতে পেরেছে। দেখি গুলাবী! দশ মাস পার হয়ে গেলো, এখনো যে ছাড়া পেলো না! হীরার ছেলের বয়েস তা প্রায় একবছর পুরো হতে চললো। বড্ড রোগা। আর ভীষণ দুর্বল। নাকি কদিন আগে হাম হয়ে মরতে বসেছিল।

২৮শে আগষ্ট মামলা শুরু হবে। সকাল থেকে সেজেগুজে আমি তৈরী। সরকারী উকিল হাকিমকে বলেছিল জেলখানার মধ্যে কোর্ট ঘরে মামলা চালাতে, তিনি রাজী হননি। তবে আর কি, যেতে হবে নির্ঘাৎ বাইরের কোন কোর্টে। সেই ভাবেই মন তৈরী করে বসে আছি। হঠাৎ দশটা নাগাদ আমাকে অফিস ঘরে তলব। কি ব্যাপার? না ডেপুটি হাই কমিশন অফিসের জনৈক কর্তাব্যক্তি এসেছেন। কোর্টে যাচ্ছি, মামলা শুরু হবে শুনে তো গোড়াতেই তিনি যৎপরোনাস্তি অবাক হলেন। —সে কি, এরা আপনাকে বলেনি তারিখটা পিছিয়ে তেসরা অক্টোবর হয়েছে? বললেন, আমাদের উকিলের আবেদন ক্রমে আমার কিছু সহবন্দীর বিরুদ্ধে বাকী পাঁচটা মামলার বিচারও এই মাসে হবে। এতে হাকিম সম্মতি দিয়েছেন। কেননা পাঁচ মামলার সাক্ষী তো একই লোক। তারিখটাও এক, এমনকি অভিযোগও প্রায় সব মামলার একই রকমের। মোটমাট নতুন করে পাঁচটাকে জড়িয়ে কাগজপত্র তৈরী করতে হবে তো, এবং তার জন্যে সময় দরকার। এই কারণেই মামলা তেসরা অক্টোবর অব্দি পেছিয়েছে।

এদের গড়িমসিতে আমি ততদিনে বলতে গেলে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। মিথ্যে স্তোকবাক্যেও আর অবাক হই না। কিন্তু সেদিনের মামলা পেছোবার কথা শুনে সত্যি সত্যি ভীষণ রাগ হলো। ভী-ষ-ণ। আমি যে বড় আশা নিয়ে বসেছিলাম। পাঁচ সপ্তাহ এখনও দেরী তেসরা অক্টোবর আসতে। আবার অপেক্ষা করতে হবে আমাকে এতোগুলো দিন! তা-ও কি শান্তিতে এখানে অপেক্ষা করার জো আছে! বিহারে গণ্ডগোলের পরিপ্রেক্ষিতে মিলিটারী

পুলিস দুর্লভ। নকশাল পন্থীরা যেসব জেলে আছে, নিয়ম হলো এরা নিরাপত্তার প্রয়োজনে সেই সব জেল ঘিরে রাখবে। জামসেদপুরে যেহেতু মিলিটারী নেই, আমাদের আবার ফেরত পাঠানো হবে হাজারিবাগে। তার মানে আবার করো গোছগাছ, বই পত্র আবার ঝোলায় ভরো, তোলো পুলিস ভ্যানে। আবার সেই অতোখানি পথ—যেন অসহ্য, যেন ভাবতে পারছি না। ঠিক করলাম যাবো না আমি। এখানেই থাকবো। ফেরার দিন তাই চাল চালতে হলো। জমাদারনী এসেছে নিতে, বললাম, শরীর খারাপ আমার, পেট খারাপ হয়েছে, ভীষণ যন্ত্রণা পেটে, উঠতে পারছি না। ডাক্তার এলো। কি আর করবে, পেটের মধ্যে তো ঢুকে খুঁজে দেখতে পারে না ঠিক কি বেঠিক—ওপর ওপর দেখে রায় দিলো, আমি অসুস্থ। ফলে রয়ে গেলাম। বাকীরা ফিরে গেলো হাজারিবাগ। যেন তেন প্রকারের জেদ তো আমার রক্ষা হলো। বীণাকে পেয়েছি কাছে, আর চিন্তা কি। এক'মাসে বীণার পড়াশুনোর ব্যাপারে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। খুব ধৈর্য্য তো মেয়েটার। এখন গড়গড় করে বাংলা পড়তে পারে।

কদিন পরে জনৈক সহকর্মী জমাদার বললো, পাটনা থেকে আমাদের মামলা পরিচালনার জন্যে এক নতুন সরকারী কৌসুলি পাঠানো হচ্ছে। ইনি অতি ঘোরেল লোক এবং বন্দীকে সাজা দেবার ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত। এনারই তৎপরতায় চেষ্টা চলছে যাতে আমাদের মামলা জেলখানার ভেতরকার আদালতে হয়। তাই নাকি বিজলী পাখা লাগানো হয়েছে কোর্ট ঘরে। মোটামুটি ধরে নেওয়া হয়েছে তার সৎ প্রচেষ্টা বিফলে যাবে না এবং শুনানী জেলখানার ভেতরেই অনুষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি আরো একটা প্রচেষ্টা তিনি চালাচ্ছেন। হাকিম যে কটা মামলা একই সাথে করাবার হুকুম দিয়েছেন, সেটা সে বানচাল করতে চাইছে। অর্থাৎ, একসাথে নয়, আলাদা আলাদা ভাবে প্রতিটা। তাতে দুটো সুবিধে। প্রথমতঃ শুনানী প্রলম্বিত হবে, দ্বিতীয়তঃ তার পকেটে ফি বাবদ বিস্তর নোট আসবে। জমাদার বললো, আরো নানা রকম চক্রান্ত হতে পারে, আমরা যেন সর্বদা চোখ কান খোলা রাখি। তা কদিন পরে শুনলাম, প্রথম চেষ্টাটা সফল হয় নি। হাকিমকে বলা হয়েছিল জেলখানায় মামলার কাজ চালাতে, তার জন্য সরকারী গাড়ি তাঁকে রোজ বাড়ি থেকে নিয়ে আসবে আবার পৌঁছে দিয়ে আসবে। তাতে তিনি রাজী হন নি। সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন। তবু নিরাশ হবার পাত্র নয় মহামান্য কৌসুলি মহোদয়। নতুন উদ্যমে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে শুনলাম। এমনও নাকি বলেছে, আমাদের

প্রত্যেকের যদি চরম শাস্তি হয়, তবে স্থানীয় মান্যগণ্য ব্যক্তিদের সে একদিন পেট পুরে খাইয়ে দেবে।

পাশাপাশি পালটা প্রচেষ্টাও চলছে। সেই আমার ইংল্যাণ্ডের বন্ধুরা—খুব তো হৈ চৈ শুরু করে দিয়েছে, তাই কাগজে বেরিয়েছে সব ফলাও করে। সুদূর ইংল্যাণ্ড থেকে কাগজের কয়েকজন প্রতিনিধি এসেছে আমাদের মামলার গতিপ্রকৃতি বুঝবার জন্যে। শুনলাম তারা নাকি শুনানীর সময় আদালতে হাজির থাকবার অনুমতি চেয়ে আবেদন পর্যন্ত করেছে। এদিকে অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশানালও বসে নেই। কাগজে বের করেছে তাদের নিরীক্ষা। তাদের হিসেব অনুযায়ী শুধু পশ্চিমবঙ্গের নানান জেলে নাকি রাজনৈতিক অপবাধে বন্দী আছে কমপক্ষে পনেরো থেকে বিশ হাজার মানুষ। কেন্দ্রীয় সরকাব অবিশ্যি তীব্র ভাষায় বন্দীর সংখ্যার ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছে। তাতে কিছু সুবিধে হয় নি। অ্যামনেষ্টি আন্তর্জাতিক সংস্থা। সারা পৃথিবীর কাগজে ছাপা হয়েছে খবর। সারা পৃথিবীর মানুষ ভারতে বন্দীদের দুর্দশার কথা জানতে পেয়েছে।

তেসরা অক্টোবরও যথারীতি ২৮শে আগষ্টের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো। আমি আবারও যাবার জন্যে প্রস্তুত। হাইকমিশনের সেই কর্তাব্যক্তিটিও হাজির। তারই মুখ থেকে শুনলাম, এবারও নাকি পুলিস প্রহরাব অভাবে নির্দিষ্ট দিনে আমাদেব কোর্টে যাওয়া হয়ে উঠবে না। পুলিসেব সুপার খোদ অক্ষমতার কথা জানিয়ে হাকিমকে চিঠি দিয়েছে। তিনদিন ব্যাপী সর্বাত্মক হরতালের ডাক দেওয়া হয়েছে বিহারে। হরতাল ভাঙতে পুলিস ইদানীং ভীষণ ব্যস্ত। সরকারী কৌসুলি এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘ দিনের জন্য মামলা মুলতুবী রাখতে হাকিমকে পরামর্শ দিয়েছিল, হাকিম শোনেন নি। বলেছেন, অবস্থা তিন দিন পরে স্বাভাবিক হবে এটা ধরে নিয়েই তিনি ৭ই অক্টোবর অতি অবিশ্যি আমাদের আদালতে হাজির দেখতে চান। এর যেন কোন নড়চড় না হয়।

অর্থাৎ সোমবার। সকালেই তোলা হলো আমাদের পুলিস ভ্যানে। বাইশ জন যাত্রী বইবার মতো ভ্যান। উঠলাম মোট ছত্রিশ জন। সঙ্গে পাহারাদার পুলিস বারো জন। একুনে আটচল্লিশ জন সবসমেত। দশটা থেকে বেলা আড়াইটে অব্দি বসিয়ে রাখলো সেই ভ্যানে। ভীষণ প্রচণ্ড গরম আর হাওয়া বাতাস চলাচলের উপায় বলতে গেলে নেই। এক ফাঁকে আমাদের উকিল এসে বলে গেলেন, সরকারী কৌসুলি নাকি আরেকটা দরখাস্ত দিয়েছে।

সেটা জেলা হাকিমের এজলাসে। তাতে আছে, বিচাররত হাকিমের ওপর তার আর কিছুমাত্র ভরসা নেই, মামলা অবিলম্বে তাই অন্য কোন এজলাসে বদলীর আদেশ দেওয়া হোক। হাকিমের নাকি নকশালদের ভালো করার দিকেই মন। সরকারের প্রতি দায় দায়িত্ব পালনের কিছুমাত্র সদিচ্ছাও নাকি নেই। এ জাতীয় অভিযোগের কারণ বলতে গিয়ে কয়েকটি 'ছোটখাটো' উদাহরণও সে পেশ করেছে। প্রথমতঃ, হাকিম একদিন জনৈক কিশোর বন্দীকে তার মায়ের সঙ্গে কথা বলার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তাকে বাইরে খাবার কিনে খাওয়াবার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আপত্তি করেন নি। সবই নাকি আদালতের মধ্যে সবার চোখের সামনে। দ্বিতীয়তঃ, জেলখানার মধ্যে শুনানী পরিচালনার ব্যাপারটা তিনি মেনে নেন নি। তৃতীয়তঃ দুজন বন্দী উকিল যোগাড় করতে পারে নি। তাদের তিনি স্বীয় চেষ্টায় সরকারী প্যানেল থেকে উকিল ঠিক করে দিয়েছেন। চতুর্থতঃ, ব্রিটিশ হাই কমিশনের জনৈক কর্তা-ব্যক্তির সঙ্গে তিনি একান্তে নিজের চেম্বারে সাক্ষাৎ করেছেন। এগুলো তাঁর অপরাধ। এরই ভিত্তিতে আবেদন। সুতরাং সেই আবেদনের নিষ্পত্তি চাইবাসা জেলা-আদালতে না হওয়া পর্যন্ত শুনানী অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী থাকার আদেশ ঘোষিত হলো। সকাল থেকে বলতে গেলে সারাটা দিন দুর্ভোগ করে পাঁচ মিনিটের জন্য আমরা গিয়ে হাকিমের সামনে দাঁড়ালাম।

সব অভিযোগের মধ্যে শেষেরটাই সবচেয়ে মারাত্মক। এরকম মনে হওয়া স্বাভাবিক যেন গোপনে কারচুপি করতে হাই কমিশনের কর্তাটি একান্তে হাকিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। শোনার সঙ্গে সঙ্গে তোলপাড় হলো বিদেশ দপ্তর। আসলে কর্তাটি গিয়েছিলেন হাকিমের কাছ থেকে জানতে শুনানী সঠিক কতদিন ধরে চলবে। যেটুকু সময় আলোচনা, সারাক্ষণ কিন্তু বসে ছিল কৌসুলির সাকরেদ। তখন কিছু বলে নি। পরে এই সব মিথ্যে অভিযোগ তুলে হাকিমকে হেয় করতে চাইছে।

এদিকে হাকিমও প্রচণ্ড রেগে গেছেন। মস্ত এক জবাব তৈরী করে জেলা-হাকিমের দপ্তরে পাঠিয়ে দিলেন। লিখলেন, নকশালদের প্রতি দরদে তাঁর মন কাঁদছে এমন নয়। মামলা যত দ্রুত সম্ভব তিনি শেষ করার পক্ষপাতি। এ ব্যাপারে কোন সহযোগিতা তিনি সরকারী তরফ থেকে পাননি। প্রতিটি স্তরেই তাঁকে অন্যায় কাজ করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। শেষ অব্দি লিখলেন, যে কোন হাকিম এই মামলার বিচার করতে গেলে একটা জিনিস স্পষ্ট বুঝতে পারবেন— সরকারী কৌসুলির আইন বা তার সুষ্ঠু প্রয়োগের দিকে কোন নজর নেই।

কেবল ধান্দা কি করে মামলার দিন বাড়িয়ে সরকারের ঘাড় ভেঙে দু পয়সা বেশি রোজগার করা যায়। শুনে তো আমরা অবাক। এমন অভিযোগও কোন হাকিম করতে পারেন সরকারী প্রতিনিধির বিরুদ্ধে!

শুনানী ফের মুলতুবী রইলো দুর্গাপূজা কাটিয়ে ২৭শে নভেম্বর অব্দি। এতো-দিন এখানে রাখার আমাকে দরকার কি! তাই ঠিক হলো ফের নিয়ে যাবে হাজারিবাগ। সাতাশ তারিখের আগে ফের এখানে নিয়ে আসবে। এদিকে হাই কমিশনের অফিসার বলে গেলেন, কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপ দিয়ে মামলা যাতে দ্রুত নিষ্পত্তি হয় সেই চেষ্টা তারা করবেন। পাশাপাশি জেলের এক-জন অফিসার বললো, খবরদার ভুলেও যেন দুরাশা না করি। কৌশুলি যখন মামলা বদলীর ব্যাপারে আবেদন করেছে তা গ্রাহ্য হতে বাধ্য এবং স্বভাবতঃই সে ক্ষেত্রে অনাবশ্যক দেরী হবে। গ্রাহ্য হবে এই কারণে, জেলা হাকিম এবং কৌসুলি দুজনেই ভূমিহার ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের লোক। একজন অতি অবিশ্যি অন্যজনের কথা মেনে নিয়ে সেই মতো কাজ করতে বাধ্য থাকবে।

সেই রাত্রেই জমাদার আমাকে বললো তৈরী হয়ে নিতে, হাজারিবাগ রওনা হতে হবে। রাগ যেন দপ করে জলে উঠলো। আমি যাবো না। সবই বুঝি আব্দার! যখন যা বলবে আমাদের মেনে নিতে হবে। এ সময়ে আর তর সয় না! কই, মামলার বেলায় তো তোমাদের আঠেরো মাসে বছর! যাবো না কিছুতে। তাছাড়া শরীর খারাপ। চোখটা কিছুদিন ধরে খুব ঝঞ্ঝাট করছে। রাত্রে ঠিক ঠিক মতো দেখতে পাই না। সেলাই করতে কষ্ট হয়, বই পড়লে চোখ টন টন করে। কে এখন অন্ধকারে বসে বইপত্র হাতড়িয়ে ব্যাগে ভরে! পারবো না আমি। যাবো না আজ রাত্রে। সাফ সাফ জানিয়ে দিলাম। শুয়ে পড়লাম এক কাত হয়ে। ওরা কত জন এলো, কত বললো, আমি ফিরে জবাবটুকুও দিলাম না। ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলো। বাদবাকী বন্দীদের ভ্যান থেকে নামিয়ে ঢোকালো ফের হাজতে। পরদিন সকালে উঠে রওনা হলাম।

চটজলদি চলে আসতে হয়েছে বলে উকিলের সঙ্গে আর দেখা করে আসতে পারিনি। অক্টোবর মাসের শেষাশেষি তিনি এলেন হাজারিবাগে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। কি বলবো, এতো বছরে এই প্রথম মন খুলে তাঁর সঙ্গে আর আমার সহ বন্দীদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলাম। কেউ নেই কান খাড়া করে। না কোন স্পেশাল ব্র্যাঞ্চের পুলিস, না জেলের কোন কর্মচারী। অফিস ঘর তখন যে লোকে লোকারণ্য। ভীষণ ভিড়। সব মিসা বন্দী। কর্পুরী

ঠাকুর অব্দি আছে। কদিন আগে আমার হাজতবাসের গোড়ার দিকে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলো। আপাতত: নিজেই বন্দী। অবশ্যই রাজবন্দী। হুকুম হয়ে ঘোরাফেরা করছে জমাদার আর জেল অফিসের লোক। বলা তো যায় না, দিনকাল যেরকম চলছে, এই কর্পুরী ঠাকুর হয়তো আবার মুখ্যমন্ত্রী হবে। এখন তোষামোদ না করলে—তখন !

ঝানু উকিল বটে আমাদের। অন্য রাস্তা ধরেছেন। আমাদের মামলায় সরকারের এ পর্যন্ত কত খরচ হলো তার একটা তালিকা তৈরী করেছেন। একুনে খরচ ত্রিশ সহস্র মুদ্রা। আমাদের হাজতে রাখবার খরচ এর মধ্যে ধরা নেই। এছাড়া আরো একটা ব্যাপার আছে। সরকারী কৌঁসুলি এ পর্যন্ত এসেছে মোট তিনজন। তাতেও বিস্তর গলদ। কে থাকবে কে যাবে এ ব্যাপারে পক্ষপাতিত্বের ব্যাপার আছে। সেটা তিনি যুক্তি প্রমাণ সহ হাজির করেছেন। তখনও অবিশ্যি সেই আবেদনের কোন ফয়সালা হয় নি। কি হবে আমাদের ভবিষ্যৎ, যথেষ্ট অনিশ্চিত। উকিল বললেন, দাঁড়ান না, যে সব প্রমাণ যোগাড় করেছি, কোন চিন্তা নেই। সব ঘায়েল করে দেবো। রায় আমাদের পক্ষেই হবে।

মার্চে সর্বব্যাপী আন্দোলন শুরু হবার পর থেকে আন্দোলনের নেতৃত্ব চলে গেছে জয়প্রকাশ নারাযণের হাতে। মানুষটা কট্টর গান্ধীবাদী আর আগাপাস্তলা কমুনিষ্ট বিরোধী। একসময় সোস্যালিষ্ট পার্টি করতেন। আন্দোলন যতো তীব্র হয়, দেখি নেতৃত্ব চলে যাচ্ছে দক্ষিণপন্থী দলগুলোর হাতে। মূল দাবী তাদের একটি—বিধানসভা ভেঙে দাও, লোকসভায় নতুন করে নির্বাচন করো। কি লাভ হবে তাতে ? অবস্থার কি এতোটুকু পরিবর্তন হবে ? ক্ষমতায় এসে বসবে নতুন একদল দুর্নীতিপরায়ণ মন্ত্রী। তাতে এতোটুকু সুরাহা হবে না। যদিও বিপুল সংখ্যক মানুষ প্রতিদিন এই আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে, তবু বলবো, এর সেই আগের তেজ আর নেই, যেন মান অনেকখানি নেমে গেছে। এটাই স্বাভাবিক। কেননা অনেকটা স্বতস্ফূর্ত ধরনের আন্দোলন। দীর্ঘস্থায়ী কোন কর্মসূচী নেই যাতে করে অবস্থার প্রকৃত পরিবর্তন হতে পারে। আক্রমণ পালটা আক্রমণ—অনেকটা এইরকমই ব্যাপার। জয়প্রকাশ এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য হিসেবে দুটি মূল কথা বলেছেন। এক হলো সর্বাত্মক আন্দোলন ; দুই শ্রেণীহীন গণতন্ত্র। আমার মনে হয় দুটোই অবাস্তব এবং অসম্ভব।

জয়প্রকাশের অগ্রগামী নারী বন্দীদের স্থান হয়েছে আমাদের মেয়ে মহলে। খুব ভিড়। বিকেল হলে সবাই ওরা গান গায়, নাচে। লোক নৃত্য আর

লোক গীতি। গ্রামীণ জীবন নিয়ে গান। গ্রামের কি কি সুন্দর, অনাড়ম্বর মানুষের জীবন—এই হলো গানের বিষয়বস্তু। ওরা বলতে চায়, গ্রামকে শহরের ছোঁয়াচ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলে ভারতের সব সমস্তার সমাধান হবে। থাকেও নিজেরা ভারী সরল অনাড়ম্বর ভাবে। মধ্যবিত্ত অন্য যে সব বন্দী দেখেছি, এরা তাদের থেকে আলাদা। এরা নিজেদের কাজ নিজের হাতেই করে। অনেকে ভিন্ন জাতে বিয়ে করেছে। একটা জিনিস এদের দেখে স্পষ্ট মালুম হয়। আর যাই হোক, এরা মনে প্রাণে দুঃখী মানুষের কল্যাণ চায়। নিজের ভালোমন্দের চেয়ে সেটাকেই বেশি করে প্রাধান্য দিয়ে দেখে।

এই প্রসঙ্গে দাদীর কথা খুব মনে পড়ছে—আমাদের এজমালী ঠাকুমা। থুথ্‌ড়ে বুড়ী, একটাও দাঁত নেই, আর খুব গরীব, জাতে বামুন। পারিবারিক পেশা চাষবাস। দাদী আমার একটা মস্ত ভুল ভেঙে দিলো। এর আগে পর্যন্ত দারিদ্র্যকে আমি জাতের নিরিখে বিচার করতাম। আমি ভাবতাম অন্ত্যজ হরিজন এবং অচ্ছুৎ সম্প্রদায়ের মানুষই চরম দরিদ্র। তাই বা মিলছে কই? তাহলে দাদী বামুন হয়েও দরিদ্র হলো কি করে? ভারী দিলখোলা স্বভাব আর ভীষণ মিশুকে। বসে বসে নানান গল্প করতো। বলতো কি করে বন্দী হলো। জানতো না তো নিজে কিছু। জমিদার বললো একদিন মিছিল করে আন্দোলনের ভিড়ে গিয়ে জড় হতে, তাই গেলো। ছেলেটাও গেলো। ফেলতে পারে না যে জমিদারের কথা। একে বিস্তর ধার, তায় জমিদার যদি আপত্তি দেখে চটে যায়! ছেলে গিয়েছিলো রেল লাইন অবরোধ করতে।

ঐ এক ছেলে আর এক মেয়েকে বুকে নিয়েই বিধবা। জমিজমা নেই। ছেলে করে রেলে চাকরী, মজুরের কাজ, মাইনে মাসে একশো পাঁচ টাকা। তাতে কি হয়! চালই তো এক কিলোর দাম চার টাকা। চার চারটে পেট ঐ আয়ে চলে? ছেলে, ছেলের বৌ, মেয়ে আর দাদী। তার ওপর মাসে মাসে জমিদারের ঋণ শোধের ব্যাপারটা তো আছেই। বোনের বিয়ের সময় জমিদারের কাছ থেকে দেনা করতে হয়েছিল। বোনকে জামাই বাড়িতে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। তা বামুন বলে কথা—তাদের তো আর মাঠে ঘাটে পাঁচজন নীচু জাতের মানুষের মতো জন খাটা পোষায় না। কি বলবে লোকে! এদিকে দাদীর খিদে আর মেটে না। সারাদিন খিদের জ্বালা পেটে নিয়ে শুধু ঘুর ঘুর করে বেড়ায়।

দাদী বলতো, জানো, সারাদিন খিদে ভুলে থাকার জন্তে হৈ চৈ করে হাসিখুশী নিয়ে থাকতাম। যখন আর পারতাম না সহ্য করতে, এক গ্লাস জলে একটু নুন

মিশিয়ে ঢকঢক করে খেয়ে নিতাম। সারাদিনে তো খাওয়া দাওয়ার বালাই নেই। শুধু রাত্রে একবেলা আহার। চাপাটি, মুশুর ডাল, নয় তো একটু তরকারী। চারখানা চাপটি মোট বানাতাম। ছেলে খেতো দুখানা, ছেলে বৌ আর মেয়ে একখানা করে। খাটে পেটে তো ছেলেটা, তাই দুখানা দিতাম। আমার ভাগে ঠন ঠন। তিনজনের ভাগ থেকে একটু একটু করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতাম। আর কী খাটুনি ছেলের! হপ্তায় সাত দিনে সাত দিন কাজ। বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন মোট। কি করবে, উপায় যে নেই। তা সবাই ছাড়া পেয়ে চলে গেলো। দাদীকে কেউ আর নিয়ে যায় না। শেষে অনেক দিন পরে জমিদারের অনুগ্রহে জামিনের ব্যবস্থা হলো। ইতিমধ্যে জমিদারের কাছে দেনার পরিমাণ বেড়েছে। কি করবে—ছেলে হাজতে, মা হাজতে বৌকে আর বোনকে খেয়ে তো বাঁচতে হবে।

নভেম্বর মাসে ফিরে এলেন হাই কমিশনের সেই কর্তা ব্যক্তিটি। সেই যে ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন ছুটি কাটাতে। দেখা করতে এলেন। বাবা মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছেন। আমার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন এটা ওটা নানান জিনিস। মিষ্টি, চকোলেট, বিস্কুট, মাখন আরো কত কি। সব চেয়ে ভালো লাগলো ভেতরের জামা পাঠিয়েছেন দেখে। এত দরকার বোধ করছিলাম। তা বিস্কুট টিস্কুট তো ভাগাভাগি করে দুদিনের মধ্যেই শেষ। সবাই যে খেয়ে নিলো তক্ষুনি তক্ষুনি, তা নয়। কেউ রেখে দিলো লুকিয়ে, পরে খাবে বলে। যারা খেলো, সবার পেট ছাড়লো। ভালো খাবার যে। পোড়া পেটে ভালো মন্দ কিছু কি সহ্য হয়।

নভেম্বরের শেষে জামসেদপুরে ফের বদলী করা হলো। মামলা স্থানান্তরের ব্যাপারে ফয়সালা এখনো হয়নি। ফলে দীর্ঘদিনের জন্য বিচার বন্ধ। তারিখ পড়লো ১লা ফেব্রুয়ারী। ফলে অনিবার্য ভাবে আবারও আমাকে হাজারিবাগ যেতে হবে। আমি তো ধরেই বসে আছি—যে কোন মুহূর্তে জমাদার এসে বলবে, চলুন, অমনি রওনা হবো। বই পত্র ঝোলায় ভরে আমি তৈরী। ওমা, দেখি জমাদার আর আসে না। একদিন গেলো, দুদিন গেলো, তিনদিন গেলো তার আর আসার নাম নেই। কি ব্যাপার! তবে কি রাখবে এবার এখানেই? চতুর্থ দিনে কারণটা বুঝতে পারলাম। পুলিস ভ্যানের অভাব। সব নাকি বিকল হয়ে আছে। এটা একটা নৈমিত্তিক ব্যাপারের পর্যায়ে পড়ে। একদিন কোর্টে পৌঁছে গেলো গাড়ি বিকল হয়ে, তখন সেনা বিভাগের একটা লরীতে করে আমাদের হাজতে ফেরত নিয়ে আসা হলো। জামসেদপুর থেকে

হাজারিবাগ ফিরতে যে আমাদের এতো দেরী লাগতো তার কারণ এই গাড়ি খারাপ। পথে প্রায় প্রতিবারই একটা না একটা গাড়ি বিকল। তাকে সারিয়ে চালু করা অব্দি বাকীগুলোকে ঠায় বসে থাকা। তাই তো দেরী। একদিন এক ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, আচ্ছা বলুন তো আপনাদের গাড়ি কেন এতো বিকল হয়? বললো, হবে না কেন। যে গ্যারেজে সারাতে নিয়ে যায়, তাদের তো পয়সা দেয় না। তাই যা খুশী করে সারিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে এমনও হয়ে থাকে, গ্যারেজে পুলিস ভ্যান ঢুকছে দেখে কর্মচারিরা ছুটি করে বাড়ি চলে যায়। কি হবে অহেতুক বেগার খেটে!

খ্রীষ্টমাসের আগেই হাজারিবাগ ফিরে এলাম। দুদিন পরে ব্রিটিশ কনসাল এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। ভারী দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে দেখা করবার জন্যে। পাটনার পুলিসের আই. জি-র কাছে গিয়েছিলেন প্রথমে। তিনি বলেছেন, আমি জামসেদপুরে আছি। গিয়েছেন তারপরে জামসেদপুর। সেখানে গিয়ে শোনেন, আমি হাজারিবাগে চলে এসেছি। তখন হাজারিবাগে এসে আমার দেখা পান। তবুও বলবো, গাড়িতে করে যাতায়াত করেছেন, তাই দুর্ভোগ তুলনায় অনেক কম। অমলেন্দুর পরিবারের লোকজনকে তো এর চেয়ে অনেক বেশি হ্যাপা পোয়াতে হয়। জামসেদপুরে কলকাতা থেকে যাতায়াত করা অনেক সোজা। কিন্তু গিয়ে যদি শোনেন সেখানে আমি নেই, তখন ঐখান থেকে হাজারিবাগে আসতে শরীরে কালঘাম ছুটে যায়। অন্যান্য বন্দীর আত্মীয় স্বজন তো এই কারণে দেখাই করে উঠতে পারে না। খরচের প্রশ্নটাও কম নয়। এদিকে এই অনবরত এক জেল থেকে আরেক জেলে বদলী—এজন্য চিঠিপত্রও গোলমাল হয়। পাই না অনেক চিঠি। যদিও নিয়ম, চিঠি যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া।

তেসরা জানুয়ারী ১৯৭৫। অফিসের এক কেরানীর মুখে শুনলাম, কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী এল এন মিশ্র সমস্তিপুরে অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে মারা গেছে। অনেকেই খবরটা শুনলো, দেখি কারুর মধ্যেই তেমন একটা হা হুতাশের ভাব নেই। দুঃখ পর্যন্ত নেই। দুঃখ আসবে কি করে! এই মিশ্রের আমলেই না রেল ধর্মঘটে কর্মীদের ওপর অকথ্য নির্যাতন হলো। কত মানুষের চাকরী গেলো, কতজন হলো গৃহ হারা। এদিকে হত্যার জের এসে পড়লো আমাদের ওপর। সব ব্যাপারেই তো আমরা শিখণ্ডী। কাগজে পড়লাম, যে দিন মিশ্র মারা যায়, সেদিন নাকি ষ্টেশনে তাকে ঘিরে সাতশো সাদা পোশাকের

পুলিস ছিলো। পুলিসের অকর্মণ্যতার অভিযোগ আনা হয়েছে। পুলিস বললো, তবে রে! আমরা অকর্মণ্য? তবে ভাখ! বলেই জেলখানা তল্লাসী। নাকি আর একটা পলায়নের চক্রান্তের খবর পাওয়া গেছে। বন্দুক বোমা নাকি চক্রান্তকারীরা লুকিয়ে রেখেছে। কিছুই পাওয়া গেলো না। পাবে কি করে, আসলে গোটা ব্যাপারটাই তো ওদের স্বকপোলকল্পিত। নিজের দোষ ঢাকার জন্য পিঠ বাঁচাবার জন্য এরকম অনেক কিছু এখন ওদের বলতে হবে। এটা তারই 'শুভ' পদক্ষেপ।

সে বছরই গোড়ার দিকে একটি ভিখিরীর ছেলে এলো জেলে। বলতে গেলে শিশু। ছান্দওয়ারা অস্থায়ী জেলের বাইরে নাকি হামাগুড়ি দিচ্ছিল আর এটা ওটা খুঁটে খাচ্ছিল। দেখবার কেউ নেই। সামনে একটা ভিক্ষের বাটি। কয়েকজন কয়েদীর নজরে পড়তে তারা ভেতরে নিয়ে আসে। সুপারকে জবরদস্তি করে বলে, একে রাখতে হবে। অন্ততঃ তাহলে আর কিছু না হোক—অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে তো বাঁচবে। সুপার রাজী না হয়ে পারে নি। পাঠিয়ে দিয়েছে আমাদের এখানে। তা এলো যখন, কোনমতে টলমল করে হাঁটতে পারে। তা-ও মাঝে মাঝে তাল ঠিক রাখতে পারে না, পড়ে যায়। মস্ত বড় পেটটা ওর শরীরের আসল বাধা। মাথাটাও বড়। হাত পা প্যাকাটির মতো সরু। খাদ্যাভাব—সেটাই মূল কারণ। কদিন নিয়ম মতো পেট পোরা খাবার পেয়ে দেখি একটু একটু করে চেহারার সামঞ্জস্য হচ্ছে। দাঁতে হলুদ ছোপ। দুটো দুধের দাঁতও আছে। খুব বেশি হলে ছয় কি সাত বছর বয়েস। দাঁতগুলো আমরাই ঘয়ে ঘষে পরিষ্কার করলাম। কথা বলতে পারে না তখনও। কথা তো এ অবধি কেউ ওর সঙ্গে বলে নি। না বললে না শুনলে শিখবে কেমন করে? এদিকে বোঝে কিন্তু সব। আর ঐ এক হাত পাতা রোগ। খাবার দেখলেই অমনি ডান হাতখানা বাড়িয়ে দেয়। যেন খাবার দেখলেই খেতে হবে। তার সময় নেই। পেট বোঝাই কিনা তা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই, মোটমাট দেখেছি খাবার খেতে হবে। এমনকি ডাক্তার যে ওষুধ দিতো সেগুলোও পটাপট খেয়ে নিতো। তেঁতো হোক টক হোক—হোক গে, কি যায় আসে, ওগুলোও তো একরকম খাবার!

অবাক হয়ে দেখতাম ওর মতিগতি। বেঁচে থাকার জন্যে সংগ্রাম করতে হয়েছে তো এ অব্দি, এখনও করছে—তাইতে হয়েছে বড় এক রোখা, বড্ড একগুঁয়ে আর অবাধ্য প্রকৃতির। অবাধ্যতা অবিশ্যি সব সময়ের জন্যে নয়, কখনো কখনো, মনের অপছন্দ কোন কাজ হলে। মাঝে মাঝে ছুটে এসে

হুড়মুড় করে আমাদের কোলে উঠে বসতো। ভালবাসা চায় আর কি। পারিনি তো এপর্যন্ত কোনদিন। আদর করতাম যখন, আমার চোখ জলে ভিজে উঠতো। আহারে বাছা! একটু আদরের কাঙাল হয়ে ঘুরে বেড়াস। মায়ের খোঁজ নেই, বাবার খোঁজ নেই—জেলে এসে কিনা তোকে বাঁচবার পথ খুঁজে নিতে হচ্ছে! শেখালাম একটু একটু করে সব। কি করে দাঁত মাজতে হয়, কি করে নাইতে হয়, পায়খানা পেলে যেতে হয় পায়খানায়, পেচ্ছাপ পেলে বাথরুমে, কি করে পায়খানা করে নিজের হাতে ধোয়াধুয়ি করে আসতে হয়—সব। সবাই নাম দিয়েছিল হ্যাংলা। খাবার দেখলে খুব কিনা লোভ, তাই। নাম দেওয়ায় পেছনে রাগ তাপ নেই। এটা এ দেশে আদরের ডাক। প্রকাশের মাকে আদর করেই ডাকে 'খোঁড়া' বলে। ঐ যে, একটা পা তার খোঁড়া। মোতিকে বলে 'পাগলী'। মাথাটা যে ঠিক নেই ওর। তা আমি ছেলেটাকে নাম দিয়েছিলাম 'মন্ত্রী মশাই'। মন্ত্রী মানেই নধর ভুঁড়ির মালিক ওর পেটটাও বড়। অবিশ্যি গায়েগতরে তারা দশাসই। ও সে হিসেবে প্যাংলা। হাড় জিরজিরে চেহারা। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। দু একজন বন্দী বলে ছাড়া পাওয়ার সময় ওকে সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে যাবে। নেবেই তো! বিনে মাইনের কাজের লোক কে না চায়। তবে একটাই সান্ত্বনা—তাতে ওর খাওয়া পরার দুশ্চিন্তাটা অন্ততঃ মিটবে।

এর পরের বার কোর্ট হাজিরা দেবার জন্যে জামসেদপুর যাবার পথে একটা দুর্ঘটনা চোখের সামনেই প্রায় ঘটতে দেখলাম। আমাদের পাশ কাটিয়ে তীব্র বেগে বেরিয়ে যাবার সময় একটা গাড়ি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো এক সাইকেল আরোহীকে। গাড়িটার দেখি থামবার কোন লক্ষণ নেই। এদিকে আমাদের জীপে বসা এক ছোকরা পুলিস অফিসার। হাজার হোক, চোখের সামনে দেখা ঘটনা—মুখ বুজে হাত পা গুটিয়ে তো আর বসে থাকতে পারে না। ড্রাইভারকে বললো তাড়াতাড়ি গিয়ে গাড়িটার সামনে ব্রেক কষে দাঁড়াতে। হলো তাই। গাড়ি দাঁড়াতে বাধ্য হলো। আমরা নামলাম। গাড়ির আরোহীরাও নামলো। চারটি যুবক, দেখে বোঝা যায় বিস্তর পয়সা কড়ির মালিক, চোখে কালো চশমা, লম্বা চওড়া চেহারা। বললো, কি ব্যাপার? গাড়ি দাঁড় করালেন কেন? অফিসার বললো, দাঁড় করাবো না? সাইকেলটাকে আপনারা ধাক্কা মেরে চলে এলেন, আমাদের চোখের সামনে। বললো, ধাক্কা মেরেছি? আমরা? ও তো নিজের থেকে পড়ে গেছে। বলে অফিসারের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো। অফিসার একটু বুঝে নিয়ে বললো, ও হ্যাঁ

হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। পড়েই গিয়েছে। নির্ঘাৎ তাই। হয়তো নেশাটেশা করেছিল। আর এদিককার লোকেদের বাপু এই এক ঝঞ্ঝাট! বড্ড নেশা করে। বাকী পুলিসও তাতে সায় দিলো। ছাড়া পেয়ে চলে গেলো গাড়ি। আমি তখন হাঁ করে বসে। হায়রে! এতোখানি রক্ত ঝরলো, এতো তার কষ্ট—সেই অবস্থায় এরা বেমালুম কিনা বলছে লোকটা পড়ে গেছে! রইলোও পড়ে একই ভাবে। হয়তো মারাও যেতে পারে। তাতে আর দোষ কি। গরীব মানুষ যদিবা মরে নয় তো মূর্চ্ছা যায়—সেটা তার নিজস্ব ব্যাপার। তাছাড়া যে চারজনকে কেন্দ্র করে ঘটনা, পোশাক আশাক দেখে তাদের কি আর গরীব বলে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে! তারা ধনী। তারা যখন বলেছে এটা নির্ঘাৎ পতন, মানতেই হবে। কে জানে, বলা তো যায় না, এদের মধ্যে কেউ হয় তো কালক্রমে মন্ত্রী বনে যাবে। তখন অফিসারের ওপর পড়বে রাগ। অর্থাৎ একহাত নেবে। কি দরকার উপায় থাকতে অহেতুক নিজেকে অসুবিধেয় ফেলার।

সবারও সরকারী কৌসুলির চেষ্টা মাঠে মারা গেছে। পারে নি পালটাতে হাকিমকে। অথচ মামলার অগ্রগতিরও কোন লক্ষণ নেই। কেননা সেবকটা মামলা জুড়ে একসাথে চালাবার বিরুদ্ধে সেই যে আবেদন, পাটনা হাইকোর্টে সেটার এখনও নিষ্পত্তি হয় নি। দশ দিন আমরা জামসেদপুরে থাকার অনুমতি পেয়েছি। ইত্যবসরে আমাদের উকিল এবং বিহারস্থ লিগাল-এড কমিটির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবারও অনুমতি পাওয়া গেছে। কমিটি বলেছে মামলা পরিচালনার ব্যাপারে যাবতীয় খরচ তারা যোগাবে। সে এক মস্ত সহযোগিতা। কমিটির সাহায্য না পেলে এই দীর্ঘ বিলম্বিত মামলার এতো খরচ আমাদের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হতো না। একটা আশঙ্কা মনে সর্বদা পাক খেয়ে বেড়াতো। কে জানে, হয়তো আমাদের মামলা পরিচালনার অপরাধে আমাদের উকিল উদয় মিশ্র আর কাজই পাবে না। কেউ হয়তো তাকে আর ডাকবে না। বা ডাকলেও, যেহেতু এতো দিন ধরে চলছে আমাদের মামলা, এতো দিকে তাকে নজর রাখতে হচ্ছে—বলা যায় না, এসব ফেলে তিনি নিজেও সেই মামলা হাতে নিতে পারবেন কিনা।

পার হয়ে গেলো দশ দিন। আমাদের আবার হাজারিবাগ ফেরার পালা। যথারীতি নিয়ে যাবার গাড়ি নেই। একটা সরকারী বাস যোগাড় করা হলো। গাড়িতে ওঠার সময় দেখি, এক বৃদ্ধা হাজতের ফটকের একধারে বসে বসে

কাঁদছেন। বাঙালী। সকাল থেকে বসে আছেন এই এতোক্ষণ, এসেছেন সুদূর কলকাতা থেকে, ছেলের সঙ্গে হয়েছে দেখা, তবে সে বলতে গেলে কয়েক লহমার দজন্য। ছেলেকে বাসে উঠে রওনা হতে হবে যে। তার জন্যে সাজগোজ দরকার। অর্থাৎ পায়ে বেড়ি। তাই দেখে তো মহিলার আকুল কান্না। বাসের জানলা দিয়ে ছেলে চিৎকার করে মাকে বললো, মা, তোমরা পরো হাতে বালা, ওরা দিয়েছে আমাদের পায়েব গয়না। এতে দুঃখ কিসের! মাকে স্তোক দিয়ে খুশী করতে চাইছে আর কি। ভালো লাগলো। আমার সহবন্দীরা সকলেই প্রায় এই রকম। হাসিখুশী ভাব। নিজের কষ্টকে দেখে তারা হেলা ভরে। আদালতে হাই কমিশন অফিসের কর্তারাও এই মনোভাব দেখে অবাক হয়ে গেছে। আমাকে বলেছে পরে এ সম্বন্ধে। গর্বে অহঙ্কারে ভরে গেছে আমার বুক।

ভারী চমৎকার লেগেছিল সেদিন ফিরে যাওয়ার সময়। আমার মনে থাকবে। সামনের দিকেব আসনে বসেছি। দেখতে পাচ্ছি সব দু ধারের। ছোটনাগপুরের সেই গ্রাম্য পরিবেশ। ঐ তো পাহাড়! ঐ তার মাঝখান দিয়ে রূপোলী ফিতের মতো টানা একটা রাস্তা। পুরনো স্মৃতি মনে পড়ছে। আমার মুক্ত দিনেব স্মৃতি। আমার চোখ বাখছি কাঁচের ফ্রেমে। চোখে পড়ছে মাঠ—অনাবিল উদার উন্মুক্ত ধু ধু করা মাঠ। ধান কাটা শেষ। পড়ে আছে আকাশের নীচে। কবে বৃষ্টি হবে তার প্রতীক্ষা। তখন আবার বীজ বসানো হবে। এটা ফেব্রুয়ারী মাস। যেমন গরম তেমনি ধুলো। গরমে খটখট করছে চারধার। নদী পেরোলাম কয়েকটা। গ্রীষ্মকাল এখনও শুরু হয়নি, এরই মধ্যে নদীর জল শুকিয়ে সরু একটা ফিতের মতো। বহু কষ্টে যেন নিজের অস্তিত্বটুকু জিইয়ে রেখেছে। ছেলেরা মাছ ধরছে জলে। আর কী তাপ! কটমট করে তাকিয়ে আছে সূর্য। আকাশ নির্মেঘ। মাঝে মাঝে গ্রাম। মাটির দেয়াল। তাতে খড়ের চালা। কেউ বলতে পারে কত দুঃখ কত সহ্য লুকিয়ে আছে এই দেয়ালগুলোর আড়ালে! এদের কাছে বেঁচে থাকাটা অনেক মূল্যবান প্রশ্ন। আবার ইটের ঘর বাড়িও নজরে পড়ছে। সংখ্যায় তুলনায় অনেক কম। এর আড়ালে লুকিয়ে আছে অনেক গৃহ বধূ। আমি জানি এরা কখনো বাইরে বেরোয় না, সামনের এই মাঠটা দেখতে কিরকম জানে না এটা আরেক চেহারা। সেনা ছাউনি নজরে পড়ছে মাঝে মাঝে। ভারী ভারী ট্রাক, রাইফেল, কাঁটা তারের বেড়া। হবেই তো! ভারতও যে বিংশ শতাব্দীর যুগে এসে পৌঁছেছে। এগুলো তাকে রাখতেই হবে। শহরের মধ্যে

দিয়েও মাঝে মাঝে যেতে হচ্ছে। সেখানে দোকান বাজার থিকথিক করছে মানুষ, রাস্তার দুপাশে বড় বড় কারখানা, মোটর গ্যারেজ—কে বলবে, এই বিহার এখনও বেশির ভাগ দিক থেকে মধ্যযুগে পড়ে আছে! হাজারিবাগে পাহাড় আসতে আরো অনেক দেরী। মস্ত একটা উপত্যকা চোখে পড়ছে। আর জঙ্গল, আর কয়লা খনি এলাকা। তার একধারে পাহাড়। ইচ্ছে করছে ছুটে গিয়ে একটা গাছ ছুঁয়ে দিই। উপায় নেই। ঐ গাছ আর আমার মাঝখানে একঝাঁক উদ্যত রাইফেল বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তালাবন্দীর আগেই হাজারিবাগ জেলে এসে পৌঁছলাম। সবার সঙ্গে দেখা হলো। সে কী আনন্দ সবার! যেন এগারো দিন নয়, এগারোটা বছর ছিলাম বাইরে, তারপর ফিরলাম। তা এতো আনন্দ কি আর সহ্য হয়! দুঃখের একটা খবরও এতোদিনে তৈরী হয়েছে। আমাকে বললো। বেড়াল ছানাটা নাকি পুরুষ মহলের পাতকুয়োয় পড়ে মারা গেছে। আমি কোনদিন ওকে রেখে কোথাও যাই না। এই প্রথম গিয়েছিলাম। ফিরে এসে আর দেখতে পেলাম না।

নতুন একজন মেথর বহাল হয়েছে আমাদের মহলে। বিচারাধীন বন্দী। নির্ভীক প্রকৃতির। একটু যেন বেপরোয়া। আমার বেশ ভালো লাগে। বললো, ওরা নাকি কাজের জন্য পঁচিশ পয়সা করে মজুরী পায়। সেটা হাতে দেয় না। অফিসে জমা হয়। নিয়ম হলো বদলী হবার সময় বা ছাড়া পেয়ে চলে যাবার সময় দিয়ে দেবে। তা আরেকজন বন্দী, সেও করে মেথরের কাজ, কদিন আগে কোন্ জেলে যেন বদলী হলো। যাবার সময় টাকা চাইলো। জেলার বলে কিনা দেবো না, কাগজপত্র ঠিকঠাক নেই। প্রতিবাদ করতে বলে—কি করবি তুই আমার? দেবো না। যা পারিস করগে যা। মোদ্দা, সবটাই পকেটস্থ করেছে। এদিকে বন্দীটি ভেবে রেখেছিলো ঐ টাকা দিয়ে সে উকিলের ফি দেবে।

অথচ এসব অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে কথা বললেও আর রক্ষা নেই। ফল কঠিন শাস্তি ভোগ। এই তো সেদিন। গিয়েছিল ঝাড়ুদার বন্দীটি আদালতে, সঙ্গে অন্য কয়েকজন বন্দী আর কজন নকশাল। সেখানে লক আপে দুর্নীতি আর বিচার ব্যবস্থার অপশাসনের বিরুদ্ধে নাকি সবাই শ্লোগান দেয়। পরদিন সকালে দেখি নতুন এক বন্দী এসেছে নর্দমা ধুতে।—কি ব্যাপার? ও গেলো কোথায়? বলে, ও অন্যায় করেছে। —কি অন্যায়? কিছুই আর বলে না। বারবার প্রশ্ন করে জানতে পারলাম, ও নাকি আর এক বন্দীর

পয়সা চুরি করেছিল বলে ওকে একলা ঘরে বন্দী রাখা হয়েছে। ব্যাপারটা সাজানো। একটা বাচ্চাও বুঝতে পারবে। আসলে আদালতে গিয়ে দিয়েছিল শ্লোগান, এ তারই শাস্তি।

সুপার ইদানীং কালে ভদ্রে আসে। দেখাই পাই না বলতে গেলে। কারণ কি? নাকি অবসরের সময় কাছিয়ে এসেছে, তাই ব্যস্ততা। কিসের ব্যস্ততা? বাঃ, অবসর যাতে ঠেকানো যায়, যাতে আরো কিছুদিন থাকা যায় এই লোভনীয় পদে, অন্ততঃ আর একটা বছর—তার চেষ্টা করতে হবে না! তার জন্য তেল দিতে হবে না ওপরঅলাদের! যাদের পদোন্নতি হবে বলে ঠিকঠাক, তারা ইতিমধ্যে প্রতিবাদ জানিয়ে বসে আছে। তা অবসরের আগে তো ছুটি পাওনা হয়। সেই ছুটিকালীন নতুন ব্যক্তিটি এসে কাজে যোগ দেয়। এটাই প্রথা। সেই ছুটি চলছে সুপারের, অথচ নতুন কেউ এসে যোগদান করে নি। খালি পড়ে আছে চেয়ারটা। সুপারের চাকরীর মেয়াদ আর একবছব বাড়ানো হবে কিনা ঠিক হয়নি বলে। সাকুল্যে বিহারের এ অঞ্চলে মোট চারটে সেন্ট্রাল জেল—কিছুদিনের জন্য তাদের কোন কর্তাই নেই। সে এক অদ্ভুত অবস্থা। কে পাবে পদটি, সেটাও একটা জুয়াখেলার মতো ব্যাপার। উপযুক্ত সব কটি ব্যক্তিই নাকি এখন পাটনা গেছে। পকেটে নোটের বাণ্ডিল। দিতে হবে যে জায়গা মতো। খুশী করতে হবে তো! তবে না উন্নতি' সবাই এটা জানে। জেলের কনিষ্ঠ কেরানী থেকে শুরু করে ওপর অলা অব্দি। বলেও সব কথা প্রকাশ্যে। এমন নয়, কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে। ওরা জানে উন্নতি করার এটাই একমাত্র উপায়। ঘুষ না দিলে উন্নতি হয় না। হয়তো নিয়মটা পছন্দ করে না। কিন্তু উপায় নেই। এই নিয়ম ছাড়া কারুরই কিছু হবার জো নেই।

এখন নতুন মেটিনীর নাম গুরুওয়ারী। জাতে সাঁওতাল। বয়স্কা। বালকোর বদলী ও এসেছে। তেমন কড়া নয়, শাসনের দাপট যথেষ্ট কম। মহল্লায় কোন পুরুষ বন্দী এলে সঙ্গে তার এখন কথা বলতে পারি। যেমন হাজির সঙ্গে বলি। হরি আমার রেশন নিয়ে আসে। শুধু আজ বলে নয়, সেই যেদিন হাজারিবাগে এসেছি সেদিন থেকে। মানুষটার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানার সুযোগ কখনো হয় নি। এটুকু মাত্র শুনেছি, কুড়ি বছরের মেয়াদ নাকি ওর প্রায় শেষ হবার মুখে। একদিন বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করলাম। প্রথম প্রথম তো ঘোর সন্দেহ, প্রশ্ন করার পেছনে আমার কোন মতলব আছে কিনা। পরে যখন বুঝলো সে সব কিছু নেই, তখন গড়গড়িয়ে সে যে কত

কথা! যেন বুকের মধ্যে এতোদিন রেখেছিল জমাট করে, এই প্রথম বুক খালি করার সুযোগ পেলো। মাঝারি কৃষক। জমি জমা আছে। মোটামুটি ফসল যা হয়, খেয়ে পরে থাকতে পারে। তবে উদ্বৃত্ত তেমন একটা হয় না। একবার ফসল হয়েছে বেশ ভালো, জমিদারের কিছু ভাড়াটে লোক দিলো সব জালিয়ে। ফলন তো জমির খুব ভালো। তাই জমিটার দিকে ভীষণ নজর জমিদারের। চায়, হরি জমি তার কাছে বাঁধা রাখুক। তাই এই অত্যাচার। একদিন সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে শোনে, বাড়িতে এক দানা খাবার নেই, মা কদিন ধরে নিজে উপোস দিয়ে বাকী কেউ যাতে উপোস না যায় তাই দাঁতে দাঁত দিয়ে পড়ে ছিলেন। সেদিন আর ওঠেন নি বিছানা থেকে, মারা গেছেন। শুনে আগুন জলে উঠলো হরির মাথায়। কেন, কি জন্যে এই মৃত্যু? এর জন্য দায়ী কে? ঠিক করলো খুন করবে সেই জমিদারকে। করলো খুন। তার পর নিজে গিয়ে পুলিসের হাতে ধরা দিলো।

এ জন্য হরির কোন অনুতাপ নেই। যা করেছে সে ঠিকই করেছে। ভায়েরা এখন সুখে শান্তিতে আছে। শত্রু তো খতম। কিন্তু ছাড়া পাবার দিন যতো এগিয়ে আসছে, হরির মনে নতুন একটা চিন্তা কদিন থেকে দানা বাঁধছে। তাই তো, ফিরে যে যাবে গাঁয়ে, সবাই কি চোখে নেবে! পালটা প্রতিশোধের মুখোমুখি হতে হবে না তো? গাঁয়ের নিয়ম কানুন আলাদা। সেখানকার মানুষ যুগ যুগ ধরে মনের মধ্যে রাগ পুষে রাখে। যদি জমিদারের পরিবারের কেউ বদলা নেয়! তখন উপায়!

ফের একবার যেতে হলো জামসেদপুরে। ফের সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। হাইকোর্টে আবেদনের নিষ্পত্তি হয়েছে কিন্তু কাগজপত্র এখনো এসে জামসেদপুরে পৌঁছয় নি। তাই মামলা শুরু করা যাচ্ছে না। আমাদের উকিল গত্যন্তর না দেখে সরকারী কৌঁসুলির সঙ্গে একটা রফায় আসতে বাধ্য হয়েছেন। হোক আলাদা আলাদা মামলা, তবু অন্ততঃ শুরু হোক। নেই মামার চেয়ে কাণা মামা তো ভালো। হাইকোর্টে এতো মামলা লাইন বন্দী যে আমাদেরটা শুরু করলে অহেতুক বিলম্বিত করাবার আর সুযোগ হবে না। গড়গড় করে চলবে গাড়ির মতো। তাই কৌঁসুলির আবেদনের বিরোধিতা করে অহেতুক সময় নষ্ট করার চেষ্টা তিনি করেন নি। হোক তাই। আমার বাপু আর ভালো লাগছে না। এই নিত্য তিরিশ দিন হাজারিবাগ আর জামসেদপুর—আর পারছি না আমি। বরং মামলা চলাকালীন থিতু হয়ে এক জায়গায় তো থাকতে পারবো। তাই আমার লাভ। নতুন তারিখ পড়লো ২৮শে এপ্রিল।

যত দেরীই হোক. একটা ব্যাপার ইদানীং বুঝতে পারছি—কিছু একটা হচ্ছে। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। যদিও ঘটন অঘটন কোন দিকেই তেমন মন দিই না। ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই। যেন যা হবে হোক এমনই মনোভাব। ধরে নিয়েছি সারাটা জীবন জেলখানাতেই কাটাতে হবে। কি আর হবে অহেতুক আশা করে! কোর্টে হাজিরার দিন সঙ্গে নিয়ে যাই বই। পড়ি বসে বসে একমনে। নয়তো গল্প করি। সবই মন থেকে অনিশ্চয়তা দূর করার তাগিদে। আমাকে আমার সহবন্দীরা কত প্রশ্ন করে। ব্রিটেনের সমস্যা নিয়ে, আয়ারল্যাণ্ডেব ব্যাপার নিয়ে, সেখানকার সরকার নিয়, আমাদের জীবনযাত্রাব মান নিয়ে। সময়টা বেশ সুন্দর ভাবে কেটে যায়।

এছাড়াও আছে। কি বাইরে কি জেলের ভেতরে পুজো আচ্চার তো শেষ নেই। তাতেও হৈ হৈ করে কেটে যায় সময়। একঘেয়েমির হাত থেকেও সাময়িক নিস্তার পাওয়া যায়। এই তো সেবার। দোল উৎসব বসন্তকালে। সবাই ঠিক করলো আলাদা রান্না হবে না সেদিন, একসঙ্গে এক হাঁড়িতে রান্না করে আমরা চড়ুইভাতি করবো। সেই মতো বলা হলো জমাদারকে।—আমাদের বড় হাঁড়ি দিন, উনুন দিন। জমাদার বললো দেব। কজন অবিশ্যি যোগ দিলো না আমাদের সঙ্গে। মন তো খারাপ লাগে। ছেলেপুলে রয়েছে বাইরে, হয়তো খেতে পায় না, হয় তো অনাহারেই দিন কাটায়, আর সে করবে আনন্দ—মন কি সায় দেয়!

তা দিনক্ষণ তো সব ঠিক ঠাক। আগের দিন মস্ত একটা কাজ আমাদের—অন্ততঃ ঝগড়াঝাঁটি কারুর সঙ্গে কেউ না করে সেটা খেয়াল রাখা। ঝগড়া হলেই বাগড়া। আর কি আনন্দোৎসবে তাকে পাওয়া যাবে। মুশকিল হলো, বলা সোজা কিন্তু কাজে প্রতিপন্ন করাটা কঠিন। এদিকে খটখটে শুকনো গরম। সকাল থেকে সূর্য ডোবা অব্দি সবার মেজাজ থাকে তিরিক্ষি হয়ে। তারই জের চলে সারাদিন। তো বাগানের একধারে ছুটো ফুলে ছাওয়া গাছ। সব কেটে নিকেশ করে দেবার পর কি যেন মতলব হলো সুপারের নিজে কোথা

থেকে এনে ফুলগাছ দুটো লাগিয়ে দিল। মস্ত বড় বড় ফুল হতো এপ্রিলে, লাল রঙের। খুব ভালো লাগতো আমার। এদিকে এ ফুল আবার অন্ত অনেকের পছন্দ নয়। বলতো 'ঝগড়াটি ফুল'—এ নাকি ডেকে ডেকে ঝগড়া নিয়ে আসে। তাৎপর্যটা পরে চিন্তা করে বুঝেছি। এপ্রিলে ফোটে তো, তখন টা টা গরম। গরমে মেজাজ থকে টঙে। তাই ঝগড়া হয়। এরা একটার সঙ্গে আরেকটা অমনি মিলিয়ে দেয়।

আর ধুলো। সে যা ধুলো ওড়ার ঘটা! লু ওঠা বাতাস। তার প্রচণ্ড দাপট। সেই বাতাস সারাদিন ধুলো ওড়ায় পাতা ওড়ায়। সব নিয়ে আসে গারদের ফাঁক দিয়ে আমার ঘরে। রোজ বেলা দুটো নাগাদ শুরু হয় বাতাসের দাপানি। চোখে ঢুকে যায় বালি, নাকের ফুটোয়, কানে, হাঁ করা থাকলে মুখে কিচকিচ কিচকিচ শুধু বালি আর বালি। বাতাস থেমে যাওয়ার পর তাকিয়ে দেখি—হায় রে, এই ঘরই না সকালবেলায় সাফ সুতরো করে ঝকঝকে তকতকে করে রেখেছিলাম। এখন এই তার হাল! অর্থাৎ দুলালীর কাজ বাড়লো। মেয়েটার হেন কাজে আপত্তি বলতে কিছু নেই। সন্ধ্যে হলে, বলতে হতো না, নিয়ে আসতো বাল্‌তি ভরা জল। কম্বল ঝাড়তো, কাপড় ঝাড়তো বইপত্র ঝাড়তো, তারপর নিকোতো ঘর। সে এমনই পরিষ্কার—একটি ধুলোকণা অব্দি কোথাও দেখতে পেতাম না। এমন ধৈর্য কি হতো আমার কখনো? পারতাম আমি ওর মতো অতক্ষণ বসে জল ধরে আনতে—ফোঁটায় ফোঁটায় একটু একটু করে পড়ে জল; পারতাম এতো ধৈর্য নিয়ে ঘর নিকোতে? মেজাজ তো ততক্ষণে টঙে চরে আছে আমার। ঐ গরম হাওয়া, ঐ ধুলো ঐ বালি—দপদপ করে লাফাচ্ছে রগের শিরা দুটো, এক্ষুনি না রাগে আবার ফেটে পড়ে। দুলালী কিন্তু মাটির মতো ঠাণ্ডা। এতো ঝড়ঝাপটা ধুলোবালি তো ওর ওপর দিয়েও গেছে। কই, রাগে নি তো। মাথাও ধরেনি। আর কী চটপট কাজ! এই ঢুকলো বালতি নিয়ে, একটু পরেই নিকোনো শেষ। অবাক হয়ে আমি শুধু ওকে দেখতাম।

এদিকে নতুন একটা কাণ্ড হয়েছে। সেই যে গীর্জা থেকে এসেছিলেন ধর্মযাজক, তারপর থেকে সমানে চলছে ওদের আসা যাওয়া। নানান মিশন থেকে ধর্মপরায়ণ প্রব্রাজক প্রব্রাজিকা আসছে তো আসছেই। সঙ্গে কত না উপহার। আমার সাহসের জন্য উপহার আনে। আমার নির্ভীকতার জন্য আনে—কত বলবো, তার আর যেন শেষ নেই। এদিকে ব্যবধান আমাদের মধ্যে সমুদ্রের মতো। আমি মতের কথাটাই বলছি। ওরা যা করে তাতে

ভারতের এতোটুকু উপকার হবে বলে আমি মনে করি না। শুধু একটা ব্যাপারে ওদের আমি শ্রদ্ধা করি। ভীষণ নিষ্ঠা ওদের নিজেদের কাজে। এই নিষ্ঠাটুকুই সব কিছুর সেরা গুণ। এই যে স্কুল চালায় ওরা, শিক্ষার মাধ্যম সেখানে ইংরাজী ভাষা, তাতে পড়তে আসে শহরের ভদ্র বাবুদের সন্তানেরা। হোস্টেলে থাকে। পড়া শেষ করে ফিরে যখন যাবে নিজের এলাকায়, তখন তো নিজের আত্মীয় পরিজনের সঙ্গেও সুস্থ ভাবে মিশতে পারবে না। ব্যাপক জনগণের কথা নয় বাদই দিলাম। কি লাভ তাতে? পারবে কি তারা দুর্নীতি রোধ করতে? স্কুল কর্তৃপক্ষও কি পারে? এই তো কদিন আগে বলে গেলো আমাকে একজন—স্কুলে ছাত্রদের জন্য নিয়মিত খাবারের সরবরাহ পাবার জন্য স্থানীয় জনৈক সরকারী অফিসের কর্তা ব্যক্তির সন্তানকে ছাত্র হিসেবে ভর্তি করতে হয়েছে। এটা কি সু-নীতির পরিচয়?

একদিন অফিস ঘরে হঠাৎ তলব। কি ব্যাপার; গিয়ে দেখি দুই প্রব্রাজিকা,—এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করতে। একজন সুইজারল্যাণ্ডের আরেকজন অষ্ট্রীয়ার। নিপাট ভালোমানুষ দেখতে, চোখে মুখে পরম পবিত্রতার ছাপ—দেখে লাগছিল যেন পরিবেশের সঙ্গে মিলছে না। তার ওপর সুপারের স্ত্রী পঠিয়েছে গরম গরম কফি আর কেক। খাচ্ছি তাই তিনজন। মাথার ওপর দেয়ালে বিশিষ্ট বন্দীদের বড় বড় বাঁধানো ছবি। যেন লাগছিল—হাজারিবাগে নই, হাজার হাজার মাইল দূরে তিনজন যেন বসে আছি মুখোমুখি, নানান আপন ভোলা কথা বলছি। যাবো নাকি একবার ঐ জানলাটার কাছে? ঐ দূরে সার সার পাহাড়—মনে করে বা নাকি ওগুলোর মাথায় বরফ, সেই ধ্যান-গম্ভীর শান্ত পরিবেশ? এ দুজন যেন সেই পরিবেশেই বড় খাপ খায়। নইলে ষাটটা বছর কাটিয়ে দিলেন এদেশে, অথচ মুখে একটা রেখা ফুটলো না? যন্ত্রণার একটু ছাপ পড়ল না? আমার জন্যে নিয়ে এসেছেন ফুলের ছবিওলা দুখানা বই। দেখো কাণ্ড! যাহোক, ভালোবাসার দান। পরম যত্ন সহকারেই নিলাম।

ফিরে আসছি অফিস ঘর থেকে। এক ধোপানী ডাকলো আমাকে চুপিচুপি। হালফিল এসেছে বন্দী হয়ে। সব সময় হতাশাগ্রস্ত ভাব, সেই ভাবেই সব ব্যাপারে কথা বলে। কেউ মোটের ওপর পছন্দ করে না তাকে। তা ডাকালো আমাকে এমন করে, ব্যাপার কি! গিয়ে দেখি, সে একলা নয়, আরো কজন বসে আছে, গুজগুজ করে কি যেন বলা কওয়া করছে।

ধোপানী বললো, দিদি, তুমি খালাস করতে জানো? অর্থাৎ গর্ভপাত। আমি তো হতবাক। বন্দীদের নানারকম বায়নাক্কা আমাকে সহ্য করতে হয়, কিন্তু এটা একেবারে অভিনব। আগে কখনো কেউ করে নি। আর জানিও না আমি এর কলা কৌশল। তবু জিজ্ঞেস করলাম, কার? আঙুল দিয়ে আলামনিকে দেখালো। ঠিক ভেবেছিলাম আমি। কদিন হলো এসেছে এখানে। স্বামী মারা গেছে ডাকাতি করতে গিয়ে। ওকে আর রাধামণি বলে ওর এক বান্ধবীকে পুলিস গ্রেপ্তার করে আনে। তা আসা ইস্তক দেখি মেয়েটা দুর্বল। যেন রক্তশূন্য ভাব। বড় ক্ষীণজীবী। আমি তখনই সন্দেহ করেছিলাম, ওর পেটে বাচ্চা আছে।

ধোপানী বুঝিয়েছে ওকে, জেল থেকে বাচ্চা কোলে নিয়ে ফিরলে কেউ বিশ্বাস করবে না এ বৈধ সন্তান। ধরে নেবে জেলে থাকাকালীন কোন উপায়ে গর্ভসঞ্চার হয়েছে এবং এ সন্তান অবৈধ। তখন দেবে গাঁ থেকে দূর করে। এটা শুধু আলামনি বলে নয়, সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। জেলখানাকে গাঁয়ের মানুষ মনে করে বাজে একটা জায়গা যেখানে মেয়েরা পারে না ইজ্জৎ আব্রু বাঁচিয়ে ঠিক থাকতে। এরকম ঘটনার নজির অবিশ্যি আমার চোখে পড়ে নি। এদিকে আলামনি মোটের ওপর রাজী হয়ে গেছে। তাছাড়া সন্তান এই অবস্থায় তারও কাম্য নয়। স্বামী নেই, জানে না যে ফিরে গিয়ে কিভাবে দিন চলবে, আদৌ খেতে পাবে কিনা। দুটো বাচ্চা তো বাড়িতে রেখে এসেছে। তিনটে পেট চলা দায়, তায় চার! সুতরাং গর্ভপাতই একমাত্র উপায়। শুনে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলাম। বললাম জেলখানায় এ সব করা সম্ভব নয়। তবু কি শোনে! মন তো ঠিক করে ফেলেছে। শুরু করলো উপোস। শুনেছে উপোস দিলে নাকি সন্তান আপনা থেকে নষ্ট হয়ে যায়। দেখা যাক!

তা সেই দোলের চড়ুইভাতি। হৈ হৈ করে হয়ে গেল। নতুন করে সবাই সবাইকে চিনতে পারলো। যেন বিরাট একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। আগের দিন রবিবার দল বেঁধে সবাই উপোস দিলাম। লাগবে যে অনেক কিছু। আটা চাই, ডাল চাই, আলু চাই, তেল চাই, মশলা চাই—সে এক এলাহি চাহিদা। সকাল থেকে শুরু হলো রান্না। আলুর দম আর পুরী। বসলাম সবাই গোল হয়ে। সেই নীমগাছের নীচে। একসাথে সবাই মিলে খেলাম। সে যা অপূর্ব রান্না! বহুদিন এতো ভালো খাইনি। রান্নার চেয়েও ভালো লাগলো ঐক্যবোধ। সবাই মিলে আমরা এক হয়ে একটা কাজ শুরু

থেকে শেষ অব্দি করে উঠতে পারলাম। এটা বিরাট ব্যাপার। সব ভুলে গেছে সবাই। জাত পাতের বিভেদ, মনের অমিল, নিজের নিজের ভাঁট— সব। সব এক আমরা। সবাই বন্দী। এই বোধটুকু সকলের মধ্যে " এসেছে। অন্ততঃ খানিকক্ষণের জন্যে। এটাই বা কম কিসের!

২৮শে এপ্রিল আমাদের আদালতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো না। কারণ দাঙ্গা লেগেছে। গোটা হাজারিবাগ দাঙ্গায় ব্যতিব্যস্ত। হিন্দু আর মুসলমানে। অথচ জেলখানার মধ্যে আমাদের কিন্তু কোন বিরোধ নেই, বিভেদ নেই। একেই বলে বোধহয় ভাগ্যের পরিহাস। পুলিসকে দাঙ্গা দমনের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়েছে। তাই যাওয়া হলো না। আর এই এপ্রিল মাসেই দেখি যত রাজ্যের দাঙ্গা হয়। হিন্দুদের হোলি উৎসবের সাথে সাথেই মুসলমানদের কি যে একটা পরব। দুটোর মাঝে মাঝেই ঠোকাঠুকি লাগে। দুই ভক্ত সম্প্রদায়ের শুরু হয়ে যায় মারপিট। ভক্তি নিয়ে তাণ্ডব। কত গ্রেপ্তার যে হলো! একদিকে রাখা হলো হিন্দু মেয়েদের, আরেক দিকে মুসলমান। যে যার নিজের নিজের ভগবানের নাম করে ধ্বনি দেয়। সে এক বিশ্রী অবস্থা। মাঝখান থেকে তারিখটা আমাদের পেছলো। জানিনা কদিনের জন্য। তবু ভালো। এই প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যে জামসেদপুর যেতে হবে ভাবতেই তো শরীর আমার খারাপ হতে শুরু করেছে।

জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলনের দাপট এখন মোটামুটি প্রশমিত। তাই বলে জেল কিন্তু খালি নেই। ধর্মঘটী শিক্ষক শিক্ষিকা আব শ্রমিক কর্ম্ম-চারীদের ভিড় লেগেই আছে। একদিন সতেরো বছরের একটি মেয়েকে মাথায়, কাঁধে, পিঠে, পায়ে গুলির ক্ষতচিহ্ন সমেত হাজতে আনা হলো। মিশন স্কুলের দশ ক্লাশ পাশ করা মেয়ে, চাকরী পায় না, তাই কয়লাখনিতে নিয়েছিল শ্রমিকের কাজ। করবে কি? সংসার যে অচল! মেয়েদের এখনো খনিগর্ভে নামতে দেওয়া হয় না। এদের কাজ ঝুড়িতে কয়লা তুলে ট্রাকে বোঝাই করা। ভীষণ ভারী সেই একেকটা ঝুড়ি। আহা রে, এইটুকুনি মেয়ে, ঐ তার রোগা চেহারা—সে কিনা বয় অতো ভারী ওজন! এতো শক্তি সে পায় কোত্থেকে? কিন্তু প্রশ্ন হলো, গুলিতে এমন করে জখম হলো কিভাবে?

বললো, একটা নাকি 'পেটোয়া' ইউনিয়ন আছে তাদের কোলিয়ারীতে। তার ওপর সবাই খাপ্পা। দালাল তো সবকটা নেতা। তাই তারা পাল্টা সমিতি গড়েছে। মাঝে মাঝে সমিতির ডাকে ধর্মঘটও করে। নানান

দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে। মাইনে কম, থাকার জায়গা বসবাসের অযোগ্য—এই সব পরিবর্ত্তনের দাবী। তা যে বস্তীতে থাকে, সেখানে টিনের চাল, একখানা করে ঘর, সে যেন গরমকালে সাক্ষাৎ অগ্নিকুণ্ড, এদিকে জলের ব্যবস্থা অকুলান। দিনে চার টাকা পায় মজুরী, অথচ এক কিলো চাল তিনটাকারও বেশি। একদিন কংগ্রেসী দালাল ইউনিয়নের কজন নেতা এক দল গুণ্ডা নিয়ে হামলা করে তাদের বস্তীতে, সমিতির সবাইকে টেনে বের করে আনে। তখন শুরু হয় খণ্ডযুদ্ধ। পুলিস আসে। গুলি চলে মুহুর্মুহু। সমিতির সাতজন শ্রমিক জখম হয়েছে। তাদেরই পরে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসেছে পুলিস। গোলমালের তারাই নাকি পুরোধা।

অভ্যাস হয়ে গেছে আমার সব। এই যে অবিরত মামলা পেছোয়—সব গা সওয়া, আর খারাপ লাগে না। শুধু বাড়ির কথা ভেবে যেটুকু বা কষ্ট পাই। বাবা মা কত আশা নিয়ে প্রতিটি তারিখের খবরাখবর সংগ্রহ করেন, হয়তো ভাবেন এই শেষ, এটাতেই যাহোক একটা নিষ্পত্তি হবে। বোঝেন না তো অত দূরে বসে নিষ্পত্তি হবার পথে কত হাজার বাধা। চিঠি লেখেন এক একখানা, পড়তে পড়তে আমারই চোখে জল আসে। আমার শরীর নিয়ে আমার মন নিয়ে তাদের দুশ্চিন্তার আর শেষ নেই। একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার—এই যে এতো বছর আমি জেলে আছি, আমার পুরনো বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন কেউ কিন্তু আমাকে ভোলে নি। সবাই নিয়ম করে চিঠি লেখে, খবর নেয়। দেখে জেলের কর্ম্মচারীরা অব্দি বিস্মিত। এমন তো দেখে নি কাউকে। ধরে নেয়, আমি নিশ্চয় কেউকেটা মহামান্য কেউ। একদিন তো স্পেশাল ব্র্যাঞ্চের এক অফিসার হাই কমিশনের জনৈক কর্তাব্যক্তিকে জিজ্ঞেসই করে বসলো—কোন বিশিষ্ট পরিবারের আমি মেয়ে কিনা। নইলে এতো খোঁজখবর নেবে কেন লোকে, এতো চিঠিই বা আসবে কেন।

একদিন টাইমস কাগজে পড়লাম, বিলেতের আইনজীবীদের হ্যালডেন সোসাইটি নামক একটি প্রতিষ্ঠান আমার মামলা বিলম্বিত করার ব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়ে শ্রীমতী গান্ধীকে একখানা চিঠি লিখেছে। কদিন পর বড় জমাদার বললো বি. বি. সি তে নাকি আমার কয়েদ থাকার ব্যাপার নিয়ে খবর প্রচারিত হয়েছে। এতো চেষ্টা চারদিক থেকে—এর কি ফল না হয়ে যায়! হয় তো লজ্জার খাতিরেও এরা এবার বিচার শুরু করে দেবে। আবার না-ও করতে পারে। কিছু বিশ্বাস নেই এদের ব্যাপারে। বা হয়তো আমিই বড্ড বেশিরকম সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। অবিশ্যি শুরু হলেই বা,

লাভ তো কিছু নেই। সরকার এতোদিনকার বিলম্ব চাপা দেবার জন্যে আমাকে দোষী বলে রায় দেবে এবং সে ক্ষেত্রে আমার সাজা বিশ বছর জেল।

১০ই মে বড় জমাদার বললো পরদিন ভোরে আটটার সময় আমাকে জামসেদপুর রওনা হতে হবে। আমি যেন তৈরী থাকি। তা পরদিন আটটা বেজে গেল, নটা, তারপর দশটা। কেউ আমাকে ডাকতে আসে না, যাবার কথাও আর বলে না। শুয়ে আছি তখন। চারপাশে আমার ঝোলা, পিচবোর্ডের বাক্স, তাতে বই পত্র, কাপড় চোপড় সব বোঝাই। এমন সময় ছুটতে ছুটতে এলো একটা বাচ্চা। হাঁপাচ্ছে। বললো, মাসী মাসী আলামনির বাচ্চা পড়ছে। তুমি এসো। একেই বলে হাজত। সব এখানে খোলা-মেলা। কারুর গোপন বলে কিছু নেই। একটা বাচ্চা অব্দি জানে কার মাসিক হয়েছে, কার পেটে বাচ্চা—সব। আপাততঃ এই অভিনব দৃশ্যটিও দেখেছে, এই গর্ভপাত। গেলাম ছুটতে ছুটতে। দেখি এক কোণে বসা আলামণি, গোঙাচ্ছে, পা দুটো দু পাশে মস্ত করে ছড়ানো, গোড়ালি যেন গেঁথে আছে মেঝের সঙ্গে। একজন হাত বুলিয়ে দিচ্ছে পেটে। আরেকজন পিঠে, অর্থাৎ যাতে ভ্রূণ চটপট বেরিয়ে আসে। আর সে যা করুণ ওর মুখচোখ। রক্ত যেন সব শুষে নিয়েছে, আর ঘাম, আর যন্ত্রণার ককানি। পারে কেউ অমন দৃশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে! আমার তো গা হাত পা কাঁপছে। বমি পাচ্ছে। পারছি না স্থির হয়ে দাঁড়াতে এক জায়গায়। কিছু একটা করা দরকার। ভাবলাম, যাই চুল পিঠে খোলা আছে, বেঁধে দিই। সবাই হাঁ হাঁ করে উঠলো।—বেঁধো না, খোলাই থাক। বাঁধলে বাচ্চা পেটের মধ্যে নাড়ে আটকে থাকবে। তাতে বেরুতে দেরী হবে। তা প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগলো। বেরুলো তারপর সেই তিন মাসের ভ্রূণ। ঘরের এক কোণে ঠেলে সরিয়ে রেখে দিল একজন। মেথর আসবে, তখন সাফাই হবে। এদিকে কম্বল চাপা দিয়ে শুইয়ে দেওয়া হলো আলামনিকে। তেল মালিশ করা হলো। এখন বিশ্রাম দরকার। আরো খানিকক্ষণ পরে ডাক্তারের দেখা পেলাম।

বেলা তিনটের সময় সবাই এসে জুটেছি ডরমিটরিতে। হাওয়া উঠেছে। ভাঙা একটা জানলা—ঠক ঠক করে সেটাই আছড়ে পড়ছে দেওয়ালের গায়। আর তো ধুলো আর বালি আর শুকনো পাতার ছড়াছড়ি। প্রকাশের মা কষ্টের পা খানা ছড়িয়ে রেখেছে টান টান করে, আরেক পা মোড়া। সেলাই করছে কাঁথা। পাশে তার বিস্রি। ব্লাউজ গায়ে নেই। চুল খুলে তাই থেকে একটা একটা উকুন বেছে বেছে বের করে মারছে। দুলালী আর ঝুমি এক

ধারে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। মাথা বোঝাই বালি আর খোলা পায়ের ওপর কম করে হাজার খানেক মাছি। মনে হচ্ছে ওখানটায় শাড়ির চওড়া কালো পাড়। বুধনী ঠিক মাঝখানটায়। সামনে কয়লার উনুন। বহু কষ্টে হাওয়া বাঁচিয়ে চাপাটি সেঁকছে। গরমে থকথক করছে শরীর, ব্লাউজের নীল রঙটা লাগছে যেন গাঢ় নীল। কটা বাচ্চা খেলছে বসে একধারে। মাটি দিয়ে তৈরী খেলনা, বানিয়ে নিয়েছে নিজেরাই। কোনটা হাঁড়ি, কোনটা থালা, কয়েকটা জন্তুর আকৃতি। এই ওদের খেলার সামগ্রী। গুরওয়ারী পাতলা একটা চাদরে সর্বাঙ্গ মুড়ি দিয়ে নাক ডাকছে পড়ে পড়ে আর এক ধারে। জমাদারনী শুয়ে আছে তক্তাপোষে, একজন রোজকার নিয়মমত টিপে দিচ্ছে তার গা হাত পা। বুড়ী বাসিরান বসে আছে একধারে। বুধনীর শাশুড়ি। কাসছে। কাসির দমক এলে দম যেন আর ফিরতে চায় না। সাঁই সাঁই করে আওয়াজ হয়। সাবিত্রীও বিশ্রামে রত। বড় ঘাবড়ে গেছে মেয়েটা। আজ তিনদিন, যতবার কাসে সমানে দলা দলা রক্ত পড়ে। আর আমার পাশে শান্তি, অল্প বয়েস। একটা রুমাল বুনছে। কয়েদীদের মধ্যে একজন আছে ওর পেয়ারের লোক। তাকে দেবে। সে আবার বড় জমাদারের খুব বিশ্বাসভাজন। ওকে ভাঁড়ার থেকে কাপড় এনে দেয়, সুতো এনে দেয়। শান্তিকে এক দৃষ্টে লক্ষ্য করছে সত্য। সত্যর এই বারো চলছে। বিশেষ একটা কারুর সঙ্গে মেশে না। ওর বয়েসী যে আর কেউ নেই। আমি সটান শান্তির বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ভালো বিছানা। বাড়ি থেকে তোষক আনিয়েছে শান্তি। শোবার সঙ্গে সঙ্গে সত্য কম্বল ভাঁজ করে বালিশের মতো বানিয়ে আমার মাথায় নীচে গুঁজে দিলো। আয়ারল্যাণ্ডের ওপরে একটা লেখা এসেছে ডাকে। ওরা কালো কালি বোলায় নি। কেমন করে যেন চোখ এড়িয়ে গেছে। সেটাই বের করে পড়ছি। প্রকাশ বসে আছে আমার পায়ের কাছে। তেল ডলে দিচ্ছে পায়। মাঝে মাঝে গোড়ালি অব্দি পায়ের পাতা ভাঁজ করিয়ে আরাম দিচ্ছে। দেখে তো এইভাবে আরাম পেতে বড়দের। আমার ওপর তারই পরীক্ষা চালাচ্ছে। আলামনি শুয়ে আছে আমার বাঁ দিকে। ছটফট করছে যন্ত্রণায়, গোঙাচ্ছে এখনো সমানে। চুলগুলো তেলে বালিতে ঘামে ভিজে জবজবে বিশ্রী অবস্থা। রাধামনি টিপে দিচ্ছে তার হাত। হাতের তালু পায়ের পাতা বারবার ঘষে একটু তাপ দেবার চেষ্টা করছে। আমরা এদিকে গরমে অস্থির, আলামনির শরীরে, দরকার একটু তাপ। কম্বলের নীচের দিকটা ভেজা। জলমতো কি যেন গড়াচ্ছে নীচ দিয়ে। মোটমাট এই হলো দুপুরের ডরমিটরি। ধুলোয় বালিতে

বোম্বাই, ঘাম নারকোল তেল, সরষের তেল, রান্না আর পেচ্ছাপের মিলিত গন্ধে ভরপুর। এরই মধ্যে এতোগুলো মানুষ। সবাই যে যার নিজেকে নিয়ে মশগুল॥

সেদিন কেন জানি না, আলামনির ঘটনাটার পর থেকে সবাই যেন চুপ হয়ে গেছি। কথা যেন ফুরিয়ে গেছে আমাদের। বাচ্চাগুলোও ছোটাছুটি করছে না, বা এই যে খেলছে বসে বসে কোন হৈচৈ নেই, চুপচাপ। দুপুর বেলা সবাই যেন এমনিতেই একটু চুপচাপ থাকে। আমরাও খানিকটা আলুথালু হয়ে থাকি। গরম তো ভীষণ, পারি না সহ্য করতে। কাপড় তাই নিজের অজানতেই কখন উঠে আসে হাঁটুর ওপরে, জামার বোতাম খুলে দিই। আসবে না তো জমাদার এখন। এই গরমে কেউ কি আর বেরোতে সাহস পায়! চারটে নাগাদ যে যার উঠে বসে চুল বাঁধতে। খোঁপা বাঁধার সে যে কত কায়দা! কপালে সিঁথিতে দেয় সিঁদুর। চোখে কাজল টানে, শাড়িটা পরে ঘুরিয়ে। সারাদিনের মধ্যে এই একটাই বিলাস। একটু পরেই তো আসবে পুরুষ মহল থেকে কজন বন্দী। ডাল আর তরকারী আর ওষুধ দিতে। এটা শুধু অসুস্থ বন্দীদের বাড়তি পাওনা। তাদের চোখে অন্ততঃ একবাব যাতে ধরা পড়ে, সেজন্যে সাজগোজে একটু চমক আনতে হবে না!

হঠাৎ বাইরে ঘন্টি বেজে উঠলো। উঠে বসলো ধড়মড়িয়ে জমাদারনী। শাড়ীটা টেনে দিলো বুকের ওপর, আঁচল জড়িয়ে নিলো গায়ে ভালো করে। দুহাতে চোখ দুটো একবার ডলে নিলো। অন্ততঃ বাইরে থেকে কেউ এলে সে যেন বুঝতে না পারে সে ঘুমোচ্ছিলো এতোক্ষণ। জমাদারনীর নাম মন্নুয়া। ঠেলে তুললো গুরওয়ারীকে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো গুরওয়ারী। গেলো বাইরে। উঁকি দিলো। কে আবার এলো বাপু এই অসময়ে আমাদের শান্তি ভঙ্গ করতে!

জমাদার। বললো, মেরী টাইলারকে জামসেদপুর যেতে হবে।

—এখন!

—হ্যাঁ। জলদি। এখুনি তৈরী হয়ে নিতে বলো।

গুরওয়ারী ছুটে এসে আমাকে খবর দিলো। অবাক হলাম। এই না একটু আগে জমাদারনী বললো, পুলিস পাহারা পাওয়া যাবে না তাই জামসেদপুর যাওয়া আমার বন্ধ। আর এখন বলে কিনা জলদি তৈরী হয়ে নিতে! এদের কি সকালে বিকেলে মত পালটায়! তো যাই হোক, গোছানো মোটামুটি ছিলোই, দু একটা টুকিটাকি জিনিস যা নামিয়েছিলাম, ফের গোছগাছ করে নিলাম।

শান্তি চুল বেঁধে দিলো আমার। দুলালী আর কুর্মি ঝোলা দুটো দড়ি দিয়ে বেঁধে দিলো। বুধনী ছুটতে ছুটতে এলো থালীতে নিজের রাত্রে খাবার জন্য তৈরী দুখানা চাপাটি নিয়ে—

—দিদি, খেয়ে নাও। তোমার ভুখ্ লেগে যাবে।

—আমি খেলে তো তোমারও রাত্রে ভুখ লাগবে।

—না। আরো আছে। তুমি খেয়ে নাও।

মহুয়া লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল খানিকটা চিনি অসময়ের জন্যে। তাড়াতাড়ি এক মগ ঠাণ্ডা জলে গুলে আমার সামনে ধরলো।

—এটা খেয়ে নাও। বড্ড গরম। তোমার তেষ্টা পাবে। কষ্ট হবে।

বাচ্চারা এসে আমাকে ঘিরে ধরেছে। আমার শাড়ী ঠিক করে দিচ্ছে, আমার হাত ধরে টানাটানি করছে।

—কবে ফিরবে তুমি মাসী ?

—এই তো ফিরলাম বলে। দেখিস না, নিয়ে যায় আর নিয়ে আসে। মামলা তো হবে না, ফের আমি ফিরে আসবো।

তখন কি জানি ফিরবো না আর। এই আমার সবাইকে শেষ দেখা।

হরিও শুনেছে আমি যাচ্ছি। ছুতো করে জমাদারনীকে কি একটা জিজ্ঞেস করবে বলে চলে এসেছে। ঘন্টি বাজালো। ভেতর থেকে মুখখানা দেখেই চিনতে পেরেছি। সবাই জানে এসেছে ও আমাকে বিদায় জানাতে। একাই বেরিয়ে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

—দিদি শুনলাম নাকি তুমি চলে যাচ্ছো ?

—হ্যাঁ। যাবার কোন দরকার আছে বলে মনে হয় না। এই গরমে খোলা জীপে মরে যাবো এবার। নির্ঘাৎ। সরকার চায় আমি এই সব সহ্য করতে না পেয়ে মরে যাই। সেটাই ওদের পক্ষে মঙ্গল। কিন্তু অত সহজে মরলে কি চলে ? সব কষ্ট সহ্য করতে পারি আমরা। কিছুতে ডরাই না। না গেলেও পারতাম। ইচ্ছে হচ্ছিল একবার বলে দিই যাবো না।

—না দিদি, যাও। নইলে সবার মামলা পেছিয়ে যাবে। ওরা আর তুমি তো এক। নয় ওদের জন্যে আরেকটু কষ্ট করলে।

ও জানে সব। বোঝে সব। তাই জেলে এসেছে নিজেও। তাই মেয়াদ খাটছে।

সবাইকে বিদায় জানিয়ে জীপে গিয়ে বসলাম। জানি তো মনে প্রাণে, দুদিনের জন্য এই যাওয়া। দুদিন পরেই আবার ফিরে আসতে হবে।

তখন কি ভুলেও ভাবতে পেরেছি, এর ঠিক দুমাস পরে আমি ইংল্যাণ্ডে পৌঁছে যাবো। ওদের সঙ্গে সাক্ষাৎ দেখা আর হবে না। শুধু কল্পনায় শুধু স্বপ্নে, শুধু ঘুমে, শুধু জাগরণে ওদের মুখগুলো ছায়ার মতো আমার চারপাশে ঘুরে বেড়াবে।

লণ্ডনে যাবার টিকিট

বীণা আর আমি—কে কাকে কিভাবে অবাক করবো সেটাই আমাদের চেষ্টা। বীনার জন্যে সঙ্গে এনেছি এবার অনেক কিছু। রেশন বেচে পেয়েছি চারটাকা, তাই দিয়ে কিনেছি একগজ কাপড়, তাতে ওর একটা ব্লাউজ বানিয়ে এনেছি। লিওনী দিয়েছে আমাকে কটা কাঁচা লঙ্কা, একটু তেঁতুল আর কটা ধনে পাতা। নিয়ে এসেছি ওর জন্যে। আলু আর মুসুর ডাল যে মোটে খায় না বীণা। একদম পছন্দ করে না। একটু নুন ওর বাড়তি চাই, আব একটা লঙ্কা। সঙ্গে একটু চাটনী বা টকজাতীয় কিছু পেলে তো কথাই নেই। পরম তৃপ্তিভরে ঐ দিয়ে সবটুকু ভাত খেয়ে নেবে।

এদিকে ছিলাম না যে কদিন, আমাকে চমকে দেবার মতো অদ্ভুত কিছু জিনিস বীণা বানিয়ে রেখেছে। যেমন একটা উনুন। মাটির তৈরী। আমি যে ঘরটায় থাকি এখানে এসে, তারই পেছনে। সেখানে আগে কয়লার গুঁড়ো ডাঁই করে রেখে দিতো। সব ওলট পালট করেছে বীণা। একটি একটি করে কয়লার টুকরো সযত্নে বেছেছে, তারপর বাকী গুঁড়োর সঙ্গে কাদামাটি মিশিয়ে গুল দিয়েছে গোল গোল। জ্বালানীর সে এক অতি আশ্চর্য সম্পদ। আর কাঠের টুকরো আর টিন ভাঙা দিয়ে বানিয়েছে রান্নার কটা আশ্চর্য সরঞ্জাম। একটাতে চালের গুঁড়ো লেই মতো করে ঘষলে সুন্দর সুন্দর সেমুইয়ের মতো হয়। একটা হাতাও বানিয়েছে। একটু গম রেখেছিলো জমিয়ে আর খানিকটা যব। সকালবেলা ছোলা সেদ্ধর সঙ্গে ভেজাল হিসেবে পাতে পড়ে। একটি একটি দানা খুঁটে রেখেছে জমিয়ে। মেয়েদের মহলে যাঁতা আছে একটা মশলা গুঁড়ো করার আর গম ভাঙার জন্যে, সেটাতে ভেঙে এনেছে সেই যব আর গম। রেখে দিয়েছে আমার জন্যে। শুধু আমারই জন্যে। ঐ উনুনে রান্না করে অদ্ভুত কি সব খাবার তৈরী করে আমাকে খাওয়াবে। আমি নাকি খেয়ে অবাক হয়ে যাবো।

মেয়েটার ক্ষমতা দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। হয়তো বললাম কখনো. দেখো এটা আমাদের দরকার। শুনে রাখলো, তখন তখনই কিছু বললো না। এমনকি কদিনের মধ্যে হয়তো মুখ দিয়ে নামও উচ্চারণ করলো না। আচমকা একদিন দেখি সেই বস্তুটি হাজির। ঠিক যেমনটি বলেছিলাম আমি তাই। কিভাবে কোত্থেকে যোগাড় করলো কে জানে। হাতুড়ি আনলো এইভাবেই, পেরেক আনলো। দেয়ালে পুঁতে শাড়ি জামা ঝুলিয়ে রাখার একটা উপায় বেরুলো। ইঁদুরগুলো যা অত্যাচার শুরু করেছে! একটা ছোট্ট কাকতাড়ুয়া বানিয়ে আমাদের ছোট্ট বাগানটাতে বসিয়ে দিলাম। পাখি আর এসে খুঁটে খুঁটে বীজ খেতে সাহস পায় না। আরো কত কি তৈরী হলো ঐ হাতুড়ি আর পেরেকের সাহায্য নিয়ে। ফেলে না তো বীণা কিছু। চড়ুই পাখি বাসা বাঁধে আমার ঘরের ঘুলঘুলিতে। মাঝে মাঝে তাড়া খেয়ে পালিয়ে যায় কি হাওয়ায় বাসা ভেঙে পড়ে। একটি একটি করে বাসা থেকে তার আর সুতো আর দড়ি বেছে বেছে তুলে রেখে দেয়। তাই দিয়ে একদিন একটা চমৎকার সাবান ঘষবার জালি বানিয়ে আমাকে দিলো। বলতো না কিন্তু কিচ্ছু। কোথায় পায় কোন্ জিনিসটা, কিভাবে কি বানায়—সব গোপন থাকতো আমার কাছে। এতে দোষের কিছু নেই। এমন নয় যে কোন অন্যায় করছে। আসলে ফেলে না ও কিছু, নষ্ট করে না। রেখে দেয় সব। নিজের ওপর যে অগাধ বিশ্বাস। ছোটবেলা থেকে আত্ম বিশ্বাসের ওপর ভর দিয়েই তো একটু একটু করে বড় হয়েছে। আত্মবিশ্বাস কখন কি দিয়ে কোন্ প্রয়োজনে কি সৃষ্টি করবে, সে কি কেউ আগে থেকে ঠিক ঠিক বলতে পারে?

১৫ই মে বৃহস্পতিবার। আমার কোর্ট হাজিরার দিন। শুনে অব্দি তো হৃৎকম্প উপস্থিত হয়েছে। এই প্রচণ্ড গরমে এতো কষ্ট করে আবার সেই বসে থাকা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তাপ এখন সবচেয়ে বেশি, সেই সঙ্গে বাতাসের শুকনো ভাব। হাকিমের কাছে গাড়ির মধ্যে বসে থাকার কষ্টের কথা জানিয়ে আবেদন করা হয়েছিল। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, আমাদের যেন কোর্ট হাজিরার দিন হাজত থেকে এনে আলো বাতাস আছে, বাথরুম আছে, জল আছে এমন কোন ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। সে আদেশ এরা মানে না। বসিয়ে রাখে ঠায় ভ্যানে। কী ভিড় আর কী কষ্ট! আমি থাকি তাই আসতে হয় এক জমাদারণীকে। সে বেচারীর এক মুহূর্তের জন্যেও আমার পাশ ছেড়ে যাবার হক নেই। ড্রাইভারের পাশে ছুটিতে পুতুলের মতো সারাক্ষণ বসে থাকি। ঘামে গায়ের শাড়ি অব্দি ভিজে গায়ের সঙ্গেই লেপটে যায়। মাথা যন্ত্রণা করে। হাওয়া বাতাস যে নেই। আর

সারাক্ষণ সামনে কাঁচের মধ্য দিয়ে রোদ এসে পড়ে আমাদের মুখে চোখে গায়ে। পা ছড়াতে পারি না। এমন কি মাঝে মধ্যে জল চাইলে পাই না। ডিউটিতে থাকে এক সিপাই, তাকে জল খাবো, সেটা বোঝাতে হয় নানান কায়দায়। তবে সে বুঝতে পারে। তখন এনে দেয়। আর যারা ভ্যানের মধ্যে থাকে তাদের অবস্থা তো আরো শোচনীয়।

আর কোর্টে হাজিরা দেবার সময় তিন রকম পুলিস যায় আমাদের পাহারা দিতে দিতে। কালো টুপি পরা সশস্ত্র সিপাই, তারপর সবুজ টুপি পরা মিলিটারী পুলিস, সবশেষে লাল টুপি পরা নিয়মিত বাহিনী। আমাদের মতো ওদেরও দুর্ভোগের একশেষ, একঘেঁয়েমির যাকে বলে চরম। মাঝে মাঝে ওদের অবিশ্যি ছায়ায় দাঁড়িয়ে জিরিয়ে নেবার অধিকার আছে, বন্দুকে ঠেকনা দিয়ে বসে গল্পগুজব করার। কাজ বলতে ভ্যানের চারপাশে কুতূহলী জনতার ভিড় দেখলে তাদের ধমকে হটিয়ে দেওয়া। জেলখানার সিপাইদের মতো ওদেরও হাতায় থাকে একচিলতে সাদা পটি, ফুটফুট একরকমের গলাবন্ধ আর পকেট-রুমাল। কেউ কেউ বেল্ট বাঁধে, কাউকে দেখি প্যান্টের ওপরই জামাটা ছেড়ে দিয়ে একটু ঢিলেঢালা থাকবার চেষ্টা করে। দাড়ি টাড়ি কেউ বড় একটা রোজ কামাবার প্রয়োজন বোধ করে না। চুল আঁচড়াবারও বালাই নেই।

সেদিন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো। হাকিম আদেশ দিলেন, আমরা যেন কেউ জামসেদপুর থেকে না যাই। সাক্ষীদের নাকি তলব করা হয়েছে এবং এখন আর গড়গড়িয়ে মামলা চলতে অসুবিধে নেই। যাক, তবু বাঁচোয়া। এক জায়গায় তো থাকতে পারবো কটা দিন। বইপত্র বাছাবাছি করে বীণাকে নিয়ে লেখাপড়ার কাজে আবার বসতে পারবো। এর চেয়ে বড় আনন্দ আর কি থাকতে পারে। ফিরে গিয়ে সেদিন বীণা আর আমি মিলে ঘরটাকে গুছোলাম। চেয়ে চিন্তে বীণা এক জমাদারের কাছ থেকে খানিকটা কলিচুণ সংগ্রহ করে এনেছে। ভিজিয়ে রাখা হলো তাই। পরদিন দুজনে মিলে ঘরটা চুণকাম করলাম। বাইরে ভেতরে সর্বত্র। কনসাল দিয়ে গেছেন কটা প্লাস্টিকের ব্যাগ। যাতে বই আর জামাকাপড় কটা রক্ষা পায়। ব্যাগ দেয়ালে পেরেকে ঝোলাতে দেয়ালটার যেন ইজ্জৎ বাড়লো। মোটমাট থাকছি যখন কদিন একটু গোছগাছ করেই থাকবো। হেলাফেলার অগোছালো ভাবে থাকতে কি মন চায়।

দুদিন পর। দুপুরের খাওয়া সবে শেষ হয়েছে, এমন সময় অফিস ঘরে তলব। একটু অভিনব ঠেকছে। সাধারণতঃ এই সময় কয়েদীদের বড় একটা বিরক্ত করার

প্রথা নেই। শাড়িটা আলগা করে দিয়েছিলাম একটু আরাম পাবো বলে, নিলাম ফের ভালো করে জড়িয়ে। নিয়ে গেলো সিধে সুপারের ঘরে। মুখ দেখেই বুঝলাম কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। টেলিফোনটা দেখিয়ে বললো, এই মাত্র কলকাতা থেকে ডেপুটি হাই কমিশন ফোন করেছিলেন। ১৫ই মে বৃহস্পতিবার আমার মা মারা গেছেন। স্তম্ভিত হলাম। জানতাম এমন একটা কিছু ঘটবে। পাঁচ বছর ধরে এই একটি চিন্তা আমাকে প্রতিনিয়ত কুরে কুরে খেয়েছে। আজ তা সত্য হলো। মা তো হার্টের রুগী। গোড়া থেকেই ভাবতাম, মনের এই প্রচণ্ড চাপ তিনি সহ্য করতে পারবেন কিনা। ছুটে বেরিয়ে চলে এলাম। কান্না পাচ্ছে। কিন্তু এই অফিস ঘরে এদের সামনে কাঁদতেও যেন আমার বড় ঘেন্না। বরং বীণার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদবো। তাতেই আমার শান্তি।

কটকের মুখেই বীণা দাঁড়িয়ে। আমাকে জিজ্ঞেস করলো কি হয়েছে। বলতে গেলাম। পারলাম না। কান্না দিলো সব তোলপাড় করে। ফোঁটা ফোঁটা অনর্গল অবিরল অশ্রু। কত ব্যথা যে জমে আছে আমার বুকে! এই তো দুদিন আগে মার একখানা চিঠি পেলাম। কী দুশ্চিন্তা আমার জন্যে, কত উদ্বেগ! নিজের শরীরের কথা কিছু লেখেন নি। আমাকে সাহস দিয়েছেন, উৎসাহ দিয়েছেন। সেই মা আজ নেই। আমি আর তাঁকে দেখতে পাবো না। কোন দিন না। বীণা হাত ধরলো আমার, নিয়ে গেলো কলের কাছে। বসিয়ে মাথায় ঢেলে দিলো মগের পর মগ জল। চোখে মুখে জল দিলো, হাত পা ধুইয়ে দিলো। মাথায় যে তখন আমার আগুন। সমস্ত শরীর আমার আগুন। ভীষণ রাগ ভেতরে। দুঃখ ছাপিয়ে রাগ আর ঘেন্না। কিছু বললো না বীণা। শুধু জল ঢেলে ঢেলে শান্ত করলো মন। ঘরে এনে বসালো। সাহস দিলো বুকে। সে যে কী সাহস! বললো, ভারতের কোটি কোটি মানুষ আমার চেয়ে হাজারগুণ দুঃখে প্রতিনিয়ত জলছে পুড়ছে খাক হয়ে যাচ্ছে। আমি না এদেশে এসেছি এদেশকে ভালবেসে, গরীব দুঃখী অগণিত মানুষকে সাহায্য করবো বলে। তবে কেন অধীর হবো আমি। কেন মনে রাগ আনবো। ব্যক্তিগত রাগ বা অভিযোগ বা ঘৃণার কি আর সময় আছে। আমার কি সাজে সে সব? সব কিছু বরণ করতে হবে সহজ ভাবে, স্বাভাবিক ভাবে। তবেই না আমি সত্যিকারের বন্দী।

তবু যে পারি না ঘৃণাকে জয় করতে। ভীষণ ঘেন্না আমার বুকে। ঝিঁ ঝিঁ করে শরীর। যারা কষ্ট দিলো আমার বাবাকে মাকে, সিছকই অকারণে, তাদের

ছায়া দেখলেও যেন শরীর মন জ্বলে যায়। হতাশা এসে পেয়ে বসলো। কিছু আর ভালো লাগে না। বড় অসহায় লাগে নিজেকে। বাবার কথা কেবলই মনে হয়। আমার বাবা—এখন একলা একদম, দুগুণ দুঃখ বুকে নিয়ে এখন কাটাতে হবে তাঁকে দিন। কত দিনে ছাড়া পাবো আমি তার তো ঠিক নেই। ততদিন থাকবে বুকে দুঃখ। পারলাম না একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে। শুধু চোখের দেখা দেখতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে। বাবাকে আর বোনকে একটিবার এক ঘণ্টার জন্যে দেখা। একটু সান্ত্বনা দেবো শুধু। আমার মনের ভাবটা বোঝাবো। আমি জানি খবরটা পেয়ে আমার মনের ভাব কিরকম হয় তাই নিযে তাঁরা দুশ্চিন্তা করবেন। চিঠি যে লিখবো একখানা, সেটা তো পনেরো দিন পড়ে থাকবে পুলিস অফিসে। কি লাভ তাহলে চিঠি লিখে। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। ২৯শে মে আমার মামলার তারিখ। সেদিন কনসাল এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। ওরা দেখা করার অনুমতি দিলো না। কিভাবে মারা গেলেন মা শোনার জন্যে আমি তখন ছটফট করছি আর বাবাকে পাঠাবো একটা খবর। কনসালকে বলবো—হলো না বলা। এই না হলে আমলা। একটু দরদ একটু সহানুভূতির ছিঁটেফোঁটাও থাকবে না ওদের শরীরে। থাকলে আর আমলা হবে কি করে। তবু ভালো বীণা আছে আমার সঙ্গী, আর আছে অগণিত বন্দী। ওরাই আমার সব। ওরা আছে বলে তবু যাহোক নতুন করে আশায় বুক বাঁধতে পারি।

মশামাছি ছারপোকা হাজারিবাগ আর জামসেদপুর দুজায়গারই এক প্রধান সমস্যা। এদিকে বেড়ালটা নেই। তাই ইঁদুরের সংখ্যাও চটপট বেশী বেড়েছে। রাত্রে ঘুম ভেঙে যায়, দেখি গায়ের ওপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে হেঁটে চলে গেলো ইঁদুর। একদিন আমার পায়ের আঙুল কামড়ে দিলো। আরেকদিন ঘুম ভেঙে গেল। টিনের ঠং ঠং শব্দে। উঠে দেখি গুড়ের টিনটার ঢাকনা সরিয়ে ঢুকে পড়েছে। খাচ্ছে পরমানন্দে। দাঁত বসাতে পারে এমন কিছু পেলে আর রক্ষে নেই। তার সর্বনাশ না করে ছাড়বে না। ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে খেড়ে ইঁদুরের স্বপ্ন দেখে ভয়ে কেঁদে উঠতাম। কর্তাদের বলতাম, আমাকে একটা ইঁদুর ধরা কল দিন, শুনে ওরা খিক খিক করে হাসতো। যেন মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমার, উদ্ভট একটা কিছু চাইছি, এরকমই ভাব। কনসাল জুন মাসের মাঝামাঝি আসতে আমি বাজার থেকে আমার নিজস্ব টাকায় একটা কল কিনে দিতে

বললাম। শুনে তো তিনি হতভম্ব। জীবনে বোধহয় কোন বন্দীর কাছ থেকে এমন ধারা উদ্ভট অনুরোধ তিনি শোনেন নি। দিলেন কিনে। এক হপ্তার মধ্যে সতেরোটা ইঁদুর ধরলাম সেই কলে। বেশ পুরুষ্টু চেহারা। আরো কত যে না ধরা পড়ে রইলো তার আর ইয়ত্তা নেই।

তখন আবার জেলখানায় একটু সারাই টারাইয়ের কাজ চলছে। একটা বিজলী বাতি বসলো আমার ঘরে। সুপার তো অহংকারে ডগমগ।—দেখুন দেখুন, কি সুবিধা করে দিলাম আপনাদের। সুবিধে না ছাই। সর্বনাশ আরো এককাঠি বাড়লো। কদিন আগে জেলার করেছে এক নতুন ব্যবস্থা। ভ্যাপসা গরমে গাদাগাদিতে দমবন্ধ হয়, তাই বুড়ী থুথুড়ী অসুস্থ কয়েকজন বন্দীকে বেছে বেছে শুতে দেয় বারান্দায়। এ নিয়ে অবিশ্যি কারামন্ত্রীকে এক দফা চিঠি লেখালেখিও হয়েছে। কে জানে, তাদেরই নজরে রাখবার সুবিধের জন্যে এই আলোর ব্যবস্থা কিনা। আলোগুলো জ্বলবে নিভবে ভেতর থেকে, অর্থাৎ অফিসঘরে কোন এক সুইচ থেকে। নিজেদের কিছু করার উপায় নেই। সারারাত রাখবে ওরা জ্বালিয়ে। সারারাত আলোর দিকে তাকিয়ে আমাদের ঘুম যাবে উবে। তাছাড়া গরমও বাড়বে। তবু যাহোক অন্ধকার হলে নিজের ঘরে একটু নিরালা কাটাতাম। সেটাও এখন থেকে বন্ধ হলো।

২৩শে জুন আবার মামলার তারিখ। কদিন আগে কাগজে পড়েছি একটা খবর। ভোজপুরের হাদিয়াবাদ বলে একটা গ্রাম। সেটা নাকি জমিদার জোতদারের দল পুরো জ্বালিয়ে দিয়েছে। হরিজনপ্রধান অঞ্চল। তাদের ওপর রাগ কেননা তারা নাকি নকশালপন্থীদের ডেরা দিয়েছিল থাকার। গ্রামের চোদ্দ বছরের একটি ছেলেকে কুপিয়ে কেটে ফেলেছে। সে-ও নকশাল। তার বাবাও। বাবা কোথায় সে খোঁজ নাকি সে দেয় নি। এই তার অপরাধ। আক্রমণকারীদের অনেকের নাম যদিও কাগজে বেরিয়েছে, এ পর্যন্ত একজনও গ্রেপ্তার হয় নি।

এবং অবশেষে সেই বহু প্রত্যাশিত মামলা শুরু হলো। কত আশা নিয়ে বসে ছিলাম, কত কি ঘটবে, সব দেখবো আমরা, বুঝবো শিখবো,—এমা, এ দেখি নিরর্থক অহেতুক বাগাড়ম্বর! আর সেই ঢিলেঢালা মেজাজ। বুঝতে পারছি, সময় লাগবে প্রচুর। এক একজন সাক্ষী এসে দাঁড়ায় কাঠগড়ায়, সে যা বলে হাকিম পুরোটা লিখে রাখেন। সংক্ষেপে নয়, একেবারে হুবহু। প্রায় একশোজন সাক্ষীর নামের তালিকা পেশ করেছে সরকারী কৌঁসুলি। একজন দুজন ছাড়া বাকী সবাই

পুলিস। তাদের সকলকে বিভিন্ন দিনে তলব করে এনে এজাহার নেওয়া হবে।'

কাফকার লেখা গল্পের মতো লাগছে যেন। দাঁড়িয়ে থাকি এক পাশে, বুঝতে পারি না কি বলেন হাকিম, কি বলে পাখির মতো লম্বা নাকওলা ঐ কৌঁসুলি। আমি যখন বললাম, সব কথা শোনা যাচ্ছে না; কৌঁসুলি বললো, আমি নাকি এই সব অহেতুক অভিযোগ এনে মামলা বানচাল করতে চাই। দেরী করাতে চাই! প্রতিবাদ করে কোন লাভ নেই। যথাপূর্বং একইভাবে চললো। সামনের দিকে বসলো কজন প্রতিবাদী একটা কার্পেটের ওপর। বোধহয় এই মামলা উপলক্ষ্যেই এনে পাতা হয়েছে। অতো সামনে বসে তারাও কানে কিছু শুনতে পায় না।

আমি পেছন দিকেই থাকি। পেছন থেকে দেখি সব কিছু। শুধু দেখি ঠোঁট নাড়া। যেন ভূতুড়ে কিছু কাণ্ড কারখানা। এদেরই ঠোঁট নড়ার ওপর নির্ভর করছে আমাদের ভালোমন্দ। কিন্তু কি বলছেন এই সব সদাশয় ব্যক্তিগণ? কিছুই যে বুঝবার উপায় নেই। আর যাদের নিয়ে এই এতো কাণ্ড— আমি বাদে বাকী কজন—ঐ তো বসে আছে ঐখানে। শুনবার চেষ্টা করছিল কি হচ্ছে কি না হচ্ছে, আপাততঃ হাল ছেড়ে দিয়েছে। বসে আছে যেন স্কুলের দুষ্টু ছেলের দল। একজন খেলছে আপন মনে তাস, একজন ছোলা চিবুচ্ছে। একজন সামনের সারির কারুর সঙ্গে খুনসুটি করছে। কেউ বা ঝিমুচ্ছে বসে বসে। কাগজ পড়তেও দেখলাম একজনকে। একজন আরেকজনের পকেট থেকে বেমালুম রুমালটা হাত সাফাই করে নিলো। অবাক কাণ্ড। এদেরই মরণ বাঁচন নির্ভর করছে ঐ আলখাল্লা পরা লোকগুলোর হাতে। আর এরা কিনা নির্বিকার! আমি বাজি ফেলে বলতে পারি, এদের কাণ্ড কারখানা দেখলে এটাকে যে কেউ ক্লাশঘর বলে ভেবে নেবেন। শুধু চারপাশের সশস্ত্র সিপাইদের বাদ দিয়ে দৃশ্যটা ভাবতে হবে। আর বন্দুক কটা। একজনের বন্দুকের বেয়নেট আমার নাকের ঠিক একগজের মধ্যে। ভয় করছে না। কিসের ভয়! কতদিন তো এদের সঙ্গে সঙ্গে আছি। সেখানে যাই, বন্দুক উঁচিয়ে অমনি এরা পাশে পাশে চলে। থোড়াই কেয়ার। এর পর কি করবে তা-ও মুখস্থ। হাকিম চেয়ার ছেড়ে সেদিনের কাজ শেষ করে উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা হাতকড়া নিয়ে বন্দীদের ওপর বলতে গেলে ঝাঁপিয়ে পড়বে, পরিয়ে দেবে যার যার হাতের গয়না।

ভারতের অপর এক প্রান্তে এই আদালতের বিচার নিয়েই কি না কি হয়ে গেলো। আমাদের মামলা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় বেরিয়েছে। তাতে প্রমাণ হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী ভোটে দুর্নীতির

আশ্রয় নিয়েছিলেন। একই দিনে গুজরাটে ভোটের ফল বেরিয়েছে। তাঁর দল সেখানে বিপুল ভোটে হেরে গেছে। বিরোধী দলগুলো বলছে, অবিলম্বে' তিনি পদত্যাগ করুন। তাদের দাবীকে কলা দেখিয়ে তিনি ২৬শে জুন ১৯৭৫ দেশে জরুরী আইন জারী করলেন। ব্যাপক ধরপাকড় চলছে। ধরা পড়েছে বিরোধী দলের কর্মী আর নেতারা। এমনকি ২৬ তারিখেই আইন জারীর খবর তখনও আমরা পাইনি—শুনি জেলখানার ফটকে ভ্যান দাঁড়াবার শব্দ। তবে কি কল্পনা অমলেন্দু এদেরকেও মামলার দরকারে কলকাতা থেকে নিয়ে আসা হলো! পরদিন সকালে উঠে শুনি, নতুন বন্দী এসেছে একদল। এরা সরকারের প্রতিপক্ষ। সরকার বিরোধী—এটাই এদের প্রধান অপরাধ। জরুরী আইনে গ্রেপ্তার। সেদিনের কাগজে গ্রেপ্তারীর সংবাদ এবং জরুরী আইন জারীর পূর্ণ বিবরণ পেলাম। সেই শেষ। সরকার সেন্সর প্রথা চালু করার পর থেকে সব বন্ধ। থাকতো শুধু প্রধানমন্ত্রী কোথায় কি বলেছেন সেই সংবাদ। আর বাকী অনেকখানি অংশ সাদা।

দুদিন পরে পুরুষ মহলে নকশাল বিভাগে ভোরবেলা ব্যাপক তল্লাসী হলো। আমাকে সেদিনই বলা হলো, কোর্টে আমি যেন কলম বা খবরের কাগজ নিয়ে না যাই। আমি বললাম, পুলিসের গাড়িতে বসে বসে আমি কাগজের শব্দজব্দ সমাধানের চেষ্টা করি। কিছু লিখিনা বা লিখবার কোন ইচ্ছেও নেই। অনেক বোঝাতে জেলার শেষে মত দিল। মুখে যদিও বলছে এসব জরুরী আইনের ফল, আমাদের কাছে নতুন নয় মোটেই। এগুলো তো অনেক দিন ধরে অন্য নামে আমাদের ওপর চলছে। শ্রীমতী গান্ধী যে নতুন আইন জারী করে বিরোধীদের জব্দ করার রাস্তা নিয়েছেন, এ তাঁর নিজের দুর্বলতারই প্রকাশ। সবচেয়ে অবাক যেটা—সোভিয়েত রাষ্ট্র যা কিনা বিশ্বের তাবৎ শোষিত নিপীড়িত মানুষের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত রেখেছে বলে দাবী করে, জরুরী আইন চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে আগ বাড়িয়ে ভারত সরকারের প্রতি সবরকম আস্থা প্রকাশ করে তারা বসে রইলো।

১৯৭৩ সালে জামসেদপুরে আসার প্রথম দিনটি থেকে কর্তৃপক্ষের কাছে সমানে অভিযোগ করছি যেন আমার ছাদের ফাটলটা সারিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে। নইলে জল পড়ে ছাদ থেকে। অল্প বৃষ্টি কি বেশি বৃষ্টি কোন কথা নেই। বৃষ্টি হলেই ঝরঝর করে জল। আমার অভিযোগ যথারীতি নথিবদ্ধ করা হয়েছে। পি. ডব্লু. ডি-র বড় ছোট নানান কর্তা অন্ততঃ ডজনখানেক বার এসে সব দেখে গেছে, মাপ নিয়ে গেছে তার চেয়েও বেশি বার, এবং কি করতে হবে সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্তও ঠিক করে ফেলেছে। মুশকিল হলো কাজটা আর হয় না। তখন

একদিন গোবর, পিচ আর সিমেণ্ট মিশিয়ে দস্তুর মতো ঘেঁাট পাকিয়ে ছাদের ওপরে উঠে ফাটলের মুখে লাগিয়ে দিলাম। পরের দিনই দেখি সিমেণ্ট বালি ইট, সমেত কিছু কাজের লোক হাজির। বলতে ইচ্ছে হলো, এই কি আপনার জরুরী অবস্থার সুফল শ্রীমতী গান্ধী? এইজন্যে কি আপনি এতো কাঠখড় পুড়িয়ে এই আইন রুজু করলেন? আপনি না বলেন, আইন আসার ফলে নতুন সাড়া জেগেছে মানুষের মধ্যে! এই কি সাড়ার নমুনা! সে যাই হোক, জমাদার বললো কাজ করতে যে দুজন কামিন এসেছে, ওদের সে কিছুতে কাজ করতে দেবে না। ওরা মেয়ে, ওরা আবার খাটবে কি! মিস্ত্রী বললো, দেখুন না আপনি ওদের কাজ, অবাক হয়ে যাবেন। এতো কাজ পুরুষ হলে করতে পারবে না। দেখলামও তাই। ভারী ভারী সব কাজ করাচ্ছে ঐ মেয়ে দুটোকে দিয়ে। এদিকে মজুরী পুরুষ যা পায় তার থেকে ঢের ঢের কম।

মামলা শুরু হওয়ার এক হপ্তা পর এক সহবন্দীর হলো টাইফয়েড। কদিন মুলতুবী রইলো আদালতের কাজ। খানিকটা সুস্থ হতে তার অবর্তমানে মামলা চলতে পারে এই মর্মে লিখিত সম্মতি জানাবার পর মামলা আবার শুরু হলো। আর একজন যেতে চাইলো দুদিনের প্যারোলে বাড়িতে, বাবা মৃত্যুশয্যায়, ক্যান্সার হয়েছে লিভারে, শেষ দেখা দেখে আসবে, দিলো না যেতে। দুদিন পর বাবার মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে টেলিগ্রাম এলো।

৪ঠা জুলাই ৭৫। শুক্রবার। কোর্টে ঢুকতে আমাদের উকিল আমাকে ডেকে বললেন, আমার বিরুদ্ধে মামলা নাকি তুলে নেওয়া হবে। আমি বললাম, কোন মামলা? কে জানে হয়তো পিকরিক অ্যাসিডের সেই ব্যাপারটা নিয়ে আর ঘাঁটাতে চায় না, আগের দিন তাই নিয়ে মিশ্রজীর সঙ্গে কৌসুলির বিরাট তর্কাতর্কি হয়ে গেছে। আমার প্রশ্ন শুনে তিনি বললেন, একটা নয়, সব। সেই মর্মে নাকি কৌসুলি কাগজ-পত্র তৈরী করছে। এই জন্যে আদালতের কাজ আজ বন্ধ থাকবে।

পরদিন কৌসুলির সেই আবেদন হাকিমের সামনে পেশ করা হলো। মর্মবস্তু হলো এই, দ্রুত নিষ্পত্তি অসম্ভব এই বিবেচনায় আমার বিরুদ্ধে মামলা চালাতে তার আর ইচ্ছে নেই। সে যে কী বিশ্রী একটা ইংরেজী লিখেছে, আমি অবাক হয়ে গেলাম, দিল্লী থেকে এসেছে এই মহামান্য ব্যক্তিটি, ঠিকঠাক দু কলম লিখতে অব্দি জানে না। হাই কমিশনের সেক্রেটারী আমাকে বলে না দিলে ঐ অদ্ভুত কথাগুলোর অর্থ হয়তো আমি বুঝতে পারতাম না। আর একটা কথাও লিখেছে। আমাকে বেকসুর খালাস দেবে সেটা দুটি কমনওয়েলথ দেশ ভারত আর ব্রিটেনের বন্ধু সম্পর্ককে মর্যাদা দেবার জন্যেই। হাকিম পড়ে বললেন, দুটো কারণই তার কাছে

দুর্বল বলে মনে হচ্ছে। তবে হ্যাঁ, এ পর্যন্ত যতটুকু সওয়াল তিনি শুনেছেন তাতে আমার বিরুদ্ধে প্রমাণিত হবার মতো কিছু নেই। তাই আবেদনের বিরোধিতা করার কোন যুক্তি তিনি পাচ্ছেন না। আমাকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠতে বললেন। উঠলাম। বললেন, আপনি বেকসুর খালাস। সব অভিযোগ থেকে আপনি মুক্ত। যান, সুখে থাকুন। বললাম, কিন্তু কি করে সুখে থাকবো? এতোগুলো মানুষ রইলো আটক, আরো কত আছে বিনা বিচারে বছরের পর বছর জেলে বন্দী। হাসলেন আমার কথা শুনে। খুব মিষ্টি হাসি। হয়তো আমার কথা বুঝতে পেরেছেন। যা বলতে চাই, তার মর্মকথা। সবাই ঘিরে ধরলো আমাকে। উকিল, সহবন্দীরা আমার, কাগজের সাংবাদিক সবাই।

শুভেচ্ছা জানাচ্ছে আমাকে। পুলিস তাদের সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলো। সাংবাদিকরা বললেন, আপনার পরিকল্পনা কি? কি করবেন ঠিক করলেন? বললাম, কিছুই ঠিক করি নি। এটা আগে মিটুক। অবাক হলেন তাঁরা। কিন্তু আমি তো বুঝি সব। এতোদিন কাটালাম এদেশের কারাগারে। আমার মন বলছে, বিনা শর্তে কিছুতেই আমাকে এরা মুক্তি দিতে পারে না। বিশেষ করে জাতির এই সংকটের দিনে। একটা না একটা খিচ কোথাও আছে। আছে যে তার প্রমাণ পাওয়া গেলো খানিক পরেই। ফিরলাম সকলের সঙ্গে জেলে। ফটক দিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হলো না আমাকে। আটকালো ওরা। জমাদারনী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আমার জন্যেই তো ওর চাকরী। আমাকে পাহারা দেবার জন্যে। আমি খালাস অর্থাৎ ওর চাকরীও খালাস। কি করে চালাবে এখন দিন! মুক্তি পেলাম বলে কোথায় করবে উল্লাস, কোথায় একটু হাসবে তা না, দারিদ্র্য, নিরাপত্তার অভাব, চরম দুর্দশা—সব মিলিয়ে এই আনন্দের মুহূর্তেও দুঃখ এসে হাসি ওর ঢেকে দিয়েছে! তিন বছর কাজ হলো, এতোদিনে ওর চাকরী পাকা হবার কথা। তাহলে আর কান্নার কোন কারণ থাকতো না। কর্তৃপক্ষ করেছে শয়তানী। তিন বছর পূর্ণ হবার ঠিক আগে বসিয়ে দিয়েছে ওকে দুদিনের জন্যে, ফের নিয়েছে চাকরীতে, নতুন করে আবার বহাল করেছে। অর্থাৎ চাকরী টানা তিন বছর হতে দিলো না। এতো সব চালাকী তো ওরা বোঝে না। তাই কাঁদে। আর এইভাবে কত লোককে যে চাকরীতে অস্থায়ী করে রাখা হয়! কিছুতে দেয়না তাদের টানা তিন বছর কাজ করতে। ফলে ছাঁটাই করারও সুবিধে। যে কোন দিন বলে দেয়—যাও, অমনি চাকরী খতম।

একে একে বন্দীরা ঢুকে গেলো জেলে। আমি ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

এগিয়ে এলো এক পুলিস অফিসার। মাথায় চুড়োমলা টুপি আর পায়ে ভারী বুট। আমার হাতে দিলো একখানা ফরমান। দেশত্যাগের আদেশ। তাতে লেখা. সাতদিনের মধ্যে আমাকে দেশ ছাড়তে হবে। তলায় ভারত সরকারের জনৈক জয়েন্ট সেক্রেটারীর সই। তারিখ সতেরোই জুন। মাঝখানে যে সাতটা দিন, থাকতে হবে আমাকে হাজতে। অর্থাৎ আমি 'মুক্ত', আমার ব্যাপারে আর ওদের কোন অভিযোগ নেই, তবু নিয়ম বলে তো একটা ব্যাপার আছে। মানে ঘাঁতঘোঁত সব আগে থেকে কব্জা করে রেখেছে। হাজতে ফের ঢোকাবার পেছনে কারণও একটা দাঁড় করিয়েছে। আমার সঙ্গে পাসপোর্ট নেই, এবং সেই অবস্থাতে আমি কিনা যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছি। ফের সাতদিন জেলখানায় রাখার এটাই প্রধান অজুহাত। তা পাসপোর্ট পাবো কোত্থেকে? সেটা তো বাপু তোমাদেরই হেপাজতে। দাও ফিরিয়ে আমাকে আমার জিনিস!

ব্রিটিশ কনসাল এলেন। স্থানীয় পুলিস সুপারের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। সঙ্গে একখানা উড়োজাহাজের টিকিট। কাল ভোরেই রওনা হতে হবে আমাকে। যাবো কলকাতা। সেখান থেকে দমদম। তারপর রওনা। কলকাতা অব্দি কনসালও আমার সঙ্গে যাবেন।

ফিরে এলাম নিজের ঘরে। সেই কুঠুরী, বীণার সঙ্গে কথা বলতে ভারী ইচ্ছে করছে। তৎক্ষণে বাকীরাও এসে ঘিরে ধরেছে আমাকে। বীণাকে বললাম সব। বললাম, পড়াশোনা যেন কামাই না দেয়। যেন হতাশ না হয়ে পড়ে। চলে যাচ্ছি যদিও অনেক দূরে, আমি ভুলবো না তাকে কোনদিন। চিঠি লিখবো, যেন জবাব দেয়। আর বলা যায় না, হয়তো ফের আমাদের দেখা হয়েও যেতে পারে।

সারারাত নির্ঘুম কাটলো। ঝড় বইছে মনের অলিতে গলিতে। ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়েছি। যদি ওরা আমার ডায়রীগুলো রেখে দেয়! কি করি এখন? ভেবে ভেবে রাস্তা একটা বেরুলো। বসলাম কলম নিয়ে। দুটো তিনটে কথা শুধু পালটাতে হবে। যেখানে যেখানে লিখেছি 'ভারতীয়', কেটে করলাম 'ব্রিটিশ'; আর 'শ্রীমতী গান্ধীর' নাম যেখানে উল্লেখ আছে বা সংক্ষেপে 'রাণী', সেখানে করলাম 'শ্রীমতী থ্যাচার।' রাণী কথাটা পালটাবার দরকার হলো না। এছাড়া মাঝে মাঝে দুটো একটা ফাঁকা জায়গায় বড় বড় হরফে লিখে দিলাম কিছু ধর্মীয় কথাবার্তা। ব্যস্, আমার কাজ শেষ। একচমক পাতা ওলটালে কেউ বুঝতে পারবে না, ভারত সরকারের ব্যাপারে আমি কিছু লিখেছি। অন্ততঃ

নামগুলো দেখে ধরে নেবে, আমার লেখার মূল প্রতিপাদ্য ব্রিটিশ সরকার।

তখন ভোর চারটে। এক জমাদারণী এলো চুপিচুপি আমাকে ডাকতে। তখনও আঁধারের ঘোর কাটেনি। স্নান হয়নি আমার। বললো চটপট পোশাক পালটে নিতে। কি ব্যাপার? না, কে একজন আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। বুঝতে আর বাকী রইলো না কে এসেছে দেখা করতে। আগের দিন এসেছিলো এক জমাদার, মোটের ওপর বন্ধুর মতো মেশে আমাদের সঙ্গে, কথা দিয়ে গিয়েছিল যাবার আগে আমার এক সহবন্দীকে নিয়ে আসবে দেখা করাতে, সে-ই এসেছে। গেলাম। তখনও স্পেশ্যাল ব্র্যাঞ্চের পুলিস ডিউটিতে আসে নি। এটাই রক্ষা। দেখি সে ছেলের ঘুম ঘুম চোখ। অর্থাৎ ঘুম থেকে তুলেই একরকম বলতে গেলে নিয়ে এসেছে। আহারে বেচারা! তবু বলবো, এর দরকার ছিলো। এই সাক্ষাৎকারের। কর্তৃপক্ষ তো সত্যি কথাটা এদের বলবে না, হয়তো মিথ্যে করে আমাকেই অপরাধী সাজিয়ে একটা গল্প ছাড়বে। কিন্তু সঠিক ঘটনাটা যে ওদের জানা চাই। বললাম সব। এমনকি চলে যাচ্ছি আজ সেকথাও। শুনে হাসলো। বললো, ভুলো না আমাদের। পা বাড়ালো ফটকের দিকে। ফের ঘুরে আমার দিকে তাকালো, হাত মুঠো করে জানালো সেলাম। বললো, আবার দেখা হবে। হবেই। বিদায়।

আমারও আর সময় নেই। রওনা হতে হবে এখন। বীণা হীরা গুলাবী — সবার কাছে বিদায় নিলাম। বাচ্চারা এলো। চুমু খেলাম গালে। হীরার ছেলে রাজু বললো, দিদি, ও দিদি, দিদি ..জমাদার তাগাদা দিচ্ছে। বীণাকে বললাম, স্থির থেকো। নিজের শরীরের প্রতি যত্ন নিও। আর কিছু বলতে পারলাম না। কান্নায় গলা ভারী হয়ে উঠেছে। বীণাও কাঁদছে খুব।

সুপার আর জেলার সাত সকালেই হাজির। অফিস ঘরে যেতে না যেতে বাইরের দোকান থেকে চা আনালো আমার জন্যে। সান্ত্রী পুলিসের দলও এসে গেছে ততক্ষণে। আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবে এরা। কনসাল আগে থেকেই অপেক্ষা করছেন। উঠলাম একটা ট্রাকে। স্টেশন অব্দি যাবো। কেউ আমার ঝোলায় হাত অব্দি দিলো না। তল্লাসী তো দূরের কথা। স্টেশনে পৌঁছে দেখি, বিহারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের জয়েন্ট সেক্রেটারী দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে পুলিস-সুপার। সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে অপেক্ষারত ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটি কামরায় আমাদের তুলে দিলো। যাবো কলকাতা অব্দি এই ট্রেনে। ছাড়লো ট্রেন। পড়ে রইলো পেছনে মাঠ আর পাহাড়। ঐ তো বাংলা। ঐ তার শক্ত

ক্ষেত। ধানের চারাগুলো হয়েছে প্রায় একফুট মতো উঁচু। কত ধান। ঐ কলাবাগান, ঐ একটা বাঁশঝোপ। ঐ পুকুর। ঐ তো কত মাটির কুঁড়ে। মাঝে মাঝে স্টেশনে গাড়ি থামছে। এই তো বাংলার পল্লী প্রকৃতি। এই দেশই আমি ভালবেসেছিলাম। কী যে ভীষণ সেই ভালবাসা! আর তো সমানে গল্প আর কফি। সঙ্গে চলেছে এক মেয়ে-পুলিস। তার আবার একটি ছোট মেয়ে আমাদের সাথী। রোগাটে গড়ন। দুর্বল ভাব। অবাক বিস্ময়ে সে আমাকে শুধু দেখছে আর ভাবছে, তাইতো, জলজ্যান্ত এক মেমসাহেব, তার আবার পুলিস পাহারার দরকার হলো কেন!

হাওড়া স্টেশন। নামতে হলো। আমার জিম্মাদারী এবার থেকে কলকাতা পুলিসের হাতে। চলে গেলেন কনসাল। বললেন, বিমান বন্দরে যাবেন আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে। তিন সাদা পোশাকের পুলিসের সাথে মস্ত একখানা গাড়িতে চেপে রওনা হলাম। সেই কলকাতা। সেই গোলকধাঁধার শহর। অমলেন্দু আর কল্পনা আছে এই শহরে। হয়তো আমার থেকে কয়েক মাইল মাত্র দূরে। জানে কি ওরা আমি চলে যাচ্ছি? বলেছিলাম কনসালকে, যাবার আগে অমলেন্দুর সঙ্গে তার বাবা মার সঙ্গে আমি একবার দেখা করতে চাই। বলেছেন, সম্ভব নয়, ওরা অনুমতি দেবে না। সঙ্গী পুলিস পাহারাদারকে বললাম, আমার ঘড়ি আর টাকা পয়সা ফেরত দিন। অমলেন্দুর বাড়ি থেকে সব তো আপনারা আমার গ্রেপ্তারীর পর নিয়ে এসেছেন। বললো, দেখো কিকি, এসব আগে বলতে হয় তো! বলে পাসপোর্টখানা শুধু দিলো। দেখো কাণ্ড! আগে বলার সময় কোথায় দিলো ওরা আমাকে? মোটে তো বারো ঘণ্টা হাতে পেলাম। তার মধ্যে আগে আর পরে কি?

বিমান বন্দরে আগে থেকে ঠিক করা আছে বিলাসবহুল স্যুইট। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তারা আমাকে ভেতরে ঢুকতে বললো। আহা কী দরদ! আমার যে বিশ্রামের দরকার, সেটাও দেখছি আগে থেকে চিন্তা করে রেখেছে। প্লেন ছাড়তে ছাড়তে সেই মাঝরাত। এখন তো সবে দুপুর। চলে গেলো ওরা। যাবার সময় বলে গেলো, আমি যেন নিজেকে আর বন্দী বলে না ভাবি। আমি এখন অতিথি। মাননীয় সরকারের অতিথি।

তা অতিথিই বটে। যাকে বলে নজরবন্দী অতিথি। দরজাটা যাবার সময় ঠিক বাইরে থেকে তালাবন্ধ করে গেছে। একটু পরে দরজায় ঠুকঠুক শব্দ। কি ব্যাপার? মুখ বাড়ালো দুজন।—ঘরে একটু বসতে চায়। আমার কি আপত্তি

আছে ?—হ্যাঁ আছে। ঘুমোবো আমি এখন। ওরা ঠায় বসে থাকবে আর আমি ঘুমোবো এ কিছুতেই হতে পারে না। তখন চলে গেলো। আবার খুট করে তালা আটকাবার আওয়াজ। দশ মিনিট পরে এলো বিমানবন্দরের এক মেয়ে-পুলিস। কত আর বয়েস—বিশ! অসহায় ভাবে হাসলো আমার দিকে তাকিয়ে, বসে পড়লো সোফায়।—বসতে পারি ?—বসুন। বলে আর চোখ আমি খুলে রাখতে পারছি না। ঝিমুচ্ছি একটু একটু। শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। জানিনা তারপর কি হলো। ঘুম ভাঙলো শীতে। শীতই। এমন ঠাণ্ডায় অনেক দিন যে থাকিনি। এ তো আমার অভ্যেসের বাইরে। শীত লাগবে এটাই স্বাভাবিক। খাবার দিয়ে গেল এক বেয়ারা। মুরগী আর আইসক্রীম। মেয়েটি বলছে পেট ভরে খেতে। পারছি না আমি। এসব যে দীর্ঘদিন অভ্যাসের বাইরে। চাপাটি খেতে ইচ্ছে করছে। আর আলুর তরকারী। নিয়ে গেলো সব। আবার এসে উঁকি দিলো সাদা পোশাকের এক মক্কেল। মাঝে মাঝেই আসছে। আড্ডা দিতে চায়। ওর আত্মীয় আছে ইংল্যাণ্ডে। লণ্ডনে থাকে।—মিঃ দাস। আপনি চেনেন ? গিয়ে যোগাযোগ করবেন ?

ডেপুটি হাই কমিশনার নিজে এলেন দেখা করতে বিকেল নাগাদ। কী মিষ্টি মিষ্টি কথা, কী মনোরম ব্যবহার! ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললেন সেই একই কথা,—আমি যেন ভারতবর্ষে আসার কথা মনেও আর স্থান না দিই। কি লাভ এসে ? দিনের হিসেবে পাঁচ বছর অনেকগুলো দিন। কত কি পালটে যায় এই পাঁচ বছরে। এমনকি মানুষের মন অব্দি। বুঝতে পারছি কি বলতে চাইছেন। উচ্চপদস্থ আরো দুজন পুলিস অফিসার এসে বসেছে আমার মুখোমুখি। চলে যাবে, তার আগে দেখা করে যাচ্ছে। একজন বললো, আমি যেন বছর খানেকের মধ্যে অন্তত ফেরবার চিন্তা না করি। একবছর পরে অমলেন্দু ছাড়া পাবে। এটা অনুমান করা যাচ্ছে। তারপর এলেই সবচেয়ে ভালো হয়।

সন্ধ্যেবেলা এলো রয়টারের জনৈক সংবাদদাতা এবং আরেকজন সাংবাদিক। এসেছে আমার সাক্ষাৎকার নিতে। আমার তো মোটে আগ্রহ নেই। কি লাভ এই সব নিজস্ব কথা কাগজে ছাপিয়ে ? প্রথমটায় ভাবলাম ভাগিয়ে দেবো, পরে দেখি সাদা পোশাকের এক মক্কেল এসে ওদের হয়ে আমাকে অনুরোধ জানালো। কে জানে তলে তলে কিছু গোপন ব্যাপার স্যাপার আছে কিনা। দুটির চেহারা যেন একেবারে সাক্ষাৎ লরেল হার্ডি। একজন বললো, দীর্ঘ পাঁচ বছর জেলে কাটাবার পর আপনি কি আপনার রাজনৈতিক মতামতের কিছু পরিবর্তন করেছেন ?

বললাম, না। —তার মানে ধরে নিতে হয় আপনি এখনও ভীষণ রকম ভাবে বিপ্লবে বিশ্বাস করেন? বললাম, জোর ক'রে আমার মুখ থেকে কথা টেনে বের করবার চেষ্টা করে লাভ নেই। আমি জবাব দেবো না। তখন চলে গেলো। অবাক কাণ্ড বটে! এতো গোপন রেখেছে ওরা আমার চলে যাবার ব্যাপারটা—কি করে জানলো এরা, কি করেই বা আমি কোথায় কোন্ ঘরে আছি টের পেলো।?

খানিক পরে কনসাল এলেন একটা স্যুটকেশ নিয়ে। সঙ্গে মিষ্টিও এনেছেন। আমার বোনঝির জন্যে। আর একজোড়া জুতো আর দুটো লম্বা মোজা। আমার নিজস্ব বলতে সব কিছু তো সঙ্গের খাঁকি রঙের ঝোলায়। জুতোটা পরে নিলাম। কেননা চটিতে ইংল্যাণ্ডের প্রচণ্ড শীতে সুবিধে হবে না। এই জুলাই মাসেও। শাড়ীটা বদলে নিলাম। স্যুটকেসে ছিল একপ্রস্থ জামাপ্যাণ্ট। পুরনো একটা ট্রাউজার্স আর একটা আলখাল্লা মতন জামা। পরে নিলাম। কনসালের স্ত্রী এলেন ফুলের একটা মস্ত বড় তোড়া নিয়ে। ভারী খুশী তিনি। মুক্ত আমি সেজন্যে নয়। এই যে চলে যাচ্ছি এখন, এদেশ ছেড়ে, এতেই ওঁর আনন্দ। অমলেন্দুর কথা বারবার মনে পাক খেয়ে বেড়াতে লাগলো। ওর বাবা মার কথাও মনে পড়ছে। যদি একটা অলৌকিক কিছু ঘটে যায় এখনি! যদি ওঁরা ঘুরতে ঘুরতে এদিকে এসে হঠাৎই আমাকে দেখে ফেলেন! ক্ষিধে পাচ্ছে খুব।—না না, মাংস খাবো না। সব্জি দিন। তরকারী। মাংসের গন্ধ বড় বিশ্রী লাগছে।

রাত সোয়া বারোটা তখন। আমাকে ভি আই. পি দরজা দিয়ে বাইরে নিয়ে গেলো। বিহার স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেই জয়েন্ট সেক্রেটারী সেখানে হাজির। সঙ্গে আরো অনেকে। সবার নাম বা পরিচয় আমি জানি না। এটুকু জানি এদের সঙ্গে আজ নানান সময় নানান পরিবেশে আমার দেখা হয়েছে। সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। আমাকে শুভ-বিদায় জানাতে এসেছে। সে যেন রাজকীয় সম্মানের মতো। সবাই হাত বাড়িয়ে দিলো, সবার সঙ্গে করমর্দন করলাম। কী মিষ্টি হাসি সবার মুখে! সে পর্ব সমাধা হলে পর দুজন সাদা পোশাকের পুলিস নিয়ে গেলো আমাকে বিমানে উঠতে যাওয়ার প্রধান রাস্তার মুখ অব্দি। দাঁড়িয়ে রইলো সেখানেই। আমি আর পেছন ফিরে তাকালাম না। হাতে আমার টিকিট আর উড়োজাহাজে চড়বার ছাড়পত্র। সিধে সামনের দিকে হাঁটা দিলাম।

ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজের হাওয়াই জাহাজ। এটাও সৌজন্য বোধের একটা নিদর্শন বলবো। ভিন্ দেশী নয়, স্বদেশী বিমানেই আমাকে তুলে দেবার ব্যবস্থা করেছে। আসন নিতেই ষ্টুয়ার্ড এলো ছুটে। কানের কাছে মুখ নিয়ে চিরাচরিত

পদ্ধতিতে প্রায় ফিসফিসিয়ে বললো, একটু ব্রাণ্ডি চলবে নাকি? দেবো? ঘাড় নাড়লাম। দরকার নেই। ছুঁই না ওসব অনেক দিন। কে জানে এতোদিনের অনভ্যাসের পর যদি সহ্য না করতে পারি। সাড়ে বারোটা বাজে। খাবার এলো প্রথম দফা। মুরগী রোস্ট আর মুখরোচক ভাজাভুজি। পেটের মধ্যে নাড়িভুঁড়ি পাক দিয়ে উলটে এলো সকাল থেকে খাওয়া যাবতীয় খাবার। পারলাম না ছুঁতে। নিজেকেই নিজের কেমন অবাক লাগছে। আচ্ছা এই যে এতো যাত্রী—এরা কি জানে কেউ, আমি কে? দেখি তো চেয়ে সবাই আমার দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে কি না? নেই। যে যার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। আর ভারী একঘেয়ে তো এই চোদ্দটা ঘণ্টা। যেন শেষ আর হতে চায় না। আমার পাশে বসেছে এক ডাক্তার। বাঙালী। বাবাকে নিয়ে যাচ্ছে ইংল্যাণ্ডে চিকিৎসার জন্য। আমার সঙ্গে যেচে আলাপ করলো।—তাই নাকি, ভারত বেড়িয়ে এলেন? কেমন লাগলো? কতদিন ছিলেন বললেন? বলেন কি? কোথায় ছিলেন? কি করতেন? বললাম, কি করতাম শুনলে আপনি তাজ্জব হয়ে যাবেন। —আচ্ছা, আপনি কি সেই মিস টাইলার? ধরেছে ঠিক। কাগজে যে কত গল্পই বেরুতো আমাকে নিয়ে।

আর কী আদিখ্যেতা বাপু এই কোম্পানীর ষ্টুয়ার্ডগুলোর। শুধু খাওয়া আর খাওয়া। যেন বিরাম নেই। এই আনছে লেবুর রস, এই জলখাবার, শেষ হতে না হতে গরম গরম কফি, আবার আরেকপ্রস্থ কি সব—পারে মানুষ এতো খেতে। সবই তো প'ড়ে রইলো বলতে গেলে। সবাই কিন্তু হাড় অব্দি কুড়মুড় করে চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে। এ ছাড়া করবেই বা কি। সময় কাটানোটা যে এক বিরাট সমস্যা। এক ষ্টুয়ার্ড দেখি ঘুরে ঘুরে নিঃশুল্ক সিগারেট আর পানীয় বিক্রী করে বেড়াচ্ছে।—এই যে, দিন তো আমাকে এক প্যাকেট সিগারেট! —হুইস্কি? দিন আধ বোতল

কিনলাম। গত পাঁচ বছরের মধ্যে সেই আমার প্রথম নিজের হাতে নিজের তাগিদে নিজের পয়সা দিয়ে সওদা। নিজের পয়সা অবিশ্যি বলতে পারি না। কনসাল হাত খরচা বাবদ পাঁচ পাউণ্ড দিয়েছেন। হিসেব করে দেখলাম, কেনা কাটার পরও হাতে যা থাকবে তা দিয়ে যদি কেউ বিমান বন্দরে না-ও আসে নিতে, হীথ্রো থেকে অক্লেশে আমি বাড়ি অব্দি পৌঁছে যেতে পারবো।

কি করছে এখন অমলেন্দু? আমার অমলেন্দু। জানে, আমি এখন দেশের পথে?

আমার বাবা কি জানেন? এই তো আর খানিকক্ষণ দেরী। তারপরই লণ্ডন।

হীথ্রো বিমান বন্দর। স্টুয়ার্ড বললো, একটু বসুন, সবাই নেমে যাক, তারপর নামবেন। বসে রইলাম। দশ মিনিট পর। দেখি বাবা। আমাকে জড়িয়ে ধরলেন দু হাতে। কাঁদছেন, আমার বোন এসেছে। ঐ তো তার মেয়ে। দু বছর বয়েস। আমি এই প্রথম ওকে দেখলাম। কোথায় যেতে হবে যেন এখন? হ্যাঁ, পাসপোর্ট অফিস। কাগজের সাংবাদিক এসেছে একদল। ক্যামেরা। ক্লিক ক্লিক। ছবি উঠছে। চোখ ধাঁধানো আলো। ইচ্ছে হলো বলি একবার,—কেন এতো ফিল্ম আপনারা নষ্ট করছেন, কি লাভ?—কই হাসুন তো একটু। এই তো, চমৎকার!—বাচ্চার হাত ধরুন। না না গোমড়ামুখে নয়, হাসতে হবে। —প্লিজ, বাবাকে আরেকবার দয়া করে জড়িয়ে ধরুন না। আর একটু। চমৎকার। —এবার বোন আর আপনি। একটু কাছাকাছি হোন। বাঃ।

পাসপোর্টে কোন গোলমাল নেই। এমনকি একটা মন্তব্য অব্দি লেখা নেই। সবাই তো দেখে অবাক।—টীকা নিয়েছেন কি আপনি?—তার কি আর হিসেব আছে। সে তো অনেকবার।—কিন্তু কই সার্টিফিকেট যে দেখছি না। ফলে আবারও টীকা নিতে হলো। এর পর সাংবাদিক সম্মেলন। মস্ত একটা ঘর। চোখ ধাঁধানো আলো। জিল্ এসেছে দেখলাম। আমার বন্ধু। সঙ্গে চার বছরের মেয়ে। কী ফুটফুটে হয়েছে দেখতে! চিঠিতে আমি পড়েছিলাম। ঐ তো রুথ। ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আমার খুড়তুতো বোন এসেছে, সঙ্গে তার স্বামী। কতদিন পরে দেখছি আবার সবাইকে! উঃ, ক-ত-দিন! নতুন নতুন লাগছে। একটা মাইক্রোফোন মালার মতো একজন আমার গলায় ঝুলিয়ে দিলো। শুরু হয়েছে প্রশ্ন। আমি সাধ্যমতো জবাব দিচ্ছি। বাবা এলেন এক ফাঁকে। আমাকে বললেন, বিদেশ মন্ত্রকের এক কর্তা বলেছেন সংক্ষেপ করতে। যেন বেশি সময় না নিই। সংক্ষেপেই শেষ করলাম।

বাড়ি যাচ্ছি এবার। ঐ তো বাবার গাড়ি। কর্ণওয়ালের রাস্তা দিয়ে চলেছি। কত আপেল, কত কলা, কত প্রাচুর্য। যা চাই তাই এবার পাবো। যত চাই তত। শুধু ফিকে একটা রঙের ছোঁয়া লাগছে চোখে। সব কেমন ম্যাড়মেড়ে। ভারতে বসে যেমন ভাবতাম, তার সঙ্গে ছবিটা ঠিক মিলছে না। কিছুতেই মিলছে না।

আট মাস পার হয়ে গেছে। কলম ধরেছি আমি। আমি এখন মুক্ত। সেই ২৬শে জুন ৭৫ সালে শুরু হয়েছিল মামলা। সেই মামলা এখনও চলছে। জানিনা শেষ হবে কবে। সবাই ওরা ছেলে। অমলেন্দু, কল্পনা, বীণা আরো হাজার হাজার মানুষ। অবস্থা এতোটুকু বদলায়নি। সেই দুর্ভোগ। আমার চেয়ে এতোটুকু ভালো কেউ নেই। শুনি সাত বছর হয়ে গেছে, এখনও অনেকের মামলা শুরু হবার সুযোগ অব্দি হয় নি। আরো হাজারে হাজারে মানুষ হয়েছে বন্দী। হা-জার হা-জা-র! ২৬শে জুনের জরুরী অবস্থার শিকার সকলে। অগুণতি কৃষক আর শ্রমিক এখনও একইভাবে বন্দী। যেরকম দেখে এসেছি আমি। দরিদ্র তারা। এখনও শুরু হয়নি তাদের বিচার। জানে না কবে শুরু হবে। তাদের অনেকের শিশু সন্তান একটু একটু করে গারদের আড়ালে বড় হচ্ছে।

জানিনা একে অপরাধ বলে কোন্ হিসেবে। অমলেন্দু যা করেছে কল্পনা যা করেছে তা যদি অপরাধ হয় তবে বলবো, ভারতের কোটি কোটি মানুষ—যারা পারে না সেই দুঃসহ অবস্থা সহ্য করতে, যারা বিচলিত হয়, যাদের হাত নিশপিশ করে ওঠে একটা কিছু করার জন্যে—তারা সবাই অপরাধী। শিশু সেখানে হাতে ভিক্ষার পাত্র নিয়ে ধুলোর মধ্যে গড়াগড়ি খায়। ধনীর কাছে বিক্রী হয় সেখানে যুবতী। তার ইজ্জৎ নিয়ে তারা খেলা করে। গ্রামে নিজের জাত ফিরিয়ে আনাব জন্য নিজে উপোস দিয়ে খাওয়াতে হয় গ্রামের শত শত মানুষকে। অবহেলায় মরে সেখানে শত শত মানুষ। মজুতদার জমা করে রাখে খাদ্য, আর হাজার হাজার মানুষ সেই খাদ্যের জন্য হাহাকার করে বেড়ায়। কাজের সবটুকু মুনাফা লুটে নেয় সেখানে ধনী আর সুদখোর মহাজনের দল। সেখানে সততা পড়ে পড়ে মার খায়, আর শয়তানী পায় মানুষের কাছে শ্রদ্ধা ও পুরস্কার। সেখানে ন্যায় হলো ব্যতিক্রম, অন্যায়টাই বিধি। কোটি কোটি মানুষের সেখানে একমাত্র ধ্যান জ্ঞান হলো বেঁচে থাকা—কিভাবে কত কষ্ট করে কত লাঞ্ছনা সয়ে কোনমতে বেঁচে থাকতে পারে। যারা ভাবে এর একটা আমূল পরিবর্তন দরকার, মানুষের সৃজনশীলতা দক্ষতা সততা নিষ্ঠা এ সবের পরিপূর্ণ বিকাশ দরকার এবং তারই মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠবে একদিন সুখী সমৃদ্ধ সুন্দর ভারত, প্রকৃত স্বাধীন ভারত—তারা অপরাধী। সরকারের চোখে তারা দুর্জন।

সরকার হয়তো ভাবতে পারে, যারা অন্যায় এবং অমানবিকতার বিরুদ্ধে কথা বলেন তাঁদের অনির্দিষ্টকালের জন্য কারারুদ্ধ করে, ব্যক্তিস্বাধীনতা দিনের পর দিন

খর্ব করে, ভয় দেখিয়ে বা চরম অত্যাচার ইত্যাদি নেতিবাচক কাজের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান সম্ভব। ভুল সেটা। এভাবে সমাধান হয় না, হতে পারে না। যতদিন সরকার মানুষকে দেখবে ঘৃণার চোখে, যতদিন চালাবে দমন পীড়ন, যতদিন লোকসভায় হবে তুমুল বাকবিতণ্ডা—যে মারা গেলো সে অনাহারে মরেছে না অর্ধাহারে—ততদিন চলবে মানুষের লাঞ্ছনা, ততদিন যন্ত্রণার শেল বুকে নিয়ে ভারত পড়ে পড়ে কাতরাবে। আর্তনাদ করবে।

শেষ